ডক্টর অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক যুগের কথা

WORLD HISTORY –1740–1949

Written strictly in accordance with the latest Syllabus.

আধুনিক যুগের কথা

(WORLD HISTORY, 1740-1949)

(FOR HIGHER SECONDARY, PRE-UNIVERSITY
AND
UNIVERSITY ENTRANCE STUDENTS)

[উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের নব-প্রবর্তিত সংশোধিত পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শতবার্ষিকী অধ্যাপক এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এ., পি-এইচ. ডি., পি. আর. এস.

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ADHUNIK JUGER KATHA (World History, 1740-1949)
by Dr. A. C. Banerjee, M.A., Ph.D., P.R.S.
Price : Rs. 4·50 (Rupees Four and Fifty Paise) only

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড্
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্য : [redacted] ([redacted])

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মুদ্রাকর :
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড্ আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা-১২

ভূমিকা

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা (Humanities) বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আধুনিক যুগের পৃথিবীর ইতিহাস (১৭৪০-১৯৪৯) অন্যতম পঠিতব্য বিষয় রূপে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ শিক্ষার্থিগণের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার এবং বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃভূমির ইতিহাসের আলোচনা এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। সম্প্রতি পরিবর্তিত পাঠ্যসূচীতে এই বিষয়টিকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে এই বিষয়ে একটি অর্ধ-পত্রের (Half Paper) ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে একটি পূর্ণ পত্রের (Full Paper) ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নবপ্রবর্তিত পাঠ্যসূচীকে ভিত্তি করিয়া নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। বিষয়টি অতি জটিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করা এবং কার্যকারণসম্বন্ধ অনুধাবন করা অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সহজ নহে। এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আমি বইখানি লিখিয়াছি। অনাবশ্যক ঘটনার বর্ণনায় বইটি ভারাক্রান্ত করা হয় নাই; যে সকল ঘটনার প্রকৃত ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে সেগুলি যথাসম্ভব সরলভাবে পাঠার্থীদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে।

ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী পরীক্ষায় এবং এম. এ. পরীক্ষায় ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ (International Relations) অবশ্যপাঠ্য বিষয় রূপে নির্ধারিত হইয়াছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আধুনিক যুগের ইতিহাস পাঠকালে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। বর্তমান পুস্তকটিকে উচ্চতর স্তরে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ আলোচনার সোপান রূপে গণ্য করা যায়।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

সূচনা—ইউরোপ ও পৃথিবী	...	১—১৭
১। আধুনিক যুগের ইতিহাসের ভূমিকা	...	১
২। রেনেসাঁস ও ধর্মসংস্কার	...	৩
৩। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য	...	৮
প্রথম অধ্যায়—জ্ঞানদীপ্তির যুগে ইউরোপ	...	১৮—৩১
১। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা	...	১৮
২। জ্ঞানদীপ্তির যুগ	...	২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়—বিপ্লবের যুগ	...	৩১—৬৪
১। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ	...	৩১
২। ফরাসী বিপ্লব	...	৩৮
৩। নেপোলিয়ন	...	৫২
তৃতীয় অধ্যায়—শিল্পবিপ্লব	...	৬৫—৭৩
চতুর্থ অধ্যায়—ইউরোপের পুনর্গঠন (১৮১৫-১৮৪৮)	...	৭৪—৯০
পঞ্চম অধ্যায়—জাতীয় ঐক্য আন্দোলন	...	৯১—১০৭
১। ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা	...	৯১
২। জার্মানীর ঐক্য	...	৯৮
ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রাচ্য সমস্যা (১৭৬৩-১৯১৪)	...	১০৭—১২১
সপ্তম অধ্যায়—ইউরোপ (১৮৭৮-১৯১৪)	...	১২২—১৩৪
অষ্টম অধ্যায়—ইউরোপের প্রসার	...	১৩৪—১৫৮
১। আফ্রিকা	...	১৩৬
২। চীন ও জাপান (১৮৪০-১৯১৪)	...	১৪০
নবম অধ্যায়—নূতন মহাদেশ	...	১৫৮—১৮২
দশম অধ্যায়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	...	১৮৩—১৯৭
একাদশ অধ্যায়—জাতিসঙ্ঘ	...	১৯৮—২০৫
দ্বাদশ অধ্যায়—রুশ বিপ্লব	...	২০৫—২১৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়—ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯)	...	২১৯—২৩২

চতুর্দশ অধ্যায়—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ২৩২—২৫১
১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ... ২৩২
২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ... ২৪৩
পঞ্চদশ অধ্যায়—এশিয়ায় জাতীয়তাবাদ ... ২৫২—২৬৫
১। নব্য তুর্কী ... ২৫২
২। আরব জাতীয়তাবাদ ... ২৫৭
৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ... ২৬০
৪। চীন ... ২৬২
আদর্শ প্রশ্নমালা ... ২৬৬—২৮০

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, WEST BENGAL

HIGHER SECONDARY (HUMANITIES) EXAMINATION

Syllabus : WORLD HISTORY (1740-1949)

(PAPER II—100 MARKS)

SYLLABUS

Introduction :

(a) The Renaissance and the Reformation—Geographical discoveries.

(b) Colonial empires : Portuguese, Spanish, Dutch, English and French—Rivalries.

Chapter I :

(a) Political condition in Europe, C1740-63.

(b) The Age of Enlightenment.

Chapter II : *Age of Revolution* :

(a) American War of Independence.

(b) French Revolution—Napoleon.

Chapter III : *The Industrial Revolution* in England and Europe—Results.

Chapter IV : *Reconstruction of Europe, 1815-1848.*
Congress of Vienna—Metternich—Two French Revolutions, 1830 and 1848—Louis Napoleon Bonaparte.

Chapter V : *National Unification Movements* :
Italy and Germany—Part played by Napoleon III.

Chapter VI : *The Eastern Question, 1763-1914.*

Chapter VII : *Europe, 1878-1914.*
Bismarck—The Dual and Triple Alliances—Anglo-German and Franco-German rivalries—The two armed camps—Triple Entente—Morocco Crisis—The Balkan Wars—Outbreak of World War I

Chapter VIII : *Expansion of Europe* :

(a) Africa—European Colonisation—Partition of Africa.

(b) China and Japan—Western penetration into China and Japan from the middle of the nineteenth century to the First World War.

Chapter IX : *America* :

From Independence to the Civil War—The Civil War—Monroe Doctrine, its application (reference to be made to South America)—events leading up to the Washington Conference, 1921.

Chapter X : *The First World War and after* :

Causes and course of the War (without details of military history).

Peace Settlement—The Treaties—The Succession States.

Chapter XI : *League of Nations.*

Chapter XII : *The Russian Revolution* :

Karl Marx and Lenin—Causes of Russian Revolution—Russia from 1917 to1937—internal organization and external policy—impact on the world.

Chapter XIII : *Europe from 1919 to 1939* :

Emphasis on Germany, Italy and Western Europe.

Chapter XIV : *Nationalism* in Turkey, the Arab States, India

(a) Causes and broad outline without military details.

(b) United Nations Organization.

Chapter XV : *Nationalism* in Turkey, the Arab States, India and South East Asia—China from 1919 to 1949.

সূচনা

ইউরোপ ও পৃথিবী

১। আধুনিক যুগের ইতিহাসের ভূমিকা

রোম সাম্রাজ্য: ঐতিহাসিক প্রবাদ অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ অব্দে রোম নগরী স্থাপিত হয়। প্রথমে রোম ইটালীর একটি ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের (City-State) কেন্দ্র ছিল। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এই নগর-রাষ্ট্র একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলি (স্পেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজার্ল্যাণ্ড, ইটালী, বল্‌কান অঞ্চল, গ্রীস), উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্য এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এত বড় সাম্রাজ্য পৃথিবীতে পূর্বে কখনও গঠিত হয় নাই। প্রথমে এই সাম্রাজ্য একটি সাধারণতন্ত্র (Republic) ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এখানে সম্রাটের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাটকে 'সীজার' (Caesar) বলা হইত। রোম ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী বিশাল ভূখণ্ডের কেন্দ্র রূপে 'চিরস্থায়ী নগরী' (Eternal City) আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা সহজ ছিল না। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কন্‌স্ট্যান্‌টাইন (Constantine) ইউরোপ এবং এশিয়ার সংযোগস্থলে, কৃষ্ণ সাগরের তীরে বাইজান্টিয়াম (Byzantium) নামক স্থানে একটি অতিরিক্ত রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার নাম অনুসারে বাইজান্টিয়াম পরে কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ (Constantinople) নামে পরিচিত হয়। ইহাকে নূতন রোমও (New Rome) বলা হইত।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নানাবিধ আভ্যন্তরীণ কারণে রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল। গথ (Goth), ভ্যাণ্ডাল (Vandal) প্রভৃতি বর্বর জাতির আক্রমণে ইহার পশ্চিম অংশ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল—কার্যতঃ রোমের রাজনৈতিক অধিকার বিলুপ্ত হইল। কিন্তু সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে এই বিপ্লব ঘটিল না, সেখানে কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌লের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল। প্রকৃতপক্ষে কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌কে কেন্দ্র করিয়া রোম সাম্রাজ্য বাঁচিয়া রহিল। ইহার নাম হইল পূর্ব রোম সাম্রাজ্য

(Eastern Roman Empire) বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য (Byzantine Empire)। পশ্চিম অঞ্চলে রোমের কর্তৃত্ব স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইল।

যে সকল বর্বর জাতির আক্রমণে এই বৃহৎ পরিবর্তন ঘটিল তাহারা পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন রাজ্য গঠন করিল এবং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইল। ইহাদের মধ্যে বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানী অঞ্চলের অধিবাসী ফ্রাঙ্ক (Franks) জাতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্ল্‌স্ রাজ্যবিস্তারে, খ্রীষ্টধর্মপ্রসারে এবং বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাই তিনি মহান্ চার্ল্‌স্ (Charles the Great বা Charlemagne) নামে পরিচিত। খ্রীষ্টধর্মগুরু রোমের পোপের সহযোগিতায় তিনি পশ্চিম অঞ্চলে রোম সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন (৮০০ খ্রীঃ)। রোমের সম্রাটরূপে তাঁহার অভিষেক ইউরোপের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

চার্ল্‌স্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য (Western Roman Empire) দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নানা কারণে এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইহার পুনরভ্যুত্থান ঘটে এবং জার্মানীর রাজা অটো (Otto the Great) রোমের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য নূতন নামে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টধর্মের সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ স্পষ্টভাবে সূচনা করিবার জন্য ইহাকে পবিত্র রোম সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) বলা হইত। নানাবিধ ঐতিহাসিক বিপর্যয় সত্ত্বেও এই সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল বাঁচিয়া রহিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ইহার বিলোপসাধন করেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্য কখনও পশ্চিম ইউরোপে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহার আধিপত্য কার্যতঃ জার্মানী ও ইটালী—এই দুইটিমাত্র দেশে সীমাবদ্ধ ছিল। এই দুইটিমাত্র দেশেও সম্রাটের কর্তৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল।

পূর্ব রোম সাম্রাজ্যে আভ্যন্তরীণ অনৈক্য এমন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। রোম সাম্রাজ্যের দুই বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা ছিল না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ধর্মসংক্রান্ত বিরোধ রোম ও কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌কে পৃথক করিয়া রাখিত। পশ্চিম এশিয়ায় পারস্য সম্রাটের সহিত সংগ্রামে এবং পরে তুর্কীদের সহিত যুদ্ধে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের

শক্তিক্ষয় হইয়াছিল। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা এশিয়া হইতে আসিয়া কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ অধিকার করে এবং পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ইহার ফলে ইউরোপের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীরা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করিল। যে ইউরোপ খ্রীষ্টধর্মরাজ্য (Christendom) রূপে পরিচিত ছিল সেখানে নূতন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটিল।

২। রেনেসাঁস ও ধর্মসংস্কার

রেনেসাঁস : সংস্কৃতির পুনর্জন্ম (Renaissance) : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটে। সম্রাট মহান্ চার্ল্‌সের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই অন্ধকারের যুগ (Dark Age) বর্তমান থাকে। কিন্তু চার্ল্‌সের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়, অন্ধকারের মধ্যে আলোকরশ্মি দেখা যায়। তাঁহার সময়ে সংস্কৃতির যে পুনর্জন্ম ঘটে তাহাকে ক্যারোলিঙ্গীয় যুগের রেনেসাঁস (Carolingian Renaissance) বলা হয় (তিনি ক্যারোলিঙ্গীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন)। এই সময় হইতে অন্ধকারের যুগের অবসান এবং মধ্য যুগের (Middle Ages) প্রকৃত সূত্রপাত ধরা হয়।

মধ্যযুগের রেনেসাঁস

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আর একটি রেনেসাঁস ঘটে। তখন মধ্য যুগের সভ্যতা পরিণতির পথে চলিয়াছে। এই সময় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস, ইটালীর অন্তর্গত বোলোনা (Bologna), ইংলণ্ডের অন্তর্গত অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয় এবং এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব (Theology), আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত চর্চা হইতে থাকে। অ্যারিস্টোটোলের (Aristotle) দর্শন এবং প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের আইন (Roman Civil Law) এই যুগের শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারা প্রভাবিত করিয়াছিল, কিন্তু শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব।

দুইটি রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপে জ্ঞানের প্রসার ঘটিল বটে, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত হইল না। সমগ্র মধ্যযুগে মানুষের মন ধর্মীয় চিন্তার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অ্যারিস্টোটোল এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাকারী পাদ্রীরা (Christian Fathers) যাহা বলিয়াছেন

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিনা দ্বিধায় তাহা মানিয়া লইতে হইত, নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া আপ্তবাক্যের যাথার্থ্য যাচাই করার অধিকার কাহারও ছিল না।

মধ্যযুগের সংস্কৃতির স্বরূপ

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ভাবধারার সহিত নূতন ইউরোপের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; সেকালের সাহিত্য, শিল্প ও জীবনাদর্শ মধ্য যুগের মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল। গ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের প্রভাব সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে প্রাচীন সভ্যতায় গ্রীষ্টধর্মবিরোধী পৌত্তলিক (Pagan) ভাব ছিল এবং সেই ভাবের সহিত পরিচয় ধর্মজীবন যাপনের পক্ষে অন্তরায়। স্বাধীন চিন্তাকে তাঁহারা বিধিনির্দিষ্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে গণ্য করিতেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই কূপমণ্ডুকতা মধ্যযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। সামন্ত প্রথার (Feudalism) কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান ছিল না। স্বাধীন চিন্তা এবং ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তি ছিল মধ্যযুগের সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগের শেষ দিকে এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়, ষোড়শ শতাব্দীতে এই পরিবর্তন পরিণতি লাভ করে। এই দীর্ঘকালব্যাপী

আধুনিক যুগের রেনেসাঁস

পরিবর্তনের মূল সূত্র ছিল স্বাধীন চিন্তা এবং ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি, ইহার মূল ভিত্তি ছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সংস্কৃতির সহিত নবলব্ধ ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ইউরোপের ইতিহাসে ইহাই রেনেসাঁস নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তী দুইটি রেনেসাঁস এই বৃহত্তর ও মহত্তর রেনেসাঁসের পূর্বাভাষ মাত্র।

পূর্বে ঐতিহাসিকেরা মনে করিতেন যে ১৪৫৩ গ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কন্‌স্ট্যান্টিনোপল্ অধিকার করিলে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী বহু পণ্ডিত পুঁথিপত্র সহ ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের প্রভাবে ইটালীতে গ্রীক সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার বহু

ইটালীতে রেনেসাঁস

পূর্বেই ইটালীতে রেনেসাঁসের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ দুইশত বৎসর কাল ইটালীর নগর-রাষ্ট্রগুলিতে পাণ্ডিত্য, সাহিত্য এবং শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই উপলক্ষে ফ্লোরেন্সের (Florence) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাকবি দান্তে (Dante), সাহিত্যিক পেত্রার্ক (Petrarch) ও বোকাচিও (Boccaccio), শিল্পী

মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (Michael Angelo), রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ ম্যাকিয়াভেল্লি (Machiavelli) প্রভৃতি পৃথিবীবিখ্যাত মনীষী এই সমৃদ্ধ নগরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ফ্লোরেন্সের শাসক লরেঞ্জো ড মেদিচি (Lorenzo de Medici) স্বয়ং শিল্পী এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। একমাত্র প্রাচীন এথেন্স ব্যতীত অন্য কোন নগরে সংস্কৃতির এমন ঔজ্জ্বল্য ("blinding splendour") দেখা যায় নাই। ভেনিস (Venice) নগরে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাফায়েল (Raphael) ইটালীর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন।

রেনেসাঁস যুগের ইটালী মধ্যযুগের সঙ্কীর্ণ, নিরানন্দ জীবনাদর্শ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের রসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে প্লেটোর (Plato) দর্শনের আলোচনা আরম্ভ হইল, গ্রীক নাট্যকারগণের রচনা সাগ্রহে পঠিত হইতে লাগিল। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জন্ম ঘটিল। মানুষের চিন্তা ও কল্পনার ক্ষেত্র প্রসারিত হইল। মধ্যযুগের কূপমণ্ডুকতা উদার মানবিকতায় (Humanism) ডুবিয়া গেল।

রেনেসাঁস কেবলমাত্র ইটালীতে সীমাবদ্ধ ছিল না, পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশেও প্রসারিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জার্মানীতে রেনেসাঁসের প্রভাবে শিল্পের বিকাশ এবং বিদ্যাচর্চার উন্নতি ঘটে। জার্মানীতে মুদ্রাযন্ত্রের (printing press) আবিষ্কার হয়, ফলে গ্রন্থপ্রচারের অসুবিধা দূর হইয়া বিদ্যাচর্চার সুযোগ সহজলভ্য হয়। জার্মান চিত্রশিল্পী হলবীন (Holbein) রেনেসাঁস যুগের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তি। হল্যাণ্ডে ওলন্দাজ পণ্ডিত ইরেসমাস (Erasmus) এবং ইংলণ্ডে সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ স্যার টমাস মোর (Sir Thomas More) 'নব্য পাণ্ডিত্যের' (New Learning) নায়ক ছিলেন।

পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁস

রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের সভ্যতা নূতন রূপ ধারণ করিল। জীবন সম্বন্ধে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনে নূতন প্রেরণা জোগাইল, নূতন অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করিল। অন্ধভাবে আপ্ত বাক্যের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, মানুষ এই শিক্ষা লাভ করিল। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম—সকল ক্ষেত্রেই যুক্তির নির্দেশ বলবৎ হইল। সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্য যুগের অবসান হইয়া জ্ঞানদীপ্ত আধুনিক যুগের সূচনা হইল।

রেনেসাঁসের ফল

ধর্মসংস্কার (Reformation) : মধ্য যুগে মানুষের জীবন ধর্ম দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। জীবনের মূল ভাবধারা হইতে দৈনন্দিন কার্য-কলাপের খুঁটিনাটি পর্যন্ত যাজকগণের নির্দেশে পরিচালিত হইত। যাজকগণের উপরে ছিলেন ধর্মগুরু পোপ (Pope)। তাঁহার আসন ছিল রোমে। পরাক্রান্ত পোপদের নির্দেশ অমান্য করিতে জনসাধারণ দূরে থাকুক, রাজগণও সাহসী হইতেন না। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের একাধিক সম্রাট পোপদের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইয়া বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন। পোপেরা দাবি করিতেন যে তাঁহারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি (vicegerent of God) এবং মানুষের আত্মার অধীশ্বর। সুতরাং তাঁহাদের নির্দেশের প্রতিবাদ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রূপে গণ্য হইত।

পোপের প্রাধান্য

মধ্য যুগের শেষদিকে খ্রীষ্টান যাজক(clergy)এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে (monks) নানাবিধ অনাচার প্রবেশ করে। ফলে জনসাধারণের উপর তাঁহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। স্বয়ং পোপেরাও বিলাসে ও অনাচারে লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত না। তাঁহারা ইটালীর অন্তর্গত একটি রাজ্যখণ্ড (Papal States) শাসন করিতেন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পোপ ছিলেন ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার (Alexander VI)। তিনি বিলাসপ্রিয় ও দুশ্চরিত্র ছিলেন; হীন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে এবং গুপ্তহত্যায় তাঁহার হস্ত কলঙ্কিত ছিল।

ধর্মসংস্কারের কারণ

পোপের কর্তৃত্ব ছিল আন্তর্জাতিক; দেশ ও জাতির সীমা নির্বিশেষে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। তিনি যে কেবল ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাহা নহে। শাসন ও বিচার সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁহার কর্তৃত্ব ছিল। নানা অজুহাতে তিনি বিভিন্ন দেশ হইতে নানাপ্রকার কর আদায় করিতেন। এই ভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহা পোপের ব্যক্তিগত বিলাসে এবং তাঁহার নিজস্ব রাজ্য রক্ষার জন্য ব্যয় করা হইত। মধ্য যুগের শেষ দিকে ইউরোপে জাতীয় ভাবের (Nationalism) উন্মেষ হইল। পূর্বে মানুষ নিজেকে খ্রীষ্টীয় জগতের (Christendom) সভ্যরূপে মনে করিত এবং ঐ জগতের প্রধান পোপকে কর দেওয়া স্বাভাবিক কর্তব্য-

রূপে গণ্য করিত। কিন্তু যখন মানুষ নিজেকে একটি বিশেষ দেশের (যেমন,—ফ্রান্স বা জার্মানী) নাগরিক রূপে ভাবিতে শিখিল তখন সে পোপকে একটি বিদেশী (ইটালীয়) রাজ্যের অধিপতিরূপে গণ্য করিতে লাগিল। কোন বিদেশীয় শক্তিকে কর দেওয়া বা তাহার নির্দেশ পালন করা জাতীয় স্বার্থ এবং স্বাধীনতার পরিপন্থী। মানুষের মনে এই নূতন ভাবের উৎপত্তি হওয়ায় পোপের আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের ভিত্তি নড়িয়া উঠিল। নিজেদের রাজ্যে নিজেদের অবাধ কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের রাজগণ নানাপ্রকারে পোপের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে লাগিলেন।

যে অন্ধ, বিচারবর্জিত ভক্তির প্রাবল্যে মধ্যযুগের মানুষ নির্বিচারে পোপের ও যাজক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিত তাহা রেনেসাঁসের প্রভাবে দুর্বল হইয়া পড়িল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যুক্তির সাহায্যে এই কর্তৃত্বের স্বরূপ ও প্রয়োজন পরীক্ষা করিতে লাগিল। ধর্মের নামে যে অনাচার দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছিল তাহা যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। স্বভাবতঃই মধ্যযুগের ধর্ম-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

জার্মানীতে ধর্মসংস্কার

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাইলেন একজন অখ্যাত জার্মান ধর্মযাজক। তাঁহার নাম মার্টিন লুথার (Martin Luther)। যাহারা এই প্রতিবাদের (protest) সমর্থন করিল তাহারা প্রোটেস্ট্যাণ্ট (Protestant) নামে পরিচিত হইল। যাহারা পূর্ববৎ পোপের অনুগত রহিল তাহাদিগকে বলা হইত রোমান ক্যাথলিক (Roman Catholic)। কয়েকজন জার্মান শাসকের সাহায্যে লুথারের আন্দোলন উত্তর জার্মানীতে সাফল্য লাভ করিল, কিন্তু দক্ষিণ জার্মানীতে ক্যাথলিক মতই প্রবল রহিল।

অন্যান্য দেশে ধর্মসংস্কা

জার্মানীর বাহিরে লুথারের মত প্রধানতঃ ডেনমার্ক, সুইডেন ও ইংলণ্ডে গৃহীত হইল। সুইজার্ল্যাণ্ডে পোপবিরোধী প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতের নূতন ব্যাখ্যা দিলেন দুইজন ধর্মসংস্কারক—ক্যাল্‌ভিন (Calvin) ও জুইঙ্গলি (Zwingli)। ক্যাল্‌ভিনের মত (Calvinism) ফ্রান্সে ও স্কটলণ্ডে প্রচারিত হইল, কিন্তু ফ্রান্সে ক্যাথলিক-গণের প্রবল সংখ্যাধিক্য রহিল। ইটালী ও স্পেন পোপের প্রতি অনুগত রহিল।

লুথার কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পশ্চিম ইউরোপ ধর্ম সম্বন্ধে দুইটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইল। মধ্যযুগে ধর্মসংক্রান্ত যে ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গেল। এক শতাব্দীর অধিক কাল ইউরোপ ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধে বিপর্যস্ত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্মযুদ্ধের (Wars of Religion) যুগের অবসান হইল।

ধর্মজগতে অনৈক্য

৩। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য

রেনেসাঁস এবং ধর্মসংস্কারের যুগে ইউরোপের মানুষ ইউরোপের সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নাই। এই যুগেই পৃথিবীর ইউরোপীয়করণ (Europeanisation of the world) আরম্ভ হয়।

বিভিন্ন মহাদেশে ইউরোপীয় জাতিসমূহের বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন ঃ গত কয়েকশত বৎসর ইউরোপের বিভিন্ন জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আধুনিক যুগের (Modern Age) ইতিহাসে 'ইউরোপের প্রসার' (Expansion of Europe) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইউরোপের দেশগুলি যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে অন্যান্য মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন (colonisation) এবং বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা নহে। রেনেসাঁস বা সংস্কৃতির পুনর্জন্ম মানুষের মনে অজানাকে জানিবার এবং নূতনকে আবিষ্কার করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। কিন্তু প্রধানতঃ ধর্মসংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপের প্রসার আরম্ভ হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহার সূত্রপাত হয়, ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইহা পরিণতি লাভ করে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতেও ইউরোপের প্রসার অব্যাহত গতিতে চলিয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকা অনেকাংশে ইউরোপের ঔপনিবেশিক প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

মধ্যযুগের (Middle Ages) শেষদিকে আর্থিক ক্ষেত্রে নানাবিধ অভাবের প্রতিকারের জন্য ইউরোপের জাতিগুলির পক্ষে ইউরোপের বাহিরে নূতন সুযোগ-সুবিধার সন্ধান করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে ইউরোপই আকারে সকলের চেয়ে ছোট। জীবন ধারণের জন্য

প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যের জন্য ইউরোপ মধ্য যুগে অপর দুইটি মহাদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। মশলা, তূলা প্রভৃতি ইউরোপে মোটেই উৎপন্ন হয় না; সোনা, রূপা, রেশম প্রভৃতি ইউরোপে উৎপন্ন হইলেও ইহার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। মধ্য যুগে ইউরোপ প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিত। ধর্মযুদ্ধের (Crusades) যুগে ইউরোপে এশিয়া হইতে আমদানি দ্রব্যাদির চাহিদা বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি নগরের বণিকেরা আরব বণিকদের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান করিত। এই বাণিজ্য হইতে ইটালীয় বণিকদের প্রচুর লাভ হইত।

অর্থনৈতিক প্রয়োজন

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মধ্য প্রাচ্যে (Middle East) তুর্কীদের (Ottoman Turks) আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে এশিয়ার সহিত আরব ও ইটালীয় বণিকদের বাণিজ্যে বাধা পড়ে। কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌লে তুর্কীদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে (১৪৫৩ খ্রীঃ) ইটালীর সহিত প্রাচ্য দেশের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে ইউরোপে এশিয়া হইতে আমদানি দ্রব্যাদির অভাব বাড়িতে থাকে। তখন পশ্চিম ইউরোপের সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত কয়েকটি দেশ—পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্ (বর্তমান হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম)—এই সকল দ্রব্য সংগ্রহের জন্য আরব ও ইটালীয় বণিকদের উপর নির্ভর না করিয়া সাক্ষাৎভাবে এশিয়ার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।

ধর্মপ্রচার

এইভাবে যখন অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল সেই সময়ে খ্রীষ্টান পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরা (monks) ইউরোপের বাহিরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং প্রচারকদের দৃষ্টি এশিয়া ও আফ্রিকার উপর পড়িয়াছিল। ফলে খ্রীষ্টান বণিক ও ধর্মপ্রচারক এক সঙ্গে বিশ্ববিজয়ের জন্য যাত্রা করিল এবং অদম্য উৎসাহ, সাহস ও অধ্যবসায়ের ফলে তাহারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল।

পৃথিবীর ভূগোল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে এবং নাবিকগণ সমুদ্র-পথে নৌচালন (navigation) কার্যে অভিজ্ঞ না হইলে ইউরোপের বণিক ও ধর্মপ্রচারকগণ তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইত না। মধ্য যুগের শেষ দিকে

নানা ভাবে—বিশেষতঃ আরব বণিকদের সাহচর্যে—ইউরোপীয়েরা এই দুইটি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক, ধর্মপ্রচারক ও বণিক জলপথে চীন দেশে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ভেনিসীয় বণিক মার্কো পোলোর (Marco Polo) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে ইউরোপ প্রাচ্য দেশের সমৃদ্ধির সহিত পরিচিত হয়। মধ্য যুগের শেষ দিকে পৃথিবীর আকৃতি ও বিভিন্ন দেশের অবস্থান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল এবং নানাবিধ মানচিত্র অঙ্কিত হইতেছিল। সমুদ্রে জাহাজের পথ নির্দেশের জন্য নানাপ্রকার যন্ত্রের (compass, astrolabe) ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। জাহাজ নির্মাণ শিল্প ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছিল। এই সকল কারণে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপ বাণিজ্য ও ধর্মবিস্তারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সামুদ্রিক অভিযান প্রেরণে সমর্থ হয়।

ভৌগোলিক জ্ঞান ও নৌচালন-বিদ্যায় পারদর্শিতা

ভৌগোলিক আবিষ্কার : এই সকল সামুদ্রিক অভিযানে পথপ্রদর্শক ছিল পর্তুগাল ও স্পেন। জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া পর্তুগীজগণ আফ্রিকার উপকূলবাসী মুসলমানদের (Moors) সহিত যুদ্ধ করিত। এই উপলক্ষে আফ্রিকা সম্বন্ধে তাহাদের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয় এবং আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষে ও চীনে যাওয়া সম্ভব বলিয়া তাহারা অনুমান করে। পর্তুগালের রাজবংশীয় কুমার হেনরী (Prince Henry the Navigator) সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক বার্থোলোমিও দিয়াজ (Bartholomew Diaz) উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) আবিষ্কার করেন। দশ বৎসর পরে ভাস্কো দা গামা (Vasco da Gama) ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ইহার পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পর্তুগীজ নাবিক ও বণিকগণ সিংহল, সুমাত্রা, চীন ও জাপানে উপস্থিত হয়। বণিকদের সহযোগিতায় খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ এই সকল দেশে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে থাকে।

পর্তুগাল

ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ার অধিবাসী নাবিক কলম্বস (Columbus) মনে

করিতেন যে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে ভারতবর্ষে এবং চীনে যাওয়া যাইবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজা ও রাণীর আনুকূল্যে স্পেন হইতে সমুদ্রযাত্রা করেন এবং আমেরিকা মহাদেশের সংলগ্ন একটি দ্বীপে (San Salvador, বর্তমান বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত Watling Island) উপস্থিত হন। তিনি যে একটি নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার আবিষ্কৃত দেশই ভারতবর্ষ (Indies)। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক কেব্রেল (Cabral) সমুদ্রপথে ভারতের সন্ধানে বহির্গত হইয়া ঝড়ে ও স্রোতের বেগে দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং বর্তমানে ব্রাজিল নামে পরিচিত দেশ আবিষ্কার করেন। কিছুদিন পরে ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্সের অধিবাসী আমেরিগো ভেস্‌পুচি (Amerigo Vespucci) নামক এক নাবিক নিজেকে নূতন মহাদেশের আবিষ্কর্তা বলিয়া প্রচার করেন। অতঃপর এক জার্মান অধ্যাপকের প্রস্তাব অনুসারে নবাবিষ্কৃত মহাদেশ আমেরিগোর নামের সহিত যুক্ত হইয়া 'আমেরিকা' নামে পরিচিত হয়। কয়েক বৎসর পরে পর্তুগীজ নাবিক ম্যাজেলান (Magellan) স্পেনের রাজার অধীনে চাকুরী লইয়া সমুদ্রযাত্রা করেন। আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং বর্তমানে যে প্রণালীটি তাঁহার নামে পরিচিত (Straits of Magellan) উহার মধ্য দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। ম্যাজেলানই সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে ভূপ্রদক্ষিণ করেন এবং ইউরোপ ও এশিয়ার পশ্চিমদিকের সমুদ্রপথ (western sea route) আবিষ্কার করেন। ক্রমে স্পেন দেশ হইতে বহু ভাগ্যান্বেষী নাবিক ও পাদ্রী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হয় এবং নূতন মহাদেশের বিভিন্ন অংশে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে।

স্পেন

আমেরিকা আবিষ্কার

পশ্চিম ইউরোপের আর দুইটি দেশ—ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিল না। ইংলণ্ডরাজ সপ্তম হেনরীর নির্দেশে ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ার অধিবাসী নাবিক জন ক্যাবট (John Cabot) ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আটলান্টিক

ইংলণ্ড

মহাসাগর অতিক্রম করিয়া নূতন মহাদেশে উপস্থিত হন। তিনি ও তাঁহার পুত্র সিবাস্টিয়ান ক্যাবট (Sebastian Cabot) নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং ল্যাব্রাডর আবিষ্কার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসীরাজ প্রথম ফ্রান্সিসের পৃষ্ঠ-পোষকতায় দুইটি সামুদ্রিক অভিযান উত্তর আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল। ফরাসী নাবিক কার্টিয়ার ক্যানাডায় উপস্থিত হন।

ফ্রান্স

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল : এই সকল সামুদ্রিক অভিযানের ফলে পৃথিবীর ভূগোল সম্বন্ধে ইউরোপের মানুষ নূতন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিয়াছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। মানুষের নবজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা ক্রমশঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আরম্ভ হইল। দ্বিতীয়তঃ, নবাবিষ্কৃত দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইউরোপের কয়েকটি দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। নিম্নে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

রাজনৈতিক ফল

তৃতীয়তঃ, ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহার অসামান্য গুরুত্ব ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র ইউরোপীয় দেশগুলির সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারিত হইল। এই বাণিজ্যের ফলে ঐ দেশগুলি প্রচুর আর্থিক সম্পদের অধিকারী হইল। ঐ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তাহারা পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইল। ঔপনিবেশিক এবং বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইউরোপে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। চতুর্থতঃ, সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ভূমধ্য সাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে স্থানান্তরিত হইল। ফলে ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইটালীয় বাণিজ্য-নগরীগুলির সমৃদ্ধি হ্রাস পাইল, আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলির (পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, নেদারল্যাণ্ড্স্) সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুযোগ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফল এই সকল দেশের সাহিত্যে ও শিল্পেও লক্ষ্য করা যায়। ইটালীর নগর-সংস্কৃতি ম্লান হইয়া পড়িল, ইংলণ্ডের সাহিত্য নূতন উদ্দীপনায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

বাণিজ্যিক ফল

সামুদ্রিক বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হইল। ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক (feudal) সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বাণিজ্যকেন্দ্রিক সমাজ গড়িয়া উঠিল। এই

নূতন সমাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব স্থাপিত হইল। ইউরোপে স্বাধীন চিন্তার প্রসারে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অগ্রণী হইল। রাষ্ট্রগঠনে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সাহিত্যে ও শিল্পে তাহাদের প্রভাব প্রবল হইল।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফল

নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে দাস ব্যবসায়ের (slave trade) কাহিনী এক কলঙ্কিত অধ্যায়। নূতন মহাদেশে জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ জমি চাষ করিবার পক্ষে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা অতি অপ্রচুর ছিল। এই অভাব পূরণের জন্য আফ্রিকা হইতে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে ধরিয়া নিয়া আমেরিকায় বিক্রয় করা হইত। বিক্রয়ের পূর্বে ও পরে এই হতভাগ্য মানুষগুলির উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে দাস ব্যবসায় প্রথার অবসান ঘটে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য (Colonial Empire) : পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সামুদ্রিক অভিযানের ফলে পৃথিবীর একটি বৃহৎ অংশে ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ খ্রীষ্টীয় জগতের প্রধান রূপে ঘোষণা করেন যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হইতে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (East Indies) পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডে বাণিজ্য ও রাজত্ব করিবার অধিকার একমাত্র পর্তুগালের থাকিবে। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একজন পোপ উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত একটি কাল্পনিক সীমারেখা টানিয়া পূর্বাংশে পর্তুগালের এবং পশ্চিমাংশে স্পেনের একচেটিয়া অধিকার ঘোষণা করেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ (ব্রাজিল) পর্তুগালের ভাগে পড়িল, স্পেন পাইল সমগ্র উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ।

স্পেন ও পর্তুগাল

পর্তুগাল এই বিশাল সাম্রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন অপেক্ষা বাণিজ্য বিস্তারেই বেশী উৎসাহী ছিল। কেবলমাত্র ব্রাজিলেই পর্তুগালের স্থায়ী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকায় স্পেনের সাম্রাজ্য উপনিবেশ স্থাপনের ভিত্তিতেই গঠিত হইয়াছিল। স্পেনীয় সেনানায়ক কর্তেজ (Cortez) এবং পিসারো (Pizarro) বর্বরোচিত নৃশংসতার সাহায্যে যথাক্রমে মেক্সিকো এবং পেরু অধিকার করেন। নূতন মহাদেশ হইতে প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য,

নূতন মহাদেশে স্পেনীয় সাম্রাজ্য

মণিমাণিক্যাদি স্পেনে আনীত হয়। স্পেন দেশ হইতে বহু লোক নূতন মহাদেশে যাইয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে নূতন মহাদেশে স্পেনদেশীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল স্পেনের রাজার শাসনাধীনে আসে। অতঃপর ষাট বৎসরকাল পর্তুগাল ও স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্য সম্মিলিতভাবে স্পেনের কর্তৃত্বাধীন থাকে। দীর্ঘকাল পরে—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে—দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের অধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে।

উপরে দুইজন পোপের যে নির্দেশগুলির কথা বলা হইয়াছে তাহা পর্তুগাল ও স্পেন ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলি মানিয়া লয় নাই। এলিজাবেথের রাজত্বকালে (১৫৫৮-১৬০৩) ইংলণ্ড সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারে এবং উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রসর হয়। হকিন্স (Hawkins), ড্রেক (Drake), ক্যাভেণ্ডিস (Cavendish), র‍্যালে (Raleigh) প্রভৃতি দুঃসাহসী নাবিকগণ সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের প্রাধান্য স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বাণিজ্যের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।

ইংলণ্ডের উপনিবেশ

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তর আমেরিকায় স্থায়ী ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রপাত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের দশটি সমৃদ্ধ উপনিবেশ ছিল এবং ইহাদের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারে এবং উপনিবেশ স্থাপনে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল স্পেন, নেদারল্যাণ্ড্স্ বা ইউনাইটেড প্রভিন্সেস্ (United Provinces অর্থাৎ বর্তমান হল্যাণ্ড) এবং ফ্রান্স। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং স্পেনের দুর্বলতার সুযোগে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স স্ব স্ব সমৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল।

ওলন্দাজেরা (the Dutch) অর্থাৎ হল্যাণ্ডবাসীরা পর্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করিয়া সিংহলে এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (East Indies)— জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে—প্রাধান্য স্থাপন করে। ভারত, চীন এবং জাপানের বাণিজ্য অনেকাংশে তাহাদের হস্তগত হয়। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে নবস্থাপিত বাটাভিয়া (Batavia) শহরে বিশাল ও সমৃদ্ধ ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত

ওলন্দাজ সাম্রাজ্য

হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই উত্তর আমেরিকায় হল্যাণ্ডের বাণিজ্য প্রসারিত হয় এবং উপনিবেশ (New Netherlands) স্থাপিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সহিত হল্যাণ্ডের বাণিজ্য ও উপনিবেশ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং দুই দেশের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে উত্তর আমেরিকায় ওলন্দাজনগরী নিউ আম্‌স্টারডাম ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং তাহারা ইহার নূতন নাম দেয় নিউ ইয়র্ক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে উভয়ে সম্মিলিত ভাবে ফ্রান্সের বিরোধিতা করিতে থাকে।

ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্স উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এই প্রচেষ্টার পরিণতি স্বরূপ ক্যানাডা এবং নোভা স্কোটিয়ায় (Nova Scotia) ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানাডায় কুইবেক (Quebec) শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফরাসী জাতির ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। আফ্রিকায় এবং ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের দিকে তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এমন কি সুদূর প্রাচ্য (Far East)—অর্থাৎ চীন ও জাপান—পর্যন্ত তাহাদের কর্মভূমি প্রসারিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের উপনিবেশ

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা : সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৬৮৯-১৮১৫) পর্যন্ত ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায়, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৭৪০-১৮১৫) পর্যন্ত ভারতবর্ষে, ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে ছিল প্রধানতঃ ইউরোপের বাহিরে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য দুই দেশের প্রবল আগ্রহ। ইউরোপে দুই দেশের মধ্যে প্রবল স্বার্থসংঘর্ষ ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি জনবহুল হইলেও ফরাসী উপনিবেশগুলির চেয়ে আকারে ছোট ছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশ ও বাণিজ্য-কেন্দ্র পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। আফ্রিকায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যকেন্দ্র

ছিল—ফ্রান্সের মাদাগাস্কার, ইংলণ্ডের গাম্বিয়া ও স্বর্ণোপকূল (Gold Coast) —কিন্তু 'অন্ধকার মহাদেশে' (Dark Continent) উপনিবেশ স্থাপনের যুগ তখনও আসে নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল মাদ্রাজ, বোম্বাই ও নবস্থাপিত কলিকাতা। ফরাসীদের দক্ষিণ ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র পণ্ডিচেরী মাদ্রাজের একশত মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল, আর বাঙ্গালায় ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর ছিল কলিকাতার অতি নিকটে।

সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে তুলনা

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সই অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ইউরোপে তখন ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইর (Louis XIV) প্রবল প্রতাপ, ধনবলে ও সামরিক শক্তিতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফ্রান্সে জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে ফ্রান্স ইউরোপের শীর্ষস্থানীয়। ইংলণ্ড সামরিক শক্তিতে নগণ্য এবং দীর্ঘকালব্যাপী আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘর্ষে দুর্বল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে পৃথিবীব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইংলণ্ডের জয় হইয়াছিল। এই কারণগুলির মধ্যে সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের শক্তিবৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : হল্যাণ্ডের সহযোগিতাও ইংলণ্ডের পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের জয়

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধি (Treaty of Utrecht) দ্বারা ইউরোপে একটি দীর্ঘকালব্যাপী প্রবল যুদ্ধের (War of Spanish Succession) সমাপ্তি ঘটে। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে ফ্রান্সের রাজবংশের এক কুমার স্পেনের সিংহাসন লাভ করিলেন, ফলে ইউরোপে এবং আমেরিকায় স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার হস্তগত হইল। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রহিল না, কারণ সন্ধির একটি সর্ত এইরূপ ছিল যে ফ্রান্স ও স্পেন কখনও একই রাজার শাসনাধীন হইবে না। উত্তর আমেরিকায় ফরাসী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নোভা স্কোটিয়া ইংলণ্ডের অধীন হইল এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যাংশ সম্বন্ধে ফ্রান্স নিজের দাবি পরিত্যাগ করিল। স্পেনের নিকট হইতে ইংলণ্ড পাইল জিব্রাণ্টার এবং মিনর্কা দ্বীপ ; ফলে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশে ইংরেজদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। স্পেনের সহিত একটি পৃথক সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ড আমেরিকায় নিগ্রো

ইউট্রেক্টের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ডের লাভ

ক্রীতদাস চালান দিবার অধিকার পাইল। ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে ইউট্রেক্টের সন্ধির অসাধারণ গুরুত্ব রহিয়াছে।

ইউট্রেক্টের সন্ধির ফলে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিবৃত্তি ঘটে নাই। সম্রাট ঔরংজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) কিছুকাল পরে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সকল কারণ সম্মিলিতভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল দুইটি প্রবল ইউরোপীয় যুদ্ধে (অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ)। এই দুইটি যুদ্ধের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইঙ্গ-ফরাসী সংগ্রাম

ইংলণ্ড ও স্পেন: ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে—ইংলণ্ড ও স্পেন পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে ছিল ধর্মসংক্রান্ত বিরোধ এবং রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের সংঘর্ষ। আমেরিকা ও স্পেনের বাণিজ্য ও উপনিবেশ সংক্রান্ত একচেটিয়া অধিকার ইংলণ্ড স্বীকার করিতে পারে নাই। আটলান্টিক মহাসাগরে ইংলণ্ড ও স্পেনের বাণিজ্যপোত প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত হইত। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের পরাক্রান্ত নৌবাহিনী (Armada) ইংলণ্ড আক্রমণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনা স্পেনের দুর্বলতা এবং ইংলণ্ডের ক্রমবর্ধমান নৌ-শক্তির ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু ইহার পরেও দুই দেশের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন দুর্বল হইয়া পড়ে, উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের বাণিজ্য এবং উপনিবেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

স্পেনের দুর্বলতা

—

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানদীপ্তির যুগে ইউরোপ

ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী—বিশেষতঃ ইহার দ্বিতীয়ার্ধ—জ্ঞানদীপ্তির যুগ (Age of Enlightenment) নামে পরিচিত। জ্ঞানদীপ্তির প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ফল ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের মূল নীতি জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র গঠন। এই মূলনীতিই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ভিত্তি। এই দুইটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখবন্ধ রূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

১। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা : অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের শক্তি, ঐশ্বর্য ও মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড একটি সম্মিলিত রাজ্য ছিল। ইহার অধিপতি ছিলেন জার্মানী হইতে আগত হ্যানোভেরীয় (Hanoverian) বংশের রাজগণ। দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে (১৭২৭-১৭৬০) ক্যানাডা ইংলণ্ড কর্তৃক বিজিত হয় এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে (১৭৬০-১৮২০) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু উত্তর আমেরিকায় পুরাতন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (United States of America) পরিণত হয়। ইংলণ্ডে এই সময়ে পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত ছিল। এই যুগেই শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) ইংলণ্ডের অতুল সমৃদ্ধির সূত্রপাত করে।

ইংলণ্ড

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন বুর্বোঁ (Bourbon) বংশীয় পঞ্চদশ লুই (১৭১৫-১৭৭৪)। তিনি রাজকার্যে মনোযোগ দিতেন না, মন্ত্রী ও পারিষদবর্গের উপর রাজ্যশাসনের ভার দিয়া নিজে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাইতেন। তাঁহার অকর্মণ্যতা, রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতা এবং বিলাসপ্রিয়তার

ফ্রান্স

ফলে ফ্রান্স ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। এই প্রসঙ্গে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ও ক্ষতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষায়, সভ্যতায়, ঐশ্বর্যে ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যমণি ছিল ; কিন্তু কুশাসন ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা-হানির ফলে ফরাসী জাতি সকলের অলক্ষ্যে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

স্পেন

ইউট্রেক্টের সন্ধি (১৭১৩) অনুসারে ফ্রান্সের বুর্বোঁ রাজবংশের এক কুমার স্পেনের সিংহাসন লাভ করেন। স্পেন তখনও দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিত বটে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে তাহার যে শক্তি, ঐশ্বর্য ও মর্যাদা ছিল তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের সহিত যোগ দিয়াছিল ; ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ইহার মুখ্য কারণ। ঐ যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের গ্লানি স্পেনকেও স্পর্শ করিয়াছিল। ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে স্পেন আর কখনও প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণ ইটালী (নেপল্‌স্ ও সিসিলী দ্বীপ) এবং ইটালীর অন্তর্গত পার্মা (Parma) নামক রাজ্যখণ্ড (Duchy) স্পেনের রাজবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল।

জার্মানী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানী তিনশতেরও বেশী রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল। নামে এই রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলি 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে'র (Holy Roman Empire) অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কার্যতঃ সম্রাটের কোন ক্ষমতা ও অধিকার ছিল না—প্রতিটি রাজ্য বা রাজ্যখণ্ড স্থানীয় শাসকের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হইত। নয়টি রাজ্যখণ্ডের শাসক নির্বাচক (Elector) রূপে সম্রাট মনোনয়ন করিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচনের বিশেষ কোন অর্থ ছিল না—কয়েক শতাব্দী যাবৎ অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ (Hapsburg)-বংশীয় অধিপতিরা সম্রাটের পদ অধিকার করিতেছিলেন। জার্মানীতে রাজনৈতিক অনৈক্য বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিবেশী ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি এই অনৈক্যের সুযোগ লইয়া বিভিন্ন সময়ে জার্মানীতে স্ব স্ব প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল।

প্রাশিয়া

জার্মানীর রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল প্রাশিয়া (Prussia)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতিস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় এবং জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয়। প্রাশিয়ার

শাসন-ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল। প্রাশিয়ার সৈন্যদল সংখ্যায় ও রণকৌশলে প্রবল ছিল। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (Frederick II বা Frederick the Great, ১৭৪০-১৭৮৬) বুদ্ধিবলে, রণকৌশলে, প্রজাহিতৈষিতায় এবং উচ্চাভিলাষে সেকালের রাজগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া সাইলেশিয়া (Silesia) প্রদেশ অধিকার করেন।

জার্মানীর অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ব্যাভেরিয়া (Bavaria), স্যাক্সনী (Saxony) ও হ্যানোভার (Hanover) উল্লেখযোগ্য। হ্যানোভারের অধিপতি আবার ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন এবং ইংলণ্ডে থাকিয়াই তিনি হ্যানোভার শাসন করিতেন।

অস্ট্রিয়া

সাম্রাজ্যের আয়তনে এবং পদমর্যাদায় অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশ দীর্ঘকাল ইউরোপে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এই বংশের অধিপতিরা কয়েক শতাব্দীকাল 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে'র (Holy Roman Enpire) সম্রাটের পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অস্ট্রিয়া ও তৎসংলগ্ন প্রদেশসমূহ ব্যতীত বোহেমিয়া (Bohemia), হাঙ্গেরী (Hungary), নেদারল্যাণ্ডস্ বা বেলজিয়ম (Austrian Netherlands বা Belgium) এবং ইটালীর অন্তর্গত মিলান (Milan) হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশের শাসনাধীন ছিল। এই সাম্রাজ্য আয়তনে বিশাল হইলেও ইহার জাতিগত, ধর্মগত ও ভৌগোলিক ঐক্য ছিল না। বিভিন্ন ভাষাভাষী, পরস্পরবিরোধী স্বার্থসাধনে উন্মুখ বহু রাজ্যখণ্ডের সম্মিলনে গঠিত সাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা কারণে—বিশেষতঃ প্রাশিয়ার অভ্যুত্থানের ফলে—জার্মানীতে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সম্রাটবংশের প্রতিপত্তি খর্ব হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসা (Maria Theresa, ১৭৪০-১৭৮০) অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিক কর্তৃক পরাজিত হইয়া সাইলেশিয়া প্রদেশ তাঁহাকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পোল্যাণ্ড

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিবেশী পোল্যাণ্ড (Poland) অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাশিয়া, রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া এই দুর্বল দেশটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল (Three Partitions of Poland, ১৭৭২, ১৭৯৩, ১৭৯৫)। ফলে পোল্যাণ্ডের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ডের তিনটি খণ্ড পুনরায় সম্মিলিত হয় এবং স্বাধীনতা লাভ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পীটারের (Peter the Great) রাজত্বকালে রাশিয়া ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করে। উত্তরে সুইডেন এবং দক্ষিণে তুর্কী— এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যকে পরাজিত করিয়া তিনি রাশিয়ার রাজ্যবিস্তার, বাণিজ্যবিস্তার এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে দ্বিতীয় ক্যাথারিন (Catherine II বা Catherine the Great, ১৭৬২-১৭৯৬) রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে নানাদিকে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ও মর্যাদাবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি পোল্যাণ্ডের এক বৃহৎ অংশ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বারবার তুর্কীকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণে রাজ্যবিস্তার করেন।

রাশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের এক বৃহৎ অংশ তুর্কী সাম্রাজ্যের (Ottoman Empire, Turkey) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য (Middle East) তুর্কীর সুলতানের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ নানা কারণে তুর্কী ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ইহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া। তুর্কীর দুর্বলতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে যে রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাকে 'প্রাচ্য সমস্যা' (Eastern Question) বলা হইত।

তুর্কী সাম্রাজ্য

ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না, স্বাধীনতাও ছিল না বলিলেই চলে। উত্তরে মিলান (Milan) অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল; দক্ষিণে নেপল্‌স্ (Naples) ও সিসিলী (Sicily) স্পেনের রাজবংশের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। মধ্য ইটালীতে রোমকে কেন্দ্র করিয়া পোপের রাজ্যখণ্ড (Papal States) অবস্থিত ছিল। ভেনিস (Venice) স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ছিল।

ইটালী

ইউরোপের উত্তরাংশে সুইডেন (Sweden) সপ্তদশ শতাব্দীতে পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নানা কারণে—বিশেষতঃ রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির ফলে—ইহার শক্তি ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সুইডেন

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (War of Austrian Succession): ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়।

অস্ট্রিয়ার অধিপতি সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি কন্যা মারিয়া থেরেসাকে (Maria Theresa) উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং এই মনোনয়ন সংক্রান্ত দলিল (Pragmatic Sanction) ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গ অনুমোদন করিয়াছিল। কিন্তু প্রাশিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (Frederick II, Frederick the Great) উক্ত দলিল অগ্রাহ্য করিয়া অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত সাইলেশিয়া (Silesia) আক্রমণ করিলেন। অস্ট্রিয়ার প্রতি শত্রুতা বশতঃ ব্যাভেরিয়া (Bavaria), ফ্রান্স ও স্পেন তাঁহার সহিত যোগ দিল। ফ্রান্স ও স্পেনের প্রতি শত্রুতাবশতঃ ইংলণ্ড অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিতে লাগিল।

যুদ্ধের কারণ

দীর্ঘ আট বৎসরব্যাপী (১৭৪০-১৭৪৮) যুদ্ধের পর আয়লা সেপেলের সন্ধি (Peace of Aix-la-Chapelle) দ্বারা ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইল (১৭৪৮)। সাইলেশিয়া ফ্রেডারিকের অধীন রহিল। ইউরোপে আর কোন পরিবর্তন হইল না, ফ্রান্সের কোন লাভ হইল না।

যুদ্ধের ফল

এই ইউরোপীয় যুদ্ধ উপলক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূতন মহাদেশে (উত্তর আমেরিকায়) এবং ভারতবর্ষে প্রসারিত হইয়াছিল। আমেরিকায় "রাজা জর্জের যুদ্ধে" (King George's War) এবং দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক যুদ্ধে (Carnatic War) ইংরেজ ও ফরাসীর শক্তি পরীক্ষা হইয়াছিল। এই দুইটি যুদ্ধের ফলে কোন পক্ষই আমেরিকায় বা ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে জয়লাভ করিতে পারে নাই। যুদ্ধাবসানে পরস্পরের বিজিত রাজ্যখণ্ড পরস্পরকে প্রত্যর্পণ করায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারত ও আমেরিকায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Seven Years' War): আয়লা সেপেলের সন্ধি সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। ইহার পরবর্তী আটবৎসরকালের মধ্যে ইউরোপের কূটনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। ফ্রান্স প্রাশিয়ার পক্ষ ত্যাগ করিয়া অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করে এবং ইংলণ্ড অস্ট্রিয়ার পক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করে। ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন "কূটনৈতিক বিপ্লব" (Diplomatic Revolution) নামে পরিচিত। এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়

১৭৫৬) এবং সাত বৎসর পরে (১৭৬৩) প্যারিসের সন্ধি (Peace of Paris) দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে তিনপ্রকার স্বার্থের সংঘর্ষ ছিল: (১) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় বাণিজ্য এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব; (২) প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সাইলেশিয়া সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব; (৩) ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে রাইন (Rhine) নদী অঞ্চলে আধিপত্যের জন্য দ্বন্দ্ব। এই যুদ্ধে ফ্রান্স বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ইউরোপে ফরাসী বাহিনী প্রাশিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক কর্তৃক পরাজিত হয়। ফ্রেডারিক ইংলণ্ড হইতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য পাইয়া নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা দূর হইল এবং ফ্রান্সের অধিকার চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহে—এই চারিটি স্থানে সীমাবদ্ধ রহিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) ফরাসী অধিকার সঙ্কুচিত হইল। উত্তর আমেরিকাস্থিত ফরাসী উপনিবেশ ক্যানাডা ইংলণ্ডের হস্তগত হইল। সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ পরিষ্কৃত হইল। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের ইতিহাসে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্রান্সের ক্ষতি, ইংলণ্ডের লাভ

এই যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার অবস্থা পরিবর্তিত হয় নাই। সাইলেশিয়া প্রাশিয়ার অধিকারভুক্ত রহিল, অস্ট্রিয়া এই প্রদেশটি পুনরধিকার করিতে পারিল না। ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হইল।

২। জ্ঞানদীপ্তির যুগ

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে মানসিক বিপ্লব (Intellectual Revolution) আখ্যা দিয়াছেন। মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপের মনীষা বিকশিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তিতে ধর্ম ও আইনের আলোচনা করা হইত, ধর্মবিরোধী বলিয়া বিজ্ঞানকে অবহেলা করা হইত। রেনেসাঁস ও ধর্মসংস্কারের

মানসিক বিপ্লব

(Reformation) ফলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল, যুক্তি ও বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া মনীষার বিকাশ আরম্ভ হইল। ইহা একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সন্দেহ নাই। ইহার ফলে কেবল যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন ভাব ও তথ্য আবিষ্কৃত হইল তাহা নহে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেমন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, সমাজ-ব্যবস্থায় এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে —মানুষ নূতন পথে চলিতে শিখিল। জ্ঞানের প্রভাব মানুষের মনে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বহির্জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। ইউরোপের ইতিহাসে ইহাই জ্ঞানদীপ্তির যুগ (Age of Enlightenment)। বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদের সম্মিলিত সাধনায় এই যুগ সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

জ্ঞানদীপ্তি

জ্ঞানদীপ্তির যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) নবরূপ ধারণ করে, সমাজ বিজ্ঞানের (Social Science) বৈজ্ঞানিক রীতিসম্মত আলোচনার সূত্রপাত হয়, দর্শন সম্বন্ধে নূতন চিন্তাধারা ধর্মকে প্রভাবিত করে, সমাজে মানবিকতাবোধ humanism) প্রসারিত হয়, শিল্পে প্রাচীন রীতি ও নূতন রোমান্টিক ভাবের (romanticism) সমন্বয় ঘটে। স্বভাবতঃই এই সকল সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ফল রাজনীতি ও সমাজ-গঠনের ক্ষেত্রে সংক্রামিত হইয়াছিল। যে অনুসন্ধিৎসা ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবরূপে দেখা দিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যুক্তিবাদের (rationalism) প্রাধান্য। ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, আইন, অর্থনীতি, শাসন-পদ্ধতি—জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ প্রবল হইল; যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য নির্ধারণ করা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়াইল। ফলে প্রাচীন সংস্কারগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, শাস্ত্রে ও দৈব ব্যবস্থায় মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গেল এবং নবজাগ্রত মানুষের মনে নূতন অধিকার ও মর্যাদা লাভের আশা বলবতী হইল।

যুক্তিবাদের প্রভাব

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি ঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নূতন আবিষ্কারের সংখ্যা বেশী নয়। এই যুগের বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানতঃ কোপার্নিকাস্ (Copernicus), গ্যালিলিও (Galileo) প্রভৃতি পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকগণের মতামত সম্বন্ধে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এই যুগে বিজ্ঞান মুষ্টিমেয় মনীষীর

পরীক্ষাগার হইতে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিজ্ঞান-সচেতন ("science-conscious") হওয়ায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বাড়িতে থাকে। রাজগণ ও শাসকগণ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকগণের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। পাণ্ডিত্যাভিলাষী বহু ব্যক্তি ধর্মতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্যের (classics) পরিবর্তে বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করিলেন। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সমিতি (Scientific Academies) স্থাপিত হইল। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের 'রাজকীয় সমিতি' (Royal Society) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্ল্‌সের সনদ (Charter) অনুসারে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের বিজ্ঞান সমিতি (Academy of Sciences) ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাময়িক পত্র (journals) প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানচর্চার সুবিধার জন্য নানাস্থানে মিউজিয়ম ও অব্‌জারভেটারী প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞানের প্রসার

সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দেকার্তে (Descartes) গণিত, দর্শন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করেন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক আইজাক নিউটন (Isaac Newton) বিজ্ঞানের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কারক। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হ্যালী (Halley) এবং হার্সেল (Herschel) জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন। রসায়নের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ল্যাভয়সিয়ের (Lavoisier)। তিনি জাতিতে ফরাসী ছিলেন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বয়েল (Boyle) এবং ক্যাভেণ্ডিসের (Cavendish) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভূতত্ত্ব ও ধাতুবিদ্যা (Geology and Mineralogy), প্রাণীবিদ্যা (Zoology), উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), চিকিৎসা বিদ্যা (Medicine) প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু বৈজ্ঞানিক উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। এই গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মানুষের নূতন ধারণা জন্মে এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের বহুমুখী উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতি

সমাজ বিজ্ঞানের উন্নতি: সমাজে মানুষের স্থান, কর্তব্য ও অধিকার

নির্ণয় সমাজ বিজ্ঞানের (Social Science) বিষয়বস্তু। জ্ঞানদীপ্তির যুগে অনুসন্ধিৎসু মানুষ ধর্মতত্ত্বের পরিবর্তে সমাজ বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের উন্নতি আরম্ভ হয়। সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে।

ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা। বিশ্বাসযোগ্য দলিলপত্র ইতিহাসের প্রধান ভিত্তি এবং নিরপেক্ষভাবে সত্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা ইতিহাসের উদ্দেশ্য—এই দুইটি নীতি জ্ঞানদীপ্তির যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইটালীয় পণ্ডিত ভিকো (Vico), জার্মান পণ্ডিত হার্ডার (Herder), ফরাসী পণ্ডিত মণ্টেস্কু (Montesquieu) প্রভৃতি ইতিহাস চর্চার নূতন পথ প্রদর্শন করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে গিবন (Gibbon) এবং হিউম (Hume) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিবনের রচিত রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস (*Decline and Fall of the Roman Empire*) পৃথিবীর ঐতিহাসিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক ভল্‌তেয়ার (Voltaire) কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইতিহাস

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (Political Science) আলোচনা ইতিহাস ও দর্শন চর্চার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কোন্ শাসন-পদ্ধতি সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে ব্যক্তির সুখ ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে দুইটি বিপ্লব (Puritan Revolution এবং Glorious Revolution) সংঘটিত হয়। দুইজন ইংরেজ দার্শনিক—হব্‌স্ (Hobbes) এবং লক্ (Locke)—স্ব স্ব গ্রন্থে এই প্রশ্নের আলোচনা করেন। হল্যাণ্ডের পণ্ডিত স্পিনোজা (Spinoza) এবং জার্মান পণ্ডিত কাণ্ট (Kant) ও ফিকটে (Fichte) প্রধানতঃ দার্শনিক হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহাদের মূল্যবান অবদান আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন দুইজন ফরাসী পণ্ডিত—মণ্টেস্কু এবং রুসো (Rousseau)। ইংরেজ পণ্ডিত বেন্থাম (Bentham) সমাজের মঙ্গলকর আইন প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন। আধুনিক যুগে ব্যবহার শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক আলোচনার তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

জ্ঞানদীপ্তির যুগেই অর্থনীতির (Economics) বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। ফরাসী চিকিৎসক কুয়েস্‌নে (Quesnay) এবং তাঁহার সহযোগী ফরাসী অর্থনীতিজ্ঞগণ Physiocrats নামে পরিচিত। ইংরেজ পণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে *The Wealth of Nations* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

অর্থনীতি

দর্শনের উন্নতি ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিকগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—হব্‌স্‌, লক্‌, স্পিনোজা, দেকার্তে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দর্শনের ক্ষেত্রে চিন্তানায়ক ছিলেন ইংরেজ পণ্ডিত বার্কলে (Berkeley) এবং হিউম (Hume) এবং জার্মান পণ্ডিত কাণ্ট ও ফিক্‌টে। ইঁহাদের চিন্তাধারায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রভাব ছিল। দর্শন চর্চায় তাঁহারা মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হন নাই।

ধর্ম ঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং দর্শনের প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার উদ্ভব হয়। ইহার ভিত্তি যুক্তিবাদ। যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রোটেস্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতবাদের উৎপত্তি হয়। খ্রীষ্টধর্মের অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) দিক সম্বন্ধে সন্দেহের (scepticism) উদয় হয়। বাইবেলের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে সমালোচনা (Biblical criticism) আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ-বাদের প্রধান প্রচারক ছিলেন ফরাসী পণ্ডিত ভল্‌তেয়ার। Encyclopædists নামে পরিচিত হলবাক (Holbach) প্রভৃতি ফরাসী পণ্ডিতেরা ভল্‌তেয়ারের সন্দেহবাদ অতিক্রম করিয়া নিরীশ্বরবাদের (Atheism) সমর্থন করিতেন।

ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার ফলে পরমতসহিষ্ণুতা (religious toleration) আসে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মের নামে যে নির্যাতন চলিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার অবসান ঘটে। জেস্যুইট (Jesuits) নামে পরিচিত গোঁড়া ক্যাথলিক সমিতির প্রভাব খর্ব হয়। ইহুদীদিগের উপর বহু শতাব্দী হইতে যে অবিচার ও অত্যাচার চলিতেছিল তাহার আংশিক অবসান ঘটে।

স্বাধীন চিন্তার ফল

সাহিত্য ঃ জ্ঞানদীপ্তির যুগে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের (classics) মর্যাদা ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থ রচনার

পুরাতন রীতি পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের জাতীয় ভাষায় (vernacular) রচিত গ্রন্থাদিতে ল্যাটিন শব্দ ও রচনাশৈলী ব্যবহৃত হইত।

ফরাসী সাহিত্য

সপ্তদশ শতাব্দীকে ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ আখ্যা দেওয়া যায়। কর্নেল (Corneille), মলিয়ের (Moliere), রেসিন (Racine), লা ফন্‌তেন্‌ (La Fontaine) প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনা ফরাসী ভাষাকে নূতন মর্যাদায় ভূষিত করে। এই যুগেই ফরাসী ভাষা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত মানুষের পক্ষে আন্তর্জাতিক ভাষায় (lingua franca) পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ফরাসী সাহিত্যের অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন ভল্‌তেয়ার এবং রুসো।

ইংরেজী সাহিত্য

ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন মহাকবি মিল্টন (Milton)। তাঁহার রচিত *Paradise Lost* নামক মহাকাব্য বিশ্ব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাঁহার পরবর্তী যুগে কাব্যসাহিত্যে ড্রাইডেন (Dryden) ও পোপের (Pope) নাম উল্লেখযোগ্য। গদ্য সাহিত্যে দার্শনিক লক, ঐতিহাসিক গিবন ও হিউম, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যামুয়েল জনসন (Samuel Johnson), অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতির রচনায় নূতন যুগের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষায় উপন্যাস রচনা আরম্ভ হয়। সাহিত্যের এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson), ফীল্‌ডিং (Fielding), স্মোলেট (Smollett), স্টার্ন (Sterne) প্রভৃতি লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। রবার্ট বার্নস্‌ (Robert Burns), কুপার (Cowper) প্রভৃতি কবির রচনায় রোমান্টিক ভাবের (romanticism) উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। পোপ প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী (classical) কবির সহিত তাঁহাদের মৌলিক পার্থক্য আছে।

জার্মান সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবের প্রাবল্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন (classical) রীতির পরিবর্তে রোমান্টিক রীতির প্রবর্তন করেন লেসিং (Lessing) ও হার্ডার। ইহাকে পরিণতি প্রদান করেন গেটে (Goethe) এবং শিলার (Schiller)।

শিল্পঃ জ্ঞানদীপ্তির যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প বিশেষ উন্নতি

লাভ করিয়াছিল। চিত্রশিল্পে হল্যাণ্ড এবং স্পেনের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। বেলজিয়াম নিবাসী রুবেন্‌স্ (Rubens), হল্যাণ্ড নিবাসী ভ্যান্ ডিক (Van Dyck) ও রেম্‌ব্রাণ্ড (Rembrandt) এবং স্পেনবাসী গোয়া (Goya) কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রগুলি পৃথিবীর শিল্পভাণ্ডারে অমূল্য রত্নস্বরূপ। ইংরেজ চিত্রশিল্পী জস্থুয়া রেনল্ড্‌সের (Joshua Reynolds) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞানদীপ্তির ফলঃ জ্ঞানদীপ্তির ফল আলোচনা প্রসঙ্গে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) জ্ঞানদীপ্তির যুগে মানুষ অতিপ্রাকৃতে (supernatural) বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃতের (natural) অনুগামী হয়, ধর্মতত্ত্বের পরিবর্তে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে। মানুষের মনে এই ধারণা জন্মে যে সমগ্র পৃথিবী ও মানব সমাজ এক প্রাকৃত বিধি (Natural Law) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। (২) এই যুগে মানুষ যুক্তিবাদকে সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করে। যুক্তি দ্বারা প্রাকৃত বিধির রহস্য ভেদ করা যায় এবং সেই বিধি অনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করা যায়, এই ধারণা প্রবল হইয়া উঠে। (৩) যুক্তিবাদের অনুসরণ করিলে সভ্যতার ক্রমোন্নতি (progress) হইবে এবং মানুষ পরিপূর্ণতার (perfectibility) স্তরে পৌঁছিবে, এই ধারণার উৎপত্তি হয়। (৪) মানুষের স্বাভাবিক অধিকার (natural rights) স্বীকৃত হয় এবং সমাজ-ব্যবস্থায় মানবিকতাবোধ (humanism) পরিস্ফুট হইতে থাকে।

জ্ঞানদীপ্তির যুগে স্বৈরাচারী রাজগণঃ জ্ঞানদীপ্তির যুগে ইউরোপের কোন দেশেই গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল না। একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত সকল দেশেই স্বৈরাচারী রাজগণের শাসন (autocratic Monarchy) সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইলেও অভিজাতগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রবল ছিল।

কিন্তু ইউরোপের স্বৈরাচারী রাজগণ জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা জনসাধারণকে শাসন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার দানের কথা চিন্তা করিতেও পারেন নাই, কারণ ইউরোপের রাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসনের ঐতিহ্য বদ্ধমূল জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার
ছিল। কিন্তু প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্য নিজেদের দায়িত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতেন। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা শাসন-ব্যবস্থায় বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা

বিস্তার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ধর্মসম্বন্ধে সহিষ্ণুতা প্রভৃতি তাঁহাদের কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল। এইজন্য তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতিকে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার (Benevolent Despotism) অথবা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার (Enlightened Despotism) বলা হয়। অস্ট্রিয়াধিপতি সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ বলিয়াছিলেন, "আমি দর্শনকে আমার রাজ্যের ব্যবস্থাপক করিয়াছি।" স্বৈরাচারী রাজগণের প্রজাহিতৈষণার মূলে ছিল যুক্তিবাদী দর্শন। পূর্বে রাজতন্ত্র এই দর্শনের অনুসরণ করে নাই, এজন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজগণ অনুতপ্ত ছিলেন। তাই এই যুগের রাজতন্ত্রকে অনুতপ্ত রাজতন্ত্র (Repentant Monarchy) বলা হয়।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজগণের মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেন প্রাশিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (Frederick II বা Frederick the Great)। যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতি আনুগত্য তাঁহার বাস্তববোধ আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তাঁহার সামরিক প্রতিভা, কূটনীতি কৌশল এবং সুশাসন প্রাশিয়াকে একটি শক্তিশালী ও উন্নতিশীল রাজ্যে পরিণত করে। যুক্তিবাদী দর্শনে দৃঢ়বিশ্বাসী অস্ট্রিয়াধিপতি সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ আদর্শবাদী হইলেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সংস্কার-প্রচেষ্টা তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যে স্থায়ী পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনকে (Catherine II) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ইউরোপের ছোট ছোট কয়েকটি দেশের (যেমন, স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন) রাজগণও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টা করেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ

স্বৈরাচারী রাজগণের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন সাময়িকভাবে প্রজাদের পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও ইহা শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক রূপ বদলাইতে পারে নাই। জনসাধারণকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের অধিকার না দেওয়ায় রাজতন্ত্রের উপর তাহাদের অবিশ্বাস দূর হয় নাই। জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবে এবং অভিজাতশ্রেণী ও সরকারী কর্মচারিগণের বিরোধিতায় রাজগণের সদিচ্ছা সকল সময় কার্যে পরিণত হয় নাই। সংস্কার প্রচেষ্টা কোন কোন ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ছিল না। সমসাময়িক ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া উপর হইতে জনসাধারণের

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের ব্যর্থতা

উপর সংস্কার চাপাইয়া দিলে তাহা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। এই সকল কারণে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার ইউরোপে স্থায়ী পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। পরে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিপ্লবের যুগ

১। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

(American War of Independence)

আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ ঃ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের (colonial empire) অধীশ্বরী হইয়াছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার বাণিজ্যের দিক হইতে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল, কিন্তু এই দুইটি অঞ্চল শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে উপযোগী ছিল না। কেবলমাত্র নববিজিত ক্যানাডা প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং পরিবেশের দিক হইতে মাতৃভূমিত্যাগী ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র ছিল।

উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য

এতদ্ব্যতীত উত্তর আমেরিকায় আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে ইংরেজদের তেরটি পুরাতন উপনিবেশ ছিল। এই উপনিবেশগুলির জনসংখ্যা ছিল প্রায় তের লক্ষ। তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে ইংলণ্ডের ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। আইনতঃ সর্ববিষয়ে ইংলণ্ডরাজের কর্তৃত্বাধীন হইলেও কার্যতঃ তাহারা স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য (local autonomy) ভোগ করিত। প্রত্যেকটি উপনিবেশে একটি প্রতিনিধি-সভা ছিল। এই প্রতিনিধি-সভার সহযোগিতায় ইংলণ্ডরাজের প্রতিভূ গভর্নর উপনিবেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ইংলণ্ড হইতে ভৌগোলিক দূরত্ব বশতঃ উপনিবেশ-গুলির স্বাতন্ত্র্য ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল, কারণ সুদূর লণ্ডন হইতে রাজা ও

মন্ত্রীদের পক্ষে উপনিবেশগুলির দৈনন্দিন শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে পার্লামেণ্টের সহিত সংগ্রামে বিব্রত থাকায় রাজগণ সুদূর আমেরিকায় শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হুইগ (Whig) দলভুক্ত মন্ত্রীরা উপনিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। ইহা ছাড়া উপনিবেশগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কম থাকায় গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি প্রবল ছিল। ইংলণ্ডের ন্যায় আমেরিকায় ধনী অভিজাত শ্রেণী ছিল না, মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে উপনিবেশগুলিতে উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বসবাস ছিল।

রাজনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য ছিল না; মাতৃভূমির কর্তৃত্ব নানাভাবে তাহাদের স্বার্থহানি ঘটাইত। তখন অর্থনীতিক্ষেত্রে 'মার্কেণ্টাইল' নীতি (Mercantilism) প্রচলিত ছিল। এই নীতির মর্ম এই যে রাষ্ট্র নিজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য প্রজাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নহে, ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করা হইত।

উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক অসুবিধা

ফলে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যই উপনিবেশগুলি স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এমনভাবে উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করাই ইংরেজ সরকারের লক্ষ্য ছিল। ঔপনিবেশিকগণ এমন কোন শিল্পে বা বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিত না যাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে। উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিতে পারিত যাহা ইংলণ্ডে উৎপন্ন হইত না; আবার উপনিবেশগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্য কেবলমাত্র ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যাইত, সরাসরিভাবে অন্য দেশে বিক্রয় করা যাইত না। এইরূপ বাধানিষেধের ফলে উপনিবেশগুলির আর্থিক অবস্থা যথাযথভাবে উন্নত হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়া মাতৃভূমির সামরিক শক্তি রক্ষার জন্য উপনিবেশগুলিকে কর দিতে হইত, নিজেদের শাসন সংক্রান্ত সমুদয় ব্যয়ও তাহাদিগকেই বহন করিতে হইত।

ইংলণ্ডের সহিত উপনিবেশগুলির বিরোধঃ ঔপনিবেশিকগণ নানাকারণে দীর্ঘকাল ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কর প্রদান সম্বন্ধে এই সকল অসুবিধা সহ্য করিয়াছিল। ত্রয়োদশটি উপনিবেশের মধ্যে নানাবিষয়ে অনৈক্য ও পার্থক্য

ছিল, তাহারা সম্মিলিতভাবে মাতৃভূমির অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে পারিত না। যতদিন ক্যানাডা ফ্রান্সের অধীন ছিল ততদিন ইংলণ্ডের সামরিক সাহায্য ব্যতীত উপনিবেশগুলির পক্ষে স্ব স্ব নিরাপত্তা রক্ষা সম্ভব ছিল না, উত্তর দিক হইতে ফরাসী আক্রমণের ভয়ে তাহারা সন্ত্রস্ত এবং মাতৃভূমির উপর নির্ভরশীল থাকিত। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংলণ্ড কর্তৃক ক্যানাডা বিজয়ের পর এই ভয় দূর হইল। অন্যান্য দিকেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছিল। জনসংখ্যায় ও সম্পদে উপনিবেশগুলির শক্তিবৃদ্ধি হইতেছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং কর স্থাপন পদ্ধতি তাহারা আর বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতে চাহিল না।

ক্যানাডা জয়ের ফল

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল। এই ব্যয়ের কিয়দংশ ফরাসী আক্রমণ হইতে আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী জর্জ গ্রেন্‌ভিল (George Grenville) স্থির করিলেন যে আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর নূতন কর স্থাপন করিয়া মাতৃভূমির ঋণভার লাঘব করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চিনির উপর কর স্থাপিত হইল এবং পর বৎসর (১৭৬৫) স্ট্যাম্প আইন (Stamp Act) দ্বারা সরকারী দলিলপত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতির উপর বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারী স্ট্যাম্প লাগাইবার ব্যবস্থা হইল। উপনিবেশগুলি এই প্রকার কর স্থাপনের প্রতিবাদে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল। পূর্বে তাহারা স্ব স্ব প্রতিনিধি-সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত কর দিত, পার্লামেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে কর চাপাইয়া দিত না। ঔপনিবেশিকগণের মতামত না লইয়া তাহাদের উপর কর স্থাপনের আইন-সঙ্গত অধিকার ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নাই (No taxation without representation)—ইহাই হইল প্রতিবাদকারীদের প্রধান বক্তব্য। ইংলণ্ড-বাসিগণ দীর্ঘকাল রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে তাহাদের প্রতিনিধি-সভার (অর্থাৎ পার্লামেণ্টের) সম্মতি না লইয়া রাজা কর স্থাপন করিতে পারিবেন না। এই নীতি দ্বারা জনগণের যে মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহা কি কেবল মাতৃভূমিতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, উপনিবেশগুলিতে প্রসারিত হইবে না? ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে

গ্রেনভিলের নীতি

কর স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

উপনিবেশগুলির কোন প্রতিনিধি না থাকায় এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইল।

এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় বিপ্লবের সূচনা হইল, কিন্তু ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহৃত হইল, কিন্তু আর একটি আইন (Declaratory Act) দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে ঔপনিবেশিকগণের মতামত না লইয়া তাহাদের উপর কর স্থাপনের অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আছে। এই নীতি অনুযায়ী পর বৎসর (১৭৬৭) মন্ত্রী টাউনশেণ্ড (Townshend) আমেরিকায় আমদানি চা, কাগজ, কাচ প্রভৃতি কয়েকটি জিনিসের উপর নূতন কর স্থাপন করিলেন। ফলে আমেরিকার বণিকেরা এই সকল জিনিসের আমদানি কমাইয়া দিল এবং সরকারী কর্মচারিগণ শুল্ক আদায় করিবার সময় নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য বোস্টন শহরে সৈন্য মোতায়েন করিতে হইল। সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে বহুসংখ্যক বোস্টনবাসী নিহত হইল। ইহা বোস্টন হত্যাকাণ্ড (Boston Massacre) নামে পরিচিত।

নূতন কর স্থাপন

এই দুর্ঘটনার পর প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ (North) কাগজ প্রভৃতি জিনিসের উপর শুল্ক রহিত করিলেন, কেবলমাত্র চা-এর উপর নামমাত্র কর রাখা হইল যেন পার্লামেণ্ট কর্তৃক কর স্থাপনের অধিকার নীতিগত ভাবে স্বীকৃত থাকে (১৭৭০)। কিন্তু ঔপনিবেশিকগণ বাণিজ্যক্ষেত্রে এইরূপ সুবিধা পাইয়াও তাহাদের বিনা সম্মতিতে পার্লামেণ্ট কর্তৃক কর স্থাপনের নীতি মানিয়া লইল না। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একখানি চা-বোঝাই জাহাজ বোস্টন বন্দরে পৌঁছিলে কয়েকজন ঔপনিবেশিক ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়া চা-এর বাক্সগুলি জলে ফেলিয়া দিল। ইহা Boston Tea Party নামে পরিচিত। শাস্তিস্বরূপ ইংরেজ সরকার বোস্টন বন্দরে বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিল এবং কার্যতঃ ম্যাশাচুসেট্‌স্ (Massachusetts) প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কাড়িয়া লইল (১৭৭৪)।

লর্ড নর্থের নীতি

ঐ বৎসরই আমেরিকার দ্বাদশটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেল-ফিয়া শহরে এক কংগ্রেসে (Continental Congress) সমবেত হন। কিভাবে উপনিবেশগুলির ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায় এবং

ইংলণ্ডের সহিত ঐক্য রক্ষা হইতে পারে তাহাই এই কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় ছিল। আলোচনার পর ইংলণ্ডরাজের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা (বড়) উইলিয়ম পিট বা লর্ড চ্যাথাম (Pitt the Elder, Earl of Chatham) এবং বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বার্ক (Edmund Burke) উপনিবেশগুলির সহিত আপোষ-মীমাংসার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু রাজা ও মন্ত্রিগণ তাঁহাদের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাজা ও মন্ত্রিগণের অদূরদর্শী নীতি সমর্থন করিল।

ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেস

ওদিকে আমেরিকাতেও আপোষবিরোধী মনোভাব প্রবল হইতেছিল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেক্সিংটন (Lexington) নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদল এবং ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে সংঘর্ষ হইল। অতঃপর ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল; ইহাতে ত্রয়োদশটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণই উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ডরাজের নিকট উপনিবেশগুলির অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি করিয়া আবার আবেদনপত্র প্রেরিত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন চলিল। ঔপনিবেশিক সৈন্যগণের পরিচালনার ভার জর্জ ওয়াশিংটনের (George Washington) উপর দেওয়া হইল। ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে অনেকে মাতৃভূমির সহিত বিরোধের বিপক্ষে ছিল, কিন্তু ইংলণ্ডরাজ যখন সামরিক বলের সাহায্যে উপনিবেশগুলিকে করপ্রদানে বাধ্য করিবার আয়োজন করিলেন তখন আমেরিকায় ইংলণ্ডবিরোধী দলই প্রবল হইয়া উঠিল। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল।

যুদ্ধের সূত্রপাত

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই কংগ্রেস ত্রয়োদশটি উপনিবেশের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই ঘোষণাপত্রে (Declaration of Independence) বলা হইল: (১) প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিকর্তার নিকট হইতে কতকগুলি মৌলিক অধিকার লাভ করে—যেমন, জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা ও সুখান্বেষণ। (২) শাসিত প্রজাদের সম্মতির ভিত্তিতে শাসক শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। (৩) অত্যাচারী শাসককে বিপ্লবের দ্বারা বিতাড়িত করিবার অধিকার প্রজাদের আছে। আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির মূল কথাগুলি এই ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে। স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার অধিকার

স্বাধীনতা ঘোষণা

ইতিপূর্বে ইউরোপে বা আমেরিকায় এত সুস্পষ্টভাবে কখনও প্রচারিত হয় নাই। ইহাই এই ঘোষণাপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

স্বাধীনতা সংগ্রাম: উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে আপোষের আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। রাজা তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার মন্ত্রিগণ সামরিক বলের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ফলে প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকায় যুদ্ধ (American War of Independence) চলিয়াছিল।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্কার হিলের (Bunker Hill) যুদ্ধে ঔপনিবেশিকগণ পরাজিত হইল। পর বৎসর ইংরেজ সেনাপতি স্যার উইলিয়ম হো (Sir William Howe) নিউ ইয়র্ক অধিকার করিলেন। কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি বার্গোয়েন (Burgoyne) স্যারাটোগা (Saratoga) নামক স্থানে প্রায় ছয় হাজার সৈন্য সহ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। পরবর্তী তিন বৎসরে যথাক্রমে ফ্রান্স, স্পেন এবং হল্যাণ্ড ইংলণ্ডকে দুর্বল করিবার জন্য ঔপনিবেশিকগণের পক্ষে যোগদান করিল। এইরূপে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ইউরোপ হইতে নূতন মহাদেশে সংক্রামিত হইল। আমেরিকার সহিত ইউরোপের নিরপেক্ষ জাতিগুলির বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড নৌবলের সাহায্য লইল। তখন রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি কয়েকটি দেশ বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। এই সঙ্ঘ Armed Neutrality of the North নামে পরিচিত।

ইউরোপীয় শক্তিবর্গের যুদ্ধে যোগদান

প্রায় সমগ্র ইউরোপের শত্রুতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্নওয়ালিস (Cornwallis—যিনি পরে ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়াছিলেন) পরাজিত হইয়া ইয়র্কটাউনে (Yorktown) আত্মসমর্পণ করিলেন। এই সময়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজরা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় আমেরিকায় জয়লাভের জন্য তেমন চেষ্টা করিতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের পরাজয়

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ত্রয়োদশটি উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। পরে ভার্সাইর (Versailles) সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স

ও স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের শান্তি স্থাপিত হইল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত ত্রয়োদশটি উপনিবেশ নূতন সংবিধান (Constitution) প্রস্তুত করিল। এই সংবিধান অনুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (United States of America) সংগঠিত হইল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটন প্রথম রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হইলেন।

সন্ধি

যুক্তরাষ্ট্র গঠন

উপনিবেশগুলির জয়লাভের কারণঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঔপনিবেশিকগণের জয়লাভের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যায়। যুদ্ধ পরিচালনায় ইংরেজ সরকার ও সেনাপতিগন সর্বক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই; তাঁহাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং অবিবেচনা পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিকদের সহায়ক হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ঔপনিবেশিকগণের সামরিক দক্ষতা ও যুদ্ধোপকরণের অভাব থাকিলেও স্বাধীনতা লাভের উৎসাহ ছিল। ওয়াশিংটনের চরিত্রবল, কর্মক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি তাহাদের অনেক অভাব পূরণ করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি শক্তি নানাভাবে ইংলণ্ডের বিপক্ষতাচরণ না করিলে ঔপনিবেশিকগণের জয়লাভের সম্ভাবনা থাকিত কিনা সন্দেহ। ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত মিনর্কা দ্বীপ (Minorca) হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে ফরাসীদের ষড়যন্ত্র ও হায়দর আলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংরেজদিগকে দুর্বল করিয়াছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ অধিকার বিপন্ন হইয়াছিল। এই সকল কারণে আমেরিকায় বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আমেরিকার স্বাধীনতালাভের ঐতিহাসিক গুরুত্বঃ আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অসামান্য ইঙ্গিতপূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা। নবগঠিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে ধীরভাবে অগ্রসর হইয়া বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। যে মাতৃভূমি ইংলণ্ডের সহিত সংগ্রামের ফলে এই নূতন রাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছিল তাহা আজ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আভ্যন্তরীণ গঠনকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্র

নব রাষ্ট্রের উৎপত্তি

নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। উপনিবেশগুলি পরাজিত হইলে তাহাদের এই ঐতিহাসিক পরিণতি সম্ভব হইত না।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম রাজার বিরুদ্ধে প্রজার সাধারণ বিদ্রোহ মাত্র নহে। এই বিদ্রোহের পশ্চাতে একটি নূতন রাজনৈতিক আদর্শ ছিল। জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব (sovereignty of the people) রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি হইবে, এই বৈপ্লবিক নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ঔপনিবেশিকগণ অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে সাফল্য লাভের পর তাহারা জনগণ কর্তৃক শাসিত সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিল, ইউরোপের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র অথবা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টীয় রাজতন্ত্র সেখানে স্থান পাইল না। রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে একটি নূতন দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইতেছে।

রাষ্ট্র গঠনের নূতন ভিত্তি

এই দুইটি আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদূরপ্রসারী ফল। সমসাময়িক ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এই সংগ্রামের ফল প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে কার্যকর হইয়াছিল। ইংলণ্ডের পরাজয় রাজা তৃতীয় জর্জের নীতির ব্যর্থতা প্রমাণ করিল, তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগে রাজ্য-শাসনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ঔপনিবেশিক নীতির কিছু পরিবর্তন ঘটিল, ক্যানাডায় আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইল।

ইংলণ্ড

ফ্রান্স আমেরিকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড কর্তৃক ক্যানাডা জয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল, কিন্তু যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য ফরাসী সরকার ঋণগ্রস্ত হইল। এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতিনিধি-সভা (States-General) আহ্বান করা হইল। প্রতিনিধি-সভার কার্যাবলী ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করিল। ফরাসী সৈন্যেরা আমেরিকা হইতে যে বৈপ্লবিক আদর্শ আনিয়াছিল তাহা ফরাসী বিপ্লবের ইন্ধন জোগাইল।

ফ্রান্স

২। ফরাসী বিপ্লব (French Revolution)

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রস্তুত হয়। ঠিক ঐ বৎসরেই ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ফরাসী

বিপ্লবের অসামান্য গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহার ফলে যে কেবলমাত্র ফ্রান্সে শাসক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা নহে; সমগ্র ইউরোপের মানচিত্র বদলাইয়া গিয়াছিল এবং বিপ্লবের আদর্শ বহু জাতিকে আলোড়িত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা—উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের মূলসূত্র।

ফরাসী দার্শনিকগণ: জ্ঞানদীপ্তির ফলে ইউরোপে যে মানসিক বিপ্লব ঘটে তাহাতে ফ্রান্স একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য জগতের মধ্যমণি ছিলেন ভল্‌তেয়ার (Voltaire) (১৬৯৪-১৭৭৮)। তিনি কাব্য, নাটক, ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার রচনায় অসামান্য পারদর্শিতা দেখাইয়া সমগ্র ইউরোপব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ফরাসী জাতীয় হইয়াও প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এবং রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতায় ক্যাথারিনের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁহার রচনাবলী কেবলমাত্র সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। তিনি খ্রীষ্টধর্ম ও পাদ্রী সম্প্রদায়ের কঠোর সমালোচনা করিয়া জনসাধারণের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসে প্রবল আঘাত করেন। তৎকালপ্রচলিত বহু ধারণা ও প্রতিষ্ঠান তাঁহার যুক্তিমূলক আক্রমণে লোকচক্ষে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

ভল্‌তেয়ার

ডিডেরো (Diderot) এবং এলেম্‌বার্ট (d' Alembert) নামক দুইজন ফরাসী পণ্ডিত ১৭ খণ্ডে বিভক্ত একটি বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থে বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের রচনা সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সকল রচনার মূলে ছিল যুক্তিবাদ। কোন কোন লেখক ধর্মসম্বন্ধে ভল্‌তেয়ার অপেক্ষা উগ্র মতাবলম্বী ছিলেন; তাঁহারা ধর্মকে অস্বীকার করিয়া নিরীশ্বরবাদ (atheism) প্রচার করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। বিশ্বকোষ প্রচারের ফলে ফ্রান্সে ভল্‌তেয়ার কর্তৃক প্রবর্তিত সমালোচনার ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছিল।

বিশ্বকোষ

দর্শনের সহিত রাষ্ট্রনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দর্শন ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা চিন্তাশীল লেখক ছিলেন জন লক (John Locke)। তিনি স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার দাবি প্রচার করেন। তাঁহার মতবাদ ফ্রান্সে আগ্রহের সহিত

আলোচিত হইত। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র রাজার ক্ষমতা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল, ইহাও ফরাসী দার্শনিকগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক মণ্টেস্ক্যুর (Montesquieu, ১৬৮৯-১৭৫৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত *The Spirit of the Laws* নামক গ্রন্থ রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। তিনি ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং ফ্রান্সে উহার অনুকরণ অনুমোদন করেন। তাঁহার মতবাদ অনেকাংশে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তিনি ফরাসী জাতির সম্মুখে একটি নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, প্রজার কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। মণ্টেস্ক্যু এই অসঙ্গত ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া প্রজার অধিকার স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

মণ্টেস্ক্যু

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ফরাসী ভাষার লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন রুসো (Jean Jacques Rousseau, ১৭১২-১৭৭৮)। তিনি জীবনে কোন কার্যে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার চরিত্র নানা দোষে কলুষিত ছিল। তথাপি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রধান গ্রন্থের নাম *Contract Sociale* (সামাজিক চুক্তি)। শাসকের অধিকার শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাই রুসোর মূল বক্তব্য। যে যুগে ইউরোপের রাজগণ ঈশ্বরানুগ্রহে (Divine Right) রাজ্যশাসন করিতেছেন বলিয়া দাবি করিতেন সেই যুগে রুসোর এই বক্তব্য স্বভাবতঃই বিপ্লবের সূচনা করিল।

রুসো

'ফিজিওক্র্যাট' (Physiocrats) নামে পরিচিত লেখকগণ অর্থনীতির যুক্তিবাদমূলক ব্যাখ্যা প্রচার করেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কুয়েস্‌নে (Quesnay)। কৃষিকার্যই ঐশ্বর্যের মূল উৎস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয় নয়—ইহাই নূতন ফরাসী অর্থনীতির মূল কথা।

অর্থনীতি

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিপ্লব আরম্ভ হয় তাহার কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকের মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত

হইতে হইবে। ইহাদের রচনাবলী ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্মুখে এক নূতন জগতের চিত্র উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাদের মনে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা জোগাইয়াছিল। প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা, সমাজের গঠন ও অর্থনীতি অন্যায় এবং অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মানুষ চেষ্টা করিলে এগুলি সংশোধন করিতে পারে—এই ধারণা দার্শনিকগণের শিক্ষার প্রভাবে ফ্রান্সে অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং দার্শনিকগণকে বিপ্লবের অগ্রদূত বা পথপ্রস্তুতকারক রূপে গণ্য করা যায়। তাঁহারা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রস্তুতি তাঁহাদের মতবাদ প্রচারের ফল। কিন্তু তাঁহারা প্রচলিত অর্থে বিপ্লবী ছিলেন না; চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিলেও তাঁহারা হাতে-কলমে বিপ্লব করেন নাই। মণ্টেস্কু, ভল্‌তেয়ার এবং রুসো বিপ্লবের পূর্বে পরলোকগমন করেন।

ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকগণের প্রভাব

ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাতঃ রাজা ষোড়শ লুইর (Louis XVI) রাজত্বকালে (১৭৭৪-১৭৯৩) ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল এবং বিপ্লবের ফলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। তিনি নিজে যে অত্যাচারী বা প্রজাবিরোধী ছিলেন তাহা নহে, বরং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উদারচেতা এবং কোমলহৃদয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে রাজোচিত দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বিশেষ অভাব ছিল, সঙ্কটকালে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্রান্সের সঙ্কটকালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের শক্তি ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সেই শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আশায় আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়া ফ্রান্স প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজেকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিবিধান করিবার শক্তি ষোড়শ লুইর ছিল না। নিরুপায় হইয়া তিনি জাতীয় প্রতিনিধি-সভা (States-General) আহ্বান করিলেন। বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

ষোড়শ লুইর দুর্বলতা

ব্যর্থ পররাষ্ট্রনীতির কুফল

ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণঃ যে অর্থনৈতিক সঙ্কট ফ্রান্সে বিপ্লব ডাকিয়া আনিল তাহার প্রধান কারণ দুইটি—ব্যয়বাহুল্য এবং কর সংগ্রহ

পদ্ধতির ত্রুটি। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালেই (১৬৪৩-১৭১৫) ব্যয়বাহুল্য প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপনের আশায় তিনি বার বার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ফ্রান্সের অর্থনৈতিক শক্তি প্রায় নিঃশেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভায় বিলাসে এবং জাঁকজমকেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালেও (১৭১৫-১৭৭৪) যুদ্ধের ব্যয় এবং বিলাসের ব্যয় কমে নাই। ষোড়শ লুইও বিলাসের ব্যয় কমাইতে পারেন নাই। ফরাসী রাজগণের অমিতব্যয়িতা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। আমেরিকায় যুদ্ধেও তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

ব্যয়বাহুল্য

এক শতাব্দীর অধিককাল এই গুরু ব্যয়ভার বহন করা কোন দেশের পক্ষেই সহজ হইত না। ফ্রান্সে আবার বৈষম্যমূলক করসংগ্রহ পদ্ধতি এই গুরুভার ধনীদের বাদ দিয়া কেবলমাত্র জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দিয়াছিল। যাজক শ্রেণী এবং অভিজাত শ্রেণী সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইলেও করপ্রদানের দায়িত্ব হইতে মুক্ত ছিল; এই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিম্নস্তরের প্রজাদের—বিশেষতঃ কৃষকদের—উপর ন্যস্ত ছিল। যাহারা ধনী তাহারা কর দেয় না, যাহারা দরিদ্র তাহারা যুদ্ধের ব্যয় এবং রাজপরিবারের বিলাসের ব্যয় বহন করে—এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা ফ্রান্সে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সের সমগ্র রাজস্বের শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ জনসাধারণকে (Third Estate) দিতে হইত, বাকী শতকরা ৪ ভাগ মাত্র ধনী যাজক ও অভিজাতগণের নিকট হইতে আদায় করা হইত। জনসাধারণ যে কেবল রাজাকে কর দিত তাহা নহে; যাজকদিগকে ধর্মকর (tithe) এবং অভিজাত শ্রেণীভুক্ত জমিদারদিগকে সামন্তপ্রথা সংক্রান্ত নানাবিধ কর (feudal dues) দেওয়া তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। ফলে ফ্রান্সের কৃষকগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের আয়ের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ তাহারা নিজেদের জীবনধারণের জন্য ব্যয় করিতে পারিত।

বৈষম্যমূলক কর প্রথা

দরিদ্র প্রজাদের নিকট হইতে নানাভাবে যে অর্থ আদায় করা হইত তাহা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের যথার্থ প্রয়োজন সাধনের জন্য ব্যয় করা হইত না। শাসনযন্ত্রে নানাবিধ অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। অসাধু রাজকর্মচারিগণের লোভে এবং শাসনব্যবস্থায় দক্ষতার অভাবে চুরি এবং অপব্যয় বেশ চলিত।

অসাধুতা ও অপব্যয়

রাজ্যে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনা আবশ্যক। ফরাসী শাসনযন্ত্রের এদিকে তেমন দৃষ্টি ছিল না। আভ্যন্তরীণ শুল্কপ্রথা দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মাল আমদানি-রপ্তানির অসুবিধা সৃষ্টি করিত। ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইত; দরিদ্র প্রজার কষ্ট হইত, রাজকোষে অর্থাগম কম হইত।

ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণঃ করভার জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকিলেও তাহাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না। আইনের দৃষ্টিতে রাজার ক্ষমতার কোন সীমা ছিল না, কার্যতঃ রাজার ইচ্ছাই ছিল দেশের আইন। রাজা মনে করিতেন যে তিনি ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে (Divine Right) রাজ্য শাসনের অধিকারী, প্রজাদের নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই,—তাঁহার সমগ্র দায়িত্ব ঈশ্বরের নিকট। সুতরাং প্রজাদের মতামতের সহিত এই ঈশ্বরাশ্রিত রাজতন্ত্রের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কর স্থাপন ও আইন প্রণয়নের জন্য রাজার নির্দেশই যথেষ্ট ছিল, প্রজাদের সম্মতির প্রশ্নই ছিল না। শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়ে রাজার নির্দেশই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। মন্ত্রিগণ রাজার হুকুমে কাজ করিতেন, নিজস্ব মতামত অনুসারে কাজ করিবার স্বাধীনতা তাঁহাদের ছিল না। পূর্বে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের ন্যায় ফ্রান্সেও একটি জাতীয় প্রতিনিধি-সভা (States General) ছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ইহার অধিবেশন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ফলে রাজার ইচ্ছার বিরোধিতা করিবার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষের বা প্রতিষ্ঠানের ছিল না। বিচার-ব্যবস্থায় নানাবিধ গলদ ছিল। বিনা বিচারে নিরপরাধ ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে আটক রাখা যাইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে প্রজাদের যে সকল রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

স্বৈরাচারী শাসন-পদ্ধতি

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রে শাসন-দক্ষতা নির্ভর করে প্রধানতঃ রাজার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকুশলতার উপরে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজগণের চরিত্র এবং কর্মকুশলতার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। পঞ্চদশ লুই বিলাসী এবং রাজকার্যে অমনোযোগী ছিলেন। ষোড়শ লুই ব্যক্তিগত জীবনে উদারচেতা এবং কোমলস্বভাব হইলেও রাজনৈতিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং দুর্বলচিত্ত ছিলেন। মন্ত্রী,

রাজগণের চরিত্রগত দুর্বলতা

রাজকর্মচারী এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে সংযত রাখিবার ক্ষমতা এই দুইজন রাজার ছিল না। নামে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও তাঁহারা কঠোরভাবে রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক কারণ : ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণী ছিল—বিশেষ অধিকার-ভোগী (privileged) এবং অধিকারবিহীন (non-privileged)। যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত সম্প্রদায় প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদিগকে যথাক্রমে First Estate ও Second Estate বলা হইত। আর Third Estate ছিল অধিকারবিহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকগণ। যাজকগণের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। ঊর্ধ্বতন যাজকগণ সর্ববিষয়ে বিশেষ অধিকারভোগী হইলেও অধস্তন যাজকগণ ছিলেন অধিকারবঞ্চিত।

সামাজিক বৈষম্য

ঊর্ধ্বতন যাজকগণ এবং অভিজাত জমিদারগণ কেবল যে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাহা নহে। তাঁহারা উচ্চ রাজপদ লাভের একচেটিয়া অধিকার এবং অন্যান্য নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করিতেন। তাঁহাদের প্রচুর আয় ছিল, অথচ তাঁহারা করভার হইতে মুক্ত ছিলেন। শ্রেণীবিশেষের দায়িত্ববর্জিত অধিকার স্বভাবতঃই অধিকার হইতে বঞ্চিত শ্রেণীগুলির হিংসা ও বিদ্বেষ আকর্ষণ করে। চরিত্র ও কর্মনীতির দিক হইতেও দুইটি উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের যথেষ্ট কারণ ছিল। যাজক ও জমিদারগণ ভোগ-বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ বিসর্জিত হইয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর উপর অযথা অত্যাচার করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। সমাজকে শোষণ করিয়া তাঁহারা ভোগের জীবন যাপন করিতেন, অথচ প্রতিদানে সমাজকে দিতেন অবজ্ঞা এবং অত্যাচার।

যাজক ও জমিদার

ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ শিক্ষায়, ভাবগৌরবে ও রাজনৈতিক সচেতনতায় শক্তিমান হইয়া উঠিতেছিল। অথচ রাজনীতি ও শাসনের ক্ষেত্রে তাহাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। রাজদরবারের সিংহদ্বার কেবলমাত্র যাজক ও জমিদারগণের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। স্বভাবতঃই এই দুইটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

সর্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়াও কৃষকগণ করভারে নিপীড়িত ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসনের গুরু ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হইত, যাজক ও জমিদার শ্রেণীর বিলাসের খরচও তাহারাই যোগাইত। প্রতিদানে তাহারা পাইত নির্মম অবহেলা ও অত্যাচার। রাজকর্মচারী, যাজক ও জমিদার সম্মিলিতভাবে অসহায় কৃষক শ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উৎপীড়ন চালাইত।

কৃষক

কিন্তু কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা ছিল না, সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব করিয়াছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব

ফরাসী বিপ্লবের অন্যান্য কারণ: জনসাধারণের দুঃখকষ্ট এবং অভাব-অভিযোগ যে ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছিল না এমন নহে, বরঞ্চ কোন কোন দেশে (যেমন—অস্ট্রিয়া, রাশিয়া) জনসাধারণের অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় ছিল। ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষায় উন্নত এবং মোটামুটি সচ্ছল অবস্থাপন্ন ছিল, কৃষকেরাও জার্মানীর ভূমিদাসগণের (serfs) অপেক্ষা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। তথাপি বিপ্লব ফ্রান্সেই আরম্ভ হইয়াছিল।

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা

ইহার প্রধান কারণ দার্শনিকগণের প্রভাব। তাঁহাদের শিক্ষায় ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে নূতন সাহস ও আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে এই সাহস ও আশা কৃষক-সমাজে খানিকটা সংক্রামিত হইয়াছিল।

দার্শনিকগণের প্রভাব

ইহা ছাড়া বিপ্লবের আর একটি উৎস ছিল। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত ফরাসী যোদ্ধারা রাজার বিরুদ্ধে প্রজার সার্থক বিদ্রোহের আদর্শ নূতন মহাদেশ হইতে ইউরোপে আমদানি করিল। ইহার ফলে ফ্রান্সের জনসাধারণ স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল।

আমেরিকার দৃষ্টান্ত

বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী (১৭৮৯-১৭৯২): ষোড়শ লুইর সিংহাসন লাভের পর টুর্গো (Turgot) এবং নেকার (Necker) নামক দুইজন সুযোগ্য অর্থনীতিবিদ ক্রমান্বয়ে মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎকাল প্রচলিত করনীতি ও শাসন-

সংস্কারের ব্যর্থ চেষ্টা

ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া রাজকোষের অর্থাভাব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী মেরী অ্যাণ্টয়নেট্ (Marie Antoinette) এবং রাজপারিষদবর্গের বিরোধিতায় তাঁহাদের প্রচেষ্টা বিফল হয় এবং দুর্বল রাজা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে রাজকোষের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। দেশে নানাপ্রকার বিক্ষোভের চিহ্ন দেখা গেল। তখন ষোড়শ লুই অর্থসংগ্রহের এবং বিক্ষোভ নিবারণের উপায়ান্তর না দেখিয়া 'স্টেট্স্-জেনারেল' নামক প্রতিনিধি-সভা আহ্বান করিলেন।

'স্টেটস্-জেনারেল'

১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর এই প্রতিনিধি-সভা আর আহূত হয় নাই। সুতরাং নির্বাচন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবনে নূতন ভাবের—নূতন আশার সঞ্চার হইল। নির্বাচকগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি 'cahiers' নামে পরিচিত ঘোষণাপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইল।

স্টেট্স্-জেনারেল তিনটি শাখায় (Estate) বিভক্ত ছিল—যাজকগণ (First Estate)—ইহাদের সংখ্যা ৩০৮; অভিজাতগণ (Second Estate)—ইহাদের সংখ্যা ২৮৫; জনসাধারণ (Third Estate)—ইহাদের সংখ্যা ৬২১। প্রত্যেক শাখা পৃথক্‌ভাবে ভোট দিলে সংস্কারবিরোধী যাজক ও অভিজাতগণ Third Estate-এর সর্ববিধ সংস্কার-প্রচেষ্টা বানচাল করিতে পারিতেন। কিন্তু তিন শাখার সদস্যগণ সম্মিলিত ভাবে ভোট দিলে জনসাধারণের মতই প্রবল হইত এবং সংস্কারপ্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারিত। সুতরাং স্টেট্স্-জেনারেলের অধিবেশন আরম্ভ হইলেই (মে, ১৭৮৯) ভোটদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিল। রাজা এবং উচ্চতর দুইটি শাখা পৃথক্‌ভাবে ভোটদানের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তৃতীয় শাখা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। রাজা বলপ্রয়োগে সভাগৃহ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তৃতীয় শাখার সভ্যগণ সভাগৃহের পার্শ্ববর্তী টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হইয়া শপথ (Tennis Court Oath) গ্রহণ করিলেন যে তাঁহারা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান প্রস্তুত না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিন শাখা সম্মিলিত ভাবে ভোট দিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন (জুন, ১৭৮৯)।

ভোটদানের পদ্ধতি

ইতিমধ্যে তৃতীয় শাখার সভ্যগণ 'স্টেট্স্-জেনারেলকে' জাতীয় সভা (National Assembly) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন (জুন, ১৭৮৯)।

তাঁহাদের প্রধান নেতা ছিলেন মিরাবো (Mirabeau)। রাজা ভোট সম্বন্ধে তৃতীয় শাখার দাবি মানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিস শহরে এবং মফঃস্বলে নানাস্থানে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ব্যাপকভাবে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিল। এক উন্মত্ত জনতা বাস্তিল (Bastille) নামক কারাদুর্গ (যেখানে বিনাবিচারে আটক বন্দীদিগকে আবদ্ধ রাখা হইত) অধিকার করিল (জুলাই, ১৭৮৯)। কিছুকাল পরে ক্ষুৎপীড়িত কয়েক সহস্র স্ত্রীলোক খাদ্য দাবি করিতে করিতে রাজার বাসস্থান ভার্সাইতে উপস্থিত হইল এবং প্রায় বন্দী অবস্থায় রাজা ও রাণীকে প্যারিসে আনয়ন করিল (অক্টোবর, ১৭৮৯)। দেশের সর্বত্র শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িল।

জনতার বিদ্রোহ

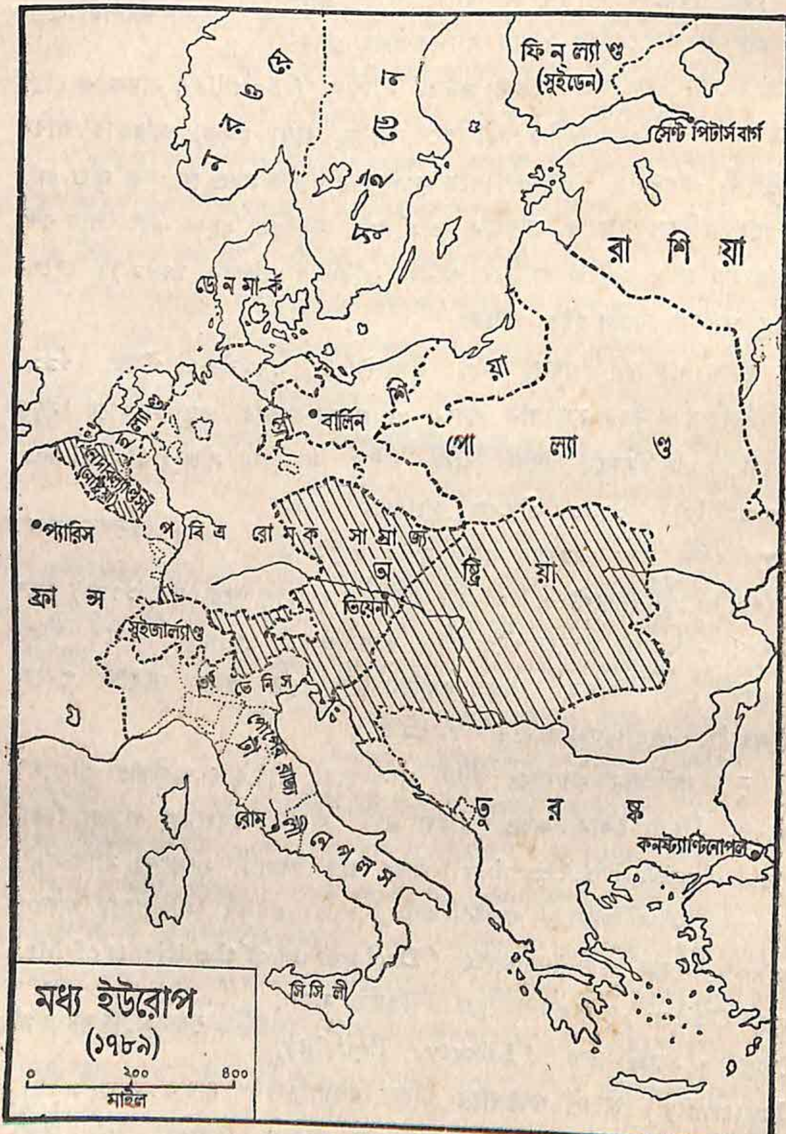
ইহার পর দুই বৎসর কাল (অক্টোবর, ১৭৮৯—সেপ্টেম্বর, ১৭৯১) প্রতিনিধি-সভা নূতন সংবিধান প্রণয়ন ও শাসন-সংস্কার প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত রহিল। এই সময়ে ইহার নাম হইল সংবিধান সভা (Constituent Assembly)। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান প্রণয়ন সম্পূর্ণ হইল এবং নিরুপায় রাজা নূতন সংবিধান মানিয়া লইলেন (সেপ্টেম্বর, ১৭৯১)। ইহার কয়েকমাস পূর্বে (জুন, ১৭৯১) দেশে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের প্রভাবে ভীত হইয়া রাজা ও রাণী গোপনে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু পলায়নকালে ধৃত হইয়া তাঁহারা পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন।

নূতন সংবিধান

নূতন সংবিধান অনুসারে রাজা শাসনযন্ত্রের শীর্ষদেশে অবস্থিত থাকিলেও কার্যতঃ তাঁহার কোন ক্ষমতা রহিল না। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিধান সভার (Legislative Assembly) উপর ন্যস্ত হইল। সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে নাগরিকগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হইল। ইতিপূর্বেই মানুষের অধিকার সম্বন্ধে এক ঘোষণাপত্র (Declaration of the Rights of Man and Citizen) গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার (Liberty, Equality, Fraternity) আদর্শ স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। যাজকগণকে সরকারী কর্মচারীতে পরিণত করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা পোপের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন (Civil Constitution of the Clergy) (জুলাই, ১৭৯০)। অভিজাতগণের সামন্ততান্ত্রিক অধিকারগুলি বিলুপ্ত হইয়াছিল,

নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন

ভূমিদাস প্রথা (serfdom) রহিত হইয়াছিল। এই সকল পরিবর্তনের ফলে ফ্রান্সের সমাজ ও রাষ্ট্র নবরূপ ধারণ করিল।



সংবিধান সভার কার্য সমাপ্ত হইলে নবনির্বাচিত বিধান সভা (Legislative Assembly) কার্যভার গ্রহণ করিল। ইহার কার্যকাল এক বৎসর মাত্র

ভূমিদাস প্রথা (serfdom) রহিত হইয়াছিল। এই সকল পরিবর্তনের ফলে ফ্রান্সের সমাজ ও রাষ্ট্র নবরূপ ধারণ করিল।

সংবিধান সভার কার্য সমাপ্ত হইলে নবনির্বাচিত বিধান সভা (Legislative Assembly) কার্যভার গ্রহণ করিল। ইহার কার্যকাল এক বৎসর মাত্র (অক্টোবর, ১৭৯১—সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। এই সভার সদস্যগণ কয়েকটি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হইলেন; ইহাদের মধ্যে রাজতন্ত্রবিরোধী ও বামপন্থী জেকোবিন (Jacobin) দল এবং গিরণ্ডিস্ট (Girondist) দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাজকগণ ও দেশত্যাগী অভিজাতগণ (Emigres) সম্বন্ধে রাজার সহিত বিধান সভার মতভেদ হইল (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৭৯১)। ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (এপ্রিল, ১৭৯২)। প্যারিসের জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজা ও রাণীকে বন্দী করিল (আগস্ট, ১৭৯২)। অতঃপর উন্মত্ত জনতা রাজার প্রতি আনুগত্যের সন্দেহে বহু লোক হত্যা করিল (September Massacre) (সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান বাতিল হইল, রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হইল (সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সভা (National Convention) নূতন সংবিধান প্রণয়ন করিবে বলিয়া স্থির হইল।

রাজনৈতিক দল

রাজতন্ত্রের বিলোপ

বিপ্লবের যুদ্ধ (১৭৯২-১৭৯৫): পূর্বেই বলা হইয়াছে, সংবিধান সভার কার্যকালের শেষ দিকে—১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে—রাজা ও রাণী দেশে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের প্রভাবে ভীত হইয়া গোপনে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু পলায়নকালে ধৃত হইয়া তাঁহারা পুনরায় রাজধানীতে আনীত হন। ইহাতে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে রাজার সম্বন্ধে বিরোধী মনোভাব প্রবল হইল, ফ্রান্সের বাহিরে ইউরোপের রাজগণ বুঝিতে পারিলেন যে ষোড়শ লুই প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবীদের হস্তে বন্দী রহিয়াছেন। রাণীর ভ্রাতা, অস্ট্রিয়াধিপতি সম্রাট লিওপোল্ড, এক প্রচারপত্র দ্বারা ইউরোপের রাজগণকে অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহারা ষোড়শ লুইর সমস্যাকে সমগ্র রাজতন্ত্রের সমস্যারূপে গ্রহণ করেন (জুলাই, ১৭৯১)। কিছুদিন পরে লিওপোল্ড এবং প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম সম্মিলিতভাবে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন (আগস্ট, ১৭৯১)। এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনের ফলে গিরণ্ডিস্ট

যুদ্ধের কারণ

দল বিপ্লব-বিরোধী বৈদেশিক রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্য ব্যগ্র হইল। স্বৈরাচারী রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপলক্ষ্যে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের বাণী প্রচার করা এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিরুপায় রাজার সম্মতি আদায় করিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। এইরূপে ইউরোপে বিপ্লবের যুদ্ধের (Revolutionary War) সূত্রপাত হইল। এই যুদ্ধ দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী প্রথমে জয়লাভ করিলেও কয়েক মাসের মধ্যেই ভামির (Valmy) যুদ্ধে বিপ্লবী সৈন্যদল বিজয়ী হইল (সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)। ইতিমধ্যে প্যারিসের জনতা রাজপরিবারকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল এবং সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড (September Massacre) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজার প্রাণদণ্ড

ভামির যুদ্ধের পরের দিনই রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘোষণা করা হইল। কিছুদিন পরে রাজার বিচার এবং (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) প্রাণদণ্ড হইল।

এদিকে ভামির যুদ্ধে বিজয়ী সেনাপতি ডুমুরিয়েজ (Dumouriez) নূতন উদ্যমে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন নেদারল্যাণ্ড্স্ (বর্তমান বেলজিয়ম) অধিকার করিলেন। বিপ্লবী জাতীয় সভা (National Convention) ঘোষণা করিল যে ইউরোপের সর্বত্র অত্যাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসী জাতি সংগ্রাম করিবে। বিপ্লবী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হইল। কার্নট (Carnot) সামরিক ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও স্পেন বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত যোগ দিল। কিন্তু ফরাসী বাহিনী বার বার জয়লাভ করিয়া এই শক্তিসঙ্ঘ (First Coalition) দুর্বল করিয়া ফেলিল। হল্যাণ্ড কার্যতঃ ফ্রান্সের অনুগত মিত্রে পরিণত হইল। স্পেন ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল; ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া সন্ধি করিল না। তিন বৎসরের (১৭৯৩-১৭৯৫) মধ্যে বিপ্লবী ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়

আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী (১৭৯২-১৭৯৯)ঃ জাতীয় সভার (National Convention) কার্যকাল ছিল মাত্র তিন বৎসর (১৭৯২-১৭৯৫), কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার বৈদেশিক নীতি এবং আভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্য

বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। ফরাসী বাহিনী বৈদেশিক যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া স্বদেশে বৈপ্লবিক সংস্কারগুলিকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল, স্বৈরাচারী রাজগণের সামরিক শক্তির সাহায্যে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের কোন সম্ভাবনা রহিল না। রাজার প্রাণদণ্ডের ফলে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি অনেকখানি সুদৃঢ় হইল।

বিপ্লবের সাফল্য

বিপ্লবের প্রথম দিকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন মিরাবো (Mirabeau)। তিনি স্বয়ং অভিজাত বংশোদ্ভূত হইলেও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তি এবং উৎসাহ অতুলনীয় ছিল। তিনি অনেক বিষয়ে রাজার সহিত আপোষ-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মিরাবো

বৈজ্ঞানিক এবং সংবাদপত্র-পরিচালক ম্যারাট (Marat) জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য চরম পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্যারিসের জনতার তিনি বিশেষ প্রিয় নেতা ছিলেন। চরমপন্থী দলের অপর নেতা ছিলেন ড্যান্টন (Danton)। ম্যারাটের সহযোগিতায় এবং প্যারিসের জনতার সমর্থনে তিনি রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন পরিচালনা করেন। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করিলে ড্যান্টন কার্যতঃ ফ্রান্সে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন। ফরাসী বাহিনীকে জয়লাভে উদ্বুদ্ধ করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

ম্যারাট ও ড্যান্টন

গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন রোব্‌স্পীয়ের (Robespierre)। তিনি মধ্যবিত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ রুসোর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে জেকোবিন দল শক্তিশালী হইয়া উঠে।

রোব্‌স্পীয়ের

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, রাজার প্রাণদণ্ডের কিছুদিন পরে, জাতীয় সভা ৯ জন (পরে ১২ জন) সভ্য দ্বারা গঠিত এক সমিতির উপর দেশের শাসনভার অর্পণ করে। ইহা 'জনসাধারণের নিরাপত্তা সমিতি' (Committee of Public Safety) নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সমিতির নির্দেশ অনুসারে ১৭৯৩-৯৪

খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ফ্রান্সে প্রায় ২০,০০০ লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। যাহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিপ্লববিরোধী বা রাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া সন্দেহ করা যাইত তাহারই প্রাণদণ্ড হইত। এই নৃশংস ব্যবস্থা 'বিভীষিকার রাজত্ব' (Reign of Terror) নামে ইতিহাসে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। রাণী মেরী অ্যান্টয়নেট এই সময়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ড্যান্টন ও রোব্‌স্পীয়ের উক্ত সমিতির নায়ক ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারাও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। রোব্‌স্পীয়েরের মৃত্যুর পর 'বিভীষিকার রাজত্বে'র পরিসমাপ্তি ঘটিল।

নরহত্যা

জাতীয় সভার (National Convention) আমলে ফ্রান্সে প্রথমে 'যুক্তির পূজা' (worship of reason) এবং পরে 'সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের পূজা' (worship of Supreme Being) প্রবর্তিত হয়।

ধর্ম

জাতীয় সভা একটি নূতন সংবিধান প্রস্তুত করিয়াছিল। এই সংবিধান অনুসারে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিরেক্টরগণের শাসন (Directory) আরম্ভ হয়। ডিরেক্টরগণের শাসনকাল মাত্র চারি বৎসর (১৭৯৫-১৭৯৯) স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহারা আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। আন্তর্জাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী বাহিনী জয়লাভ করিতেছিল, কিন্তু এই সাফল্যের গৌরব লাভ করিলেন সেনাপতি নেপোলিয়ন। শেষে তিনি অকর্মণ্য ডিরেক্টরগণকে বিতাড়িত করিয়া শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিলেন।

ডিরেক্টরগণের শাসন

৩। নেপোলিয়ন (Napoleon)

প্রথম জীবন ঃ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ইটালীর অন্তর্গত কর্সিকা (Corsica) দ্বীপে আজাসিও (Ajaccio) শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের অল্পদিন পূর্বে ঐ দ্বীপটি ফ্রান্সের শাসনাধীন হইয়াছিল। এই সূত্রে তিনি প্রকৃতপক্ষে ইটালীর সন্তান হইলেও ফ্রান্সের সহিত তাঁহার ভাগ্য জড়িত হইয়া পড়ে।

প্রথম যৌবনে নেপোলিয়ন ফরাসী-শাসনের বিরুদ্ধে কর্সিকার মুক্তি-সংগ্রামের নায়কত্ব লাভের স্বপ্ন দেখিতেন। পরে ফরাসী বিপ্লব তাঁহাকে বৃহত্তর

কর্মক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। তিনি ফ্রান্সে সামরিক শিক্ষালাভ করিয়া ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ নৌবহর কর্তৃক টুলোঁ (Toulon) বন্দর আক্রান্ত হইলে তিনি বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দ্বারা ঐ বন্দর রক্ষা করেন। জেকোবিন দলের সহিত তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ যোগাযোগ ছিল। ডিরেক্টরগণের শাসনকালে ইটালী অভিযানে (১৭৯৬-১৭৯৭) তাঁহার অসামান্য সামরিক প্রতিভার বিকাশ হইল। অস্ট্রিয়াকে বারবার পরাজিত করিয়া তিনি সন্ধি (Treaty of Campo Formio) করিতে বাধ্য করেন; এই সন্ধি দ্বারা উত্তর ইটালীর কিয়দংশ এবং নেদারল্যাণ্ড্স্ (বেলজিয়ম) ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপে যে শক্তিসঙ্ঘ (First Coalition) গঠিত হইয়াছিল তাহা অস্ট্রিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করায় ভাঙ্গিয়া গেল, কেবলমাত্র ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। তখন বিপ্লবী ফ্রান্সের স্বার্থে ইংলণ্ডের শক্তি খর্ব করা আবশ্যক হইল।

ইটালী অভিযান

নেপোলিয়নের সামরিক কীর্তি তাঁহাকে ফ্রান্সের জনগণের হৃদয়ে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। অকর্মণ্য ডিরেক্টরগণের ব্যর্থতার সহিত বিজয়ী সেনাপতির কর্মকুশলতার তুলনা মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশর আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিকে সাফল্যলাভের পর তিনি সিরিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হইলেন এবং নীল নদের যুদ্ধে (Battle of the Nile) ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসন (Nelson) তাঁহাকে পরাজিত করিলেন (১৭৯৮)। তখন নেপোলিয়ন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মিশর বিজয়ে সাফল্যলাভ না করিলেও এই দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে ফরাসী জাতির দৃষ্টিতে তাঁহার মর্যাদা ও প্রভাব আরও বাড়িয়া গেল।

মিশর আক্রমণ

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ (Second Coalition) গঠিত হইল; ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া সম্মিলিতভাবে বিপ্লবী ফ্রান্সের শক্তিহ্রাসে বদ্ধপরিকর হইল। ইটালী হইতে ফরাসী বাহিনী বিতাড়িত হইল। নেপোলিয়ন যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন ফরাসী জাতি পরাজয়ের ফলে বিষণ্ণ এবং ডিরেক্টরগণের সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ। নেপোলিয়ন এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর

মাসে তিনি একদল অনুগত সৈন্যের সাহায্যে ডিরেক্টরগণকে পদচ্যুত করিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এক নূতন সংবিধান প্রচারিত হইল। এই সংবিধান অনুসারে তিনজন কন্সাল (Consul) যুক্তভাবে ফ্রান্সের শাসক হইলেন। কার্যতঃ নেপোলিয়নই প্রথম কন্সাল (First Consul) রূপে সকল ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। এইরূপে বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর দশ বৎসরের মধ্যেই ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির ধ্বংসস্তূপের উপরে সামরিক শক্তি দ্বারা সমর্থিত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

ডিরেক্টরগণের পদচ্যুতি

নূতন সংবিধান

নেপোলিয়নের এই সাফল্যের মূলে ছিল তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, কর্মশক্তি, অতুলনীয় উচ্চাশা এবং আত্মবিশ্বাস। তিনি নিজেকে ভাগ্যদেবীর প্রিয়পাত্র বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সৈন্যদলের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জন করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ফ্রান্সকে সামরিক জয়মাল্যে ভূষিত করিয়া তিনি জনসাধারণের বিশ্বাস ও আনুগত্য লাভ করেন।

নেপোলিয়নের সাফল্যের কারণ

প্রথম কন্সাল রূপে নেপোলিয়ন (১৭৯৯-১৮০৪)ঃ ক্ষমতালাভের পর প্রথম কন্সালের প্রধান কর্তব্য হইল ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘের (Second Coalition) প্রতিরোধ করা। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ড সম্মিলিত হইয়া এই সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিল। তিনি রাশিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ম্যারেঙ্গো (Marengo) এবং হোহেনলিণ্ডেনের (Hohenlinden) যুদ্ধে (১৮০০) পরাজিত হইয়া অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধিসূত্রে (Treaty of Luneville) আবদ্ধ হইল (১৮০১), ইটালীতে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু নৌযুদ্ধে ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না; নেলসন মিশর হইতে ফরাসী বাহিনী বিতাড়িত করিলেন (১৮০১) এবং কোপেনহেগেনে ইংলণ্ড-বিরোধী নৌবাহিনী বিধ্বস্ত করিলেন (১৮০১)। অতঃপর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে সাময়িক সন্ধি (Treaty of Amiens) স্থাপিত হইল (১৮০২)।

অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন চিরজীবনের জন্য কন্সাল হন। দুই বৎসর পরে সিনেটের প্রস্তাব অনুসারে গণভোটের সমর্থনে তিনি 'ফরাসী জাতির সম্রাট' (Emperor of the French) উপাধি গ্রহণ করেন (ডিসেম্বর, ১৮০৪)।

শাসন-সংস্কারে নেপোলিয়নের কৃতিত্বঃ সমরক্ষেত্রে নেপোলিয়ন অনন্যসাধারণ কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি নানাবিধ শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিয়া ফ্রান্সের সর্বতোমুখী উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র তরবারির সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই, সুশাসন দ্বারা সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার পতনের পরেও তাঁহার প্রবর্তিত সংস্কারগুলি ফ্রান্সের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিয়াছিল। একাধারে দিগ্বিজয়ী ও শাসন-সংস্কারক রূপে নেপোলিয়ন প্রাচীন রোমের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ জুলিয়াস সীজারের (Julius Caesar) সহিত তুলনীয়।

দিগ্বিজয়ী ও শাসন-সংস্কারক

ফরাসী বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটাইয়া গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু সামরিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রবর্তন করিয়া নেপোলিয়ন এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন। বিপ্লবের ফলে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বহু ক্ষমতা নির্বাচিত সমিতিগুলির হস্তগত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত করেন। প্রথমে কন্সাল রূপে, পরে সম্রাট রূপে তিনি সমুদয় ক্ষমতা নিজের হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। গণতন্ত্রকে অস্বীকার করিয়া তিনি জনসাধারণের স্বাধীনতা (Liberty) হরণ করেন। এজন্য তাঁহাকে ফরাসী বিপ্লবের শত্রুরূপে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু তিনি সমাজ-জীবনে, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রসেবায় সাম্য (Equality) প্রতিষ্ঠা করিয়া বিপ্লবের একটি মৌলিক নীতি স্বীকার করেন। তাঁহার শাসনকালে মানুষ জন্মগত মর্যাদার ভিত্তিতে কোন বিশেষ অধিকার পাইত না, গুণানুসারে অধিকার ও সুযোগ পাইত ("career open to talents")। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাতা রূপে নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের সন্তান।

স্বাধীনতা হরণ

সামাজিক সাম্য স্থাপন

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নতির জন্য তিনি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Bank of France) স্থাপন করেন। তিনি ফ্রান্সের মুদ্রা-ব্যবস্থার (currency) সংস্কার করেন এবং কর আদায়ের সুব্যবস্থা করেন। যাতায়াত ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বহু প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত

হইল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বন্দরগুলির উন্নতি করা হইল। উত্তর আমেরিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ফ্রান্স ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ পাইল। কৃষির উন্নতির জন্যও নেপোলিয়ন যত্নশীল ছিলেন।

অর্থ নৈতিক উন্নতি

বিপ্লবের সময় ক্যাথলিক চার্চের সহিত ফরাসী রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। নেপোলিয়ন পোপের সহিত এক চুক্তি (Concordat) দ্বারা ক্যাথলিক চার্চকে পুনরায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন (১৮০১)। এই ব্যবস্থার ফলে নেপোলিয়ন পোপের এবং ফরাসী ক্যাথলিকগণের সহযোগিতা লাভ করেন। এই চুক্তি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

চার্চের উপর কর্তৃত্ব

প্রচলিত আইনের সংস্কার করিয়া তিনি সেগুলিকে নূতনভাবে বিধিবদ্ধ করেন। আইন সংক্রান্ত এই সংহিতা তাঁহার নামে (Code Napoleon) পরিচিত হইয়াছিল (১৮০৪)। এই সংহিতায় সামাজিক সাম্য (civil equality), ধর্ম সম্বন্ধে পরমতসহিষ্ণুতা, সামন্ততন্ত্রের বিলোপ, ভূমিদাসগণের (serfs) মুক্তি প্রভৃতি উদার নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল। বিপ্লবের ফলে জনসাধারণ যে সকল পৌর অধিকার (civil rights) লাভ করে তাহা এই সংহিতা দ্বারা পাকাপাকি ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। ফ্রান্সের বাহিরে—ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে—এই সংহিতার প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ইউরোপের এক বৃহৎ অংশের আইন নেপোলিয়নের সংস্কারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আইন সংস্কার

শিক্ষাক্ষেত্রেও নেপোলিয়ন বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন। সমগ্র দেশে একই নীতি অনুসারে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে বহু জাতীয় বিদ্যালয় এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় (University of France) প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইউরোপের নানা দেশ হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য প্যারিসে যাদুঘরের (the Louvre) শোভাবর্ধন করিল। সৌন্দর্য ও জনসংখ্যায় প্যারিস ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিল।

শিক্ষা ও শিল্প

যুদ্ধক্ষেত্রে ও শাসনকার্যে সমভাবে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন নেপোলিয়নের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামরিক প্রতিভা দ্বারা তিনি যে সাম্রাজ্য

সৃষ্টি করেন তাহা স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্তি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

বিজয়ী নেপোলিয়ন (১৮০৪-১৮০৮)ঃ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট রূপে নেপোলিয়ন অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। এক বিশাল এবং আপাতদৃষ্টিতে অপরাজেয় বাহিনী তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। ফ্রান্সের জনসাধারণের অবিচলিত আনুগত্যে তিনি শক্তিমান। সুতরাং তিনি সমগ্র ইউরোপে নিজের প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য উৎসুক হইলেন। কন্সাল রূপে তিনি প্রধানতঃ শান্তির নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট রূপে তাঁহার দশ বৎসরব্যাপী শাসনকাল প্রধানতঃ যুদ্ধেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

সম্রাটরূপে নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নের সম্রাট উপাধি গ্রহণের পূর্বেই ইংলণ্ডের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল (১৮০৩)। তিনি ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য উদ্যোগী হইলেন। ইংলণ্ড বাণিজ্য ও নৌ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইল। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছোট উইলিয়ম পিটের (William Pitt the Younger) চেষ্টায় ইউরোপে ফ্রান্সবিরোধী তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ (Third Coalition) গঠিত হইল (১৮০৫); ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং সুইডেন নেপোলিয়নের পতন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইল।

ইংলণ্ড

নেপোলিয়ন পূর্বদিক হইতে সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নিজে ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি অস্ট্রিয়াকে পরাজিত (Battle of Ulm) করিয়া (১৮০৫) অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভিয়েনা অধিকারের পর তিনি অস্টারলিজের (Austerlitz) যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন (১৮০৫)। এই পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধি (Treaty of Pressburg) করিতে বাধ্য হইল, নেপোলিয়ন ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস প্রদেশ লাভ করিলেন (১৮০৫)। কিন্তু ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জেনার (Jena) যুদ্ধে (১৮০৬) প্রাশিয়ার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইল। নেপোলিয়ন বিজয়-গৌরবে বার্লিনে প্রবেশ করিলেন; প্রাশিয়ার

অস্ট্রিয়া

প্রাশিয়া

এক বৃহৎ অংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। অতঃপর ফ্রাইড্‌ল্যাণ্ডের (Friedland) যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইল (১৮০৭)। রাশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার (Alexander I) টিলসিটের সন্ধি (Treaty of Tilsit) দ্বারা নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন (১৮০৭)। তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু ইতিপূর্বে ট্রাফাল্‌গারের (Trafalgar) যুদ্ধে (১৮০৫) নেলসন ফরাসী নৌ-বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে আহত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহার কৃতিত্বের ফলে ইংলণ্ডের নৌ-বল সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাশিয়া

ইংলণ্ড

টিলসিটের সন্ধির পর নেপোলিয়ন ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র ফ্রান্সের অধীশ্বর ছিলেন তাহা নহে। তিনি উত্তর ইটালীর রাজা ছিলেন, রোমের পোপ ছিলেন তাঁহার মিত্র এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোসেফ নেপলস (দক্ষিণ ইটালী) শাসন করিতেন। তাঁহার অপর ভ্রাতা লুই ছিলেন হল্যাণ্ডের রাজা। স্পেন ও ডেনমার্কের রাজগণ তাঁহার অনুগত মিত্র ছিলেন। রাশিয়ার সম্রাট ছিলেন তাঁহার সহযোগী বন্ধু। প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া পরাজয়ের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র জার্মানী কার্যতঃ নেপোলিয়নের প্রভাবাধীন ছিল। পূর্বে জার্মানীতে তিন শতের অধিক রাজ্য ও রাজ্যখণ্ড ছিল ; নেপোলিয়নের সময়ে উহাদের সংখ্যা কমিয়া একশতের নীচে দাঁড়ায়। ইহার কারণ এই যে ফ্রান্স ও তাহার অনুগত ব্যাভেরিয়া (Bavaria) প্রভৃতি রাজ্য অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ড গ্রাস করিয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন 'রাইন নদীর রাজ্যসঙ্ঘ' (Confederation of the Rhine) স্থাপন করিয়া স্বয়ং উহার রক্ষাকর্তা (Protector) হইলেন। তাঁহার নির্দেশে এক সহস্র বৎসরের প্রাচীন সংস্থা 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য' (Holy Roman Empire) বিলুপ্ত হইল (১৮০৬)। তখন ঐ সাম্রাজ্যের প্রাক্তন সম্রাট হ্যাপ্‌সবুর্গ বংশীয় অস্ট্রিয়াধিপতি 'অস্ট্রিয়ার সম্রাট'—এই নূতন উপাধি ধারণ করিলেন।

নেপোলিয়নের ক্ষমতার চরমোৎকর্ষ

নেপোলিয়নের পতন (১৮০৮-১৮১৫): ১৮০৫-১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়ন যে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা ঐ

মহাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার পতন আরম্ভ হয়। বয়স বৃদ্ধির ফলে এবং ক্ষমতার গর্বে তাঁহার চরিত্রে ও কার্যপদ্ধতিতে কিছু অবনতি ঘটিয়াছিল। তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, সকল বিষয়েই নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতেন। কিন্তু অসামান্য শক্তিধর পুরুষের পক্ষেও এত বড় সাম্রাজ্যের কার্যভার একা বহন করা সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর গঠন এবং প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইতেছিল। বিপ্লবী সৈন্যদলের প্রাথমিক উন্মাদনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সৈন্য সংগ্রহের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা (conscription) অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের বিশাল বাহিনীতে (Grand Army) ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বহু লোক প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা আর পূর্ববৎ ফ্রান্সের জাতীয় বাহিনী ছিল না। সুতরাং সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে নাই।

চরিত্রের অবনতি

সৈন্যদলের অবনতি

নেপোলিয়ন যখন ইউরোপ মহাদেশে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন (১৮০৫-১৮০৭) তখন সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনীর একাধিপত্য সুদৃঢ় হইয়াছিল। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন অপরাজেয় হইলেও জলযুদ্ধে তিনি মোটেই ইংলণ্ডের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। জলপথে ফ্রান্সের দুর্বলতার জন্য ফরাসী সৈন্যদলের পক্ষে ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। এইজন্য নেপোলিয়ন স্থির করিলেন যে ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য ধ্বংস করিয়া তিনি ইংরেজ জাতির অর্থনৈতিক শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। তিনি ইংরেজদিগকে 'দোকানদারের জাতি' ("nation of shop-keepers") বলিয়া মনে করিতেন। বণিকের জাতি বাণিজ্য হারাইলেই তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে—ইহাই ছিল তাঁহার আশা।

নৌ-বলে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নেপোলিয়ন বার্লিন ও মিলান হইতে কয়েকটি নির্দেশ (Berlin Decree, Milan Decree) প্রচার করিয়া তাঁহার কর্তৃত্বাধীন দেশগুলির সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ফ্রান্স এবং তাহার অনুগত দেশগুলির কোন বন্দরে ইংলণ্ডজাত কোন বাণিজ্যদ্রব্য প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, ইহাই ছিল ঐ নির্দেশ-

ইংলণ্ডের বাণিজ্য ধ্বংসের চেষ্টা

গুলির মর্ম। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের এই ব্যবস্থা Continental System নামে পরিচিত। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড ঘোষণা করিল যে সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনী ফ্রান্স ও তাহার অনুগত দেশগুলির বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবে।

এই বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষই নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইল, কিন্তু নেপোলিয়নের অসুবিধাই বেশী হইল। প্রথমতঃ, ইউরোপের সুদীর্ঘ উপকূলে নৌ-পাহারার ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ ফ্রান্সের নৌবল সামরিক বলের তুলনায় অনেক কম ছিল। পক্ষান্তরে ইংলণ্ড নৌবলে এত বলীয়ান ছিল যে ইউরোপের বন্দরগুলি অবরুদ্ধ রাখিয়া ফ্রান্স ও ফরাসী প্রভাবাধীন দেশগুলির বহির্বাণিজ্য নষ্ট করা ইংরেজ নৌবাহিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে ফ্রান্সের অনুগত সকল দেশে তাঁহার নির্দেশগুলি কার্যকর করা সম্ভব নহে। শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে ইংলণ্ডে বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দ্রব্যের উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলিতে শিল্পের উন্নতি স্থগিত ছিল। ফলে ঐ সকল দেশে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। এই চাহিদা পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া নেপোলিয়ন ইউরোপের এক বৃহৎ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করিলেন। ফলে বিভিন্ন দেশে তাঁহার বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষের উৎপত্তি হইল। বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ইংলণ্ডজাত দ্রব্য আমদানি করিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না। ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিনষ্ট করিবার নীতি নেপোলিয়নকে প্রবল রাজনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত করিল। এই উপলক্ষ্যে রোমের পোপের সহিত তাঁহার মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন হইল; পোপের রাজ্য অধিকার করিয়া (১৮০৯) তিনি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা লুই হল্যাণ্ডে তাঁহার নির্দেশ কার্যকর করিতে অস্বীকার করায় পদচ্যুত হইলেন, হল্যাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

স্পেনে ও পর্তুগালে ইংলণ্ডজাত দ্রব্য আমদানি বন্ধ করিবার জন্য ফরাসী বাহিনী ঐ দুইটি দেশ আক্রমণ করিল (১৮০৭)। পর্তুগালের রাজপরিবার পলায়ন করিয়া পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, দক্ষিণ

আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্পেনের বুর্বোঁবংশীয় রাজাকে পদত্যাগ করাইয়া নেপোলিয়ন নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (১৮০৮)। কিন্তু স্পেনের জনসাধারণ এই ব্যবস্থা মানিতে স্বীকৃত না হইয়া ফরাসী-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিল। ইংলণ্ড সৈন্য ও অর্থ দ্বারা পর্তুগালে ও স্পেনে ফরাসীবিরোধী আন্দোলন সমর্থন করিতে লাগিল। এইভাবে 'উপদ্বীপের যুদ্ধ' (Peninsular War) আরম্ভ হইল (১৮০৮)। নানা কারণে ফরাসী বাহিনী এই যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন (Duke of Wellington) স্পেনের রাজধানী মাড্রিড অধিকার করিলেন; জোসেফ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

'উপদ্বীপের যুদ্ধ'

স্থলযুদ্ধে অপরাজেয় ফরাসী বাহিনী স্পেনে ও পর্তুগালে প্রথম পরাজয়ের সম্মুখীন হইল। ইহার প্রধান কারণ এই দুইটি দেশে বৈদেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ। এতদিন পর্যন্ত নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি দেশের স্বৈরাচারী রাজগণের বেতনভোগী সৈন্যদল বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন; 'উপদ্বীপের যুদ্ধে' তিনি প্রথম স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর জাতীয় সৈন্যদলের সম্মুখীন হইলেন। ক্রমে জাতীয় প্রতিরোধের এই নূতন ভাব স্পেন হইতে জার্মানীতে প্রবেশ করিল।

ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ

অস্ট্রিয়া নূতন ভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮০৯)। নেপোলিয়ন জয়লাভ (Battle of Wagram) করিয়া অস্ট্রিয়াকে অপমানজনক সর্তে সন্ধি (Treaty of Vienna) করিতে বাধ্য করিলেন। অস্ট্রিয়া যে কেবলমাত্র কয়েকটি রাজ্যখণ্ড হারাইল তাহা নহে, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিতে এবং দেড় লক্ষের বেশী সৈন্য না রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল। অস্ট্রিয়ার সম্রাটের কন্যার সহিত নেপোলিয়নের বিবাহ হইল (১৮১০); পর বৎসর তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু সন্ধি ও পারিবারিক বন্ধন সত্ত্বেও অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন রহিল।

অস্ট্রিয়া

ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যের আঘাতে প্রাশিয়ায় নবজীবনের সঞ্চার হইতেছিল। স্টাইন (Stein) এবং হার্ডেনবার্গ (Hardenberg) নামক দুইজন সুদক্ষ মন্ত্রীর চেষ্টায় প্রাশিয়ার শাসন-পদ্ধতিতে এবং সামরিক সংগঠনে বিশেষ উন্নতি ঘটিল। শক্তিমান জাতি গঠনের

প্রাশিয়া

উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও বহু সংস্কার প্রবর্তিত হইল; বার্লিনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮০৯)। প্রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

Continental System উপলক্ষ্য করিয়া রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সহিত নেপোলিয়নের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য নেপোলিয়নের নির্দেশ আলেকজাণ্ডার মানিয়া লইতে পারেন নাই। অন্যান্য কারণে বিচ্ছেদ শত্রুতায় পরিণত হইল; ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন এক বিরাট বাহিনী লইয়া রাশিয়া আক্রমণ করিলেন। মস্কো অধিকৃত হইল; কিন্তু শীতে, খাদ্যাভাবে এবং জনসাধারণের বিরোধিতায় নেপোলিয়ন সসৈন্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। এই অভিযানে এত সৈন্যক্ষয় হইল যে সামরিক দিক হইতে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন। দিগ্বিজয়ী রূপে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা ম্লান হইয়া গেল।

রাশিয়া

তখন সুযোগ বুঝিয়া রাশিয়ার সাহায্যে প্রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল (১৮১৩)। জার্মান জাতির ইতিহাসে ইহার নাম 'মুক্তি সংগ্রাম' (War of Liberation)। স্পেনে জনযুদ্ধের সাফল্য জার্মানদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। লাইপ্‌জিগের (Leipzig) যুদ্ধে প্রাশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন (১৮১৩)। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির এই সম্মিলিত প্রতিরোধ ইতিহাসে 'জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ' (Battle of the Nations) নামে প্রসিদ্ধ।

জার্মানীর মুক্তিযুদ্ধ

লাইপ্‌জিগের যুদ্ধের ফলে কেবল যে জার্মানী নেপোলিয়নের কবলমুক্ত হইল তাহা নহে, ইউরোপে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনুগত রাজগণ নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ করিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করিল। ইংলণ্ড এই মিত্রসঙ্ঘে যোগ দিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও নেপোলিয়ন এই প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না; প্যারিস শত্রুহস্তে পতিত হইল। তখন তিনি বাধ্য হইয়া সন্ধি করিলেন। ফ্রান্সের সিংহাসনের উপর সমুদয় দাবি পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্ষুদ্র এল্‌বা দ্বীপের (Elba) আধিপত্য

নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ

গ্রহণ করিলেন (এপ্রিল, ১৮১৪)। বিজয়ী শক্তিবর্গ ফ্রান্সে বুর্বোঁ রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল; ষোড়শ লুইর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII) ফ্রান্সের রাজা হইলেন।

এদিকে নেপোলিয়ন স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের অধিপতি হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি অকস্মাৎ এল্‌বা পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে উপস্থিত হইলেন। জনসাধারণ এবং সৈন্যগণ সানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। দেশবাসীর সমর্থনে বলীয়ান হইয়া তিনি প্যারিসে প্রবেশ করিলেন; অষ্টাদশ লুই বেলজিয়মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিজয়ী শক্তিবর্গ নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন মানিয়া লইল না। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ওয়াটার্লুর (Waterloo) যুদ্ধে তিনি ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর নায়ক ছিলেন ওয়েলিংটন, প্রাশিয়ার বাহিনীর নায়ক ছিলেন ব্লুকার (Blucher)। উপায়ান্তর না দেখিয়া নেপোলিয়ন দ্বিতীয় বার ফ্রান্সের সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন (জুলাই, ১৮১৫)। জীবনের বাকী কয়েক বৎসর (১৮১৫-১৮২১) তিনি ইংরেজদের বন্দী রূপে সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বাস করেন।

নেপোলিয়নের শেষ পরাজয় ও নির্বাসন

নেপোলিয়নের পতনের কারণ: সেণ্ট হেলেনায় বাসকালে নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পতনের কারণ তিনটি—স্পেন, পোপ এবং রাশিয়া। স্পেনে ও পর্তুগালে উপদ্বীপের যুদ্ধে (Peninsular War) এবং রাশিয়া অভিযানে তাঁহার সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং সামরিক খ্যাতি ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই পরিণতি জার্মানীর মুক্তি সংগ্রাম (War of Liberation)। আর পোপের সহিত বিরোধের ফলে তিনি ক্যাথলিকপ্রধান ফ্রান্সে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি অনেক পরিমাণে হারাইয়াছিলেন। সুতরাং নেপোলিয়নের মন্তব্য ঐতিহাসিকের বিচারে অগ্রাহ্য নহে। স্পেন-পর্তুগালে এবং রাশিয়ায় তাঁহার শক্তিক্ষয় না হইলে অকালে তাঁহার পতন ঘটিত কিনা সন্দেহ। স্পেনের প্রতিরোধকে নেপোলিয়ন 'দুষ্টক্ষত' (Spanish Ulcer) রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নের পতনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ

ইংলণ্ডের সহিত তাঁহার বিরোধ। তিনি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বারবার সন্ধি করিলেও ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করেন নাই—অ্যামিয়েন্সের সন্ধি কার্যতঃ সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। এই বিরোধের ফলেই তিনি ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া উপদ্বীপের যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। পোপ এবং রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের বিরোধও প্রধানতঃ ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের অপরাজেয় নৌ-শক্তির সহিত প্রতিদ্বিন্দ্বিতায় নেপোলিয়ন জয়লাভ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ ইংলণ্ডের শক্তিহ্রাসের প্রয়াস তাঁহাকে উপদ্বীপের যুদ্ধে এবং রাশিয়া আক্রমণে টানিয়া নিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের প্রতি অতিরিক্ত বিরাগ বশতঃই তিনি নিজের পতনের কারণগুলির মধ্যে ইংলণ্ডের অবিরাম শত্রুতা ও নৌ-বলের উল্লেখ করেন নাই।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি ছিল না। জার্মানীতে এবং স্পেনে নেপোলিয়নের নীতি স্পষ্টতঃ জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ছিল। ফ্রান্সের আধিপত্য অন্যান্য দেশের মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সুতরাং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের প্রতি লোকের আনুগত্য ছিল না, ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। সামরিক শক্তি দ্বারা সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক শক্তিই ছিল তাহার ভিত্তি। সেই শক্তি যখন ক্ষুণ্ণ হইল তখন সাম্রাজ্যের পতনও অনিবার্য হইল।

অসামান্য প্রতিভাশালী সমর-নায়ক ও শাসক হইলেও নেপোলিয়ন রাজনীতি ও সমরনীতিতে সকল ক্ষেত্রে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার সীমাহীন আত্মপ্রত্যয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে ভুল পথে লইয়া গিয়াছিল। সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার শক্তি ফ্রান্সের নাই—এই সহজ সত্যটি তিনি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার যুদ্ধের রসদ জোগাইয়া ফ্রান্স রক্তহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বিপ্লবের প্রথম অবস্থা হইতে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া ফ্রান্স রণক্লান্ত ও শান্তিকামী হইয়াছিল। মস্কো অভিযানের পরে নেপোলিয়নের রণনীতি পূর্ববৎ জনসমর্থন লাভ করে নাই। নেপোলিয়নের জীবনী হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে বিপ্লবের যুগে কেবলমাত্র সামরিক শক্তি দ্বারা স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠন করা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্পবিপ্লব

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল। এতদিন ইংলণ্ড ছিল কৃষিপ্রধান দেশ, উৎপাদন প্রণালীতে যন্ত্র অপেক্ষা মানুষের শ্রমের গুরুত্ব ছিল বেশী। কিন্তু তৃতীয় জর্জের রাজত্বের (১৭৬০-১৮২০) প্রথমার্ধে কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

উৎপাদনে যন্ত্রের প্রাধান্য সুরু হইল। কে (Key), হারগ্রীভস্ (Hargreaves), ক্রম্পটন (Crompton) ও কার্টরাইট (Cartwright) অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে বেশী সূতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। আর্করাইট (Arkwright) সূতা বুনিবার জন্য একটি নূতন যন্ত্র (power loom) আবিষ্কার করিলেন। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প লোকের পরিশ্রমে অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে সূতা কাটিবার এবং বস্ত্র উৎপাদনের সুবিধা হইল। ফলে বয়ন শিল্পে বিরাট পরিবর্তন আরম্ভ হইল। খনি হইতে কয়লা তুলিবার প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নত ধরণের এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। নিরাপদ বাতি (Safety Lamp) ব্যবহারের ফলে কয়লার খনিতে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম বিপজ্জনক হইল। লোহা গলাইবার জন্য একপ্রকার বিশেষ ধরণের চুল্লী (Blast furnace) আবিষ্কৃত হইলে লৌহ শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডে লৌহযুগের সূচনা হইল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম লৌহ দ্বারা জাহাজ নির্মাণ করা হইল। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল জেমস্ ওয়াট (James Watt) কর্তৃক বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কার। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রস্তুত হইল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রবর্তনের ফলে যানবাহনের প্রাচীন রূপ

আবিষ্কারের ফল

বদলাইয়া গেল। রেলগাড়ীর প্রচলন হইল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয় পোত (steamer) নির্মিত হইল। ক্রমশঃ নূতন শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং খাল

খনন করা হইল। কল-কারখানায় কাজের সন্ধানে পল্লী অঞ্চল হইতে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে লোক সমাগমের ফলে নূতন শহর গড়িয়া উঠিল। সমগ্র দেশের চেহারা বদলাইয়া গেল। উৎপাদন প্রণালীতে এই বিরাট বিপ্লবকে শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) বলা হয়।

এই বিপ্লব এখনও চলিতেছে। বাষ্পীয় শক্তির সহিত বর্তমানে বৈদ্যুতিক শক্তির সংযোগ ঘটিয়াছে। বহু সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রাধান্য বাড়িতেছে এবং পরিবহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইতেছে।

শিল্পবিপ্লবের কারণঃ এই শিল্পবিপ্লব আকস্মিক ঘটনা নহে, কয়েকটি ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক কারণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রথমতঃ,

শিল্পবিপ্লবের মৌলিক কারণ

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রসারের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে ইউরোপের বাণিজ্য বিস্তারলাভ করে এবং ইউরোপে উৎপন্ন দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ফলে ইউরোপের পক্ষে পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়া পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন প্রয়োজন। সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রচুর লাভের ফলে বণিক শ্রেণীর হস্তে সেই মূলধন সঞ্চিত হইয়াছিল এবং সঞ্চিত মূলধনের সদ্ব্যবহার করিয়া অধিকতর অর্থলাভের আশায় তাহারা পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চার প্রচলন শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির আবিষ্কারে সহায়ক হইয়াছিল। শিল্পক্ষেত্রে বাষ্পের ব্যবহার বিজ্ঞানানুশীলন ব্যতীত সম্ভব হইত না।

কয়েকটি বিশেষ কারণে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয়, পরে ইহা ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রসারিত হয়। প্রথমতঃ, অন্যান্য দেশের বণিকগণের

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের কারণ

তুলনায় ইংলণ্ডের বণিকেরা বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিত। রাষ্ট্র তাহাদের কাজে বিশেষ হস্তক্ষেপ করিত না। ফ্রান্সে বাণিজ্য ও পণ্যোৎপাদন সম্বন্ধে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রবল ছিল। ফলে ফরাসী বণিকেরা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে সঞ্চিত মূলধন প্রধানতঃ বাণিজ্যবিস্তারে নিয়োজিত হইত, ফ্রান্সে সঞ্চিত মূলধনের এক বৃহৎ অংশ

যুদ্ধোপকরণ ও বিলাসদ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হইত। তৃতীয়তঃ, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পে অতি সহজে যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায়। এই সকল শিল্পে ইংলণ্ড পূর্বাবধি অপেক্ষাকৃত বেশী উন্নত ছিল।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফল ঃ শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের প্রাচীন উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হইল, ইংলণ্ডে যন্ত্রযুগের আরম্ভ হইল। যান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর সুবিধা এই যে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে যন্ত্রের সাহায্যে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। সুতরাং ইংলণ্ডে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইতে লাগিল। ইংলণ্ড সমগ্র পৃথিবীর কারখানা (workshop of the world) হইল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা ইংলণ্ডের শিল্পকে স্ফীত করিয়া তুলিল। ইংলণ্ড যে নেপোলিয়নের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিল তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের আর্থিক শক্তি বিনষ্ট করিতে পারিলেন না, তাঁহার Continental System ব্যর্থ হইল। এই ব্যর্থতা অনেকটা ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। উন্নত উৎপাদন প্রণালীর সুবিধা পাইয়া ইংলণ্ড ইউরোপে বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হইল। তাই নেপোলিয়ন যখন ইউরোপে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন তখন কেবলমাত্র ইংলণ্ডের শিল্পের ক্ষতি হইল না, ইংলণ্ডজাত দ্রব্য না পাইয়া ইউরোপের অধিবাসিগণের অসুবিধা হইল। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড শিল্পবিপ্লবের ফলে যে সমৃদ্ধি লাভ করিল তাহার ফলে ইউরোপে মিত্রশক্তিসমূহকে অর্থসাহায্য করা সম্ভব হইল। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের প্রসার

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গভীর পরিবর্তন হইল। ইংরেজ জাতির সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল। যান্ত্রিক উৎপাদনের সুবিধার জন্য ফ্যাক্টরী প্রথার (Factory system) সৃষ্টি হইল। শ্রমিকেরা কাজের সন্ধানে গ্রামাঞ্চল হইতে নবস্থাপিত ফ্যাক্টরী অঞ্চলে আসিতে লাগিল। ফলে ফ্যাক্টরীগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বড় বড় শহর গড়িয়া উঠিল। লিভারপুল, ম্যান্‌চেস্টার প্রভৃতি বড় বড় শহর শিল্পবিপ্লবের সৃষ্টি। দ্রব্যাদি প্রেরণের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ও খাল খনন করা হইল। রেলগাড়ীর ও বাষ্পীয় পোতের প্রচলন হইল। ইংলণ্ডের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের

অর্থনৈতিক ফল

কাছাকাছি আসিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগাযোগ বাড়িয়া গেল।

সামাজিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের ফলে এক আলোড়নের সৃষ্টি হইল। এতদিন ইংলণ্ড ছিল কৃষিপ্রধান দেশ, জমির সহিত দেশের অধিকাংশ লোকের সংযোগ ছিল; কিন্তু শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে শিল্পের প্রাধান্য স্থাপন করিল। কৃষিকার্যের গুরুত্ব কমিয়া গেল। যাহারা এতদিন চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত তাহাদের মধ্যে অনেকে চাষ ছাড়িয়া শহরে আসিয়া ফ্যাক্টরীতে মজুরের কাজ করিতে লাগিল। জমির সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইল। কুটির শিল্পের অবনতি হইল, কারণ কুটির শিল্প যান্ত্রিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিত না। যাহারা কুটির শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত তাহারাও ক্রমে মজুরের কাজ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। এতদিন তাহারা যে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত তাহা লুপ্ত হইল।

সামাজিক পরিবর্তন

জমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহারা গ্রাম হইতে শহরে আসিল তাহারা সকলেই যে ফ্যাক্টরীতে কাজ পাইল তাহা নহে। যান্ত্রিক উৎপাদনে মানুষের শ্রম বেশী দরকার হয় না, তাই বেকার সমস্যা দেখা দিল। যাহারা কাজ পাইল তাহাদেরও প্রথম দিকে খুবই দুরবস্থা হইল। তাহাদিগকে অধিক সময় পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তাহারা অতি সামান্য মজুরী পাইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো (Ricardo) প্রচার করিলেন যে মজুরের ভরণপোষণের জন্য যেটুকু অবশ্য প্রয়োজনীয় শুধু সেইটুকুই মজুরের প্রাপ্য হওয়া উচিত। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সমাপ্তির পর ইউরোপে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় ইংলণ্ডে শিল্পপতিরা উৎপাদন কমাইয়া শ্রমিক ছাঁটাই করিলেন এবং মজুরীর হার কমাইয়া দিলেন। তখন মজুরদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পাইল এবং তাহারা অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন করিতে লাগিল। শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে একদিকে মজুরদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পাইল, অপরদিকে মালিক শ্রেণী প্রচুর অর্থলাভ করিল। এইভাবে সমাজে ধনী দরিদ্র, মালিক মজুরের প্রভেদ বিস্তৃত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলী (Disraeli) একখানা উপন্যাসে লিখিলেন যে ইংলণ্ডে প্রকৃতপক্ষে দুইটি জাতি আছে—ধনী জাতি ও দরিদ্র জাতি।

মজুর শ্রেণীর দুরবস্থা

এই সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত হইল। প্রথমেই সমস্যা হইল কমন্স সভার (House of Commons) গঠন-পদ্ধতির পরিবর্তন। শিল্পবিপ্লবের ফলে পুরাতন নির্বাচন-ব্যবস্থার সংস্কার অবশ্যম্ভাবী হইল এবং ১৮৩২ সালে প্রথম সংস্কার আইন (First Reform Act) বিধিবদ্ধ হইল। কিন্তু এই আইন শ্রমিকদিগকে ভোটদানের অধিকার দিল না; রাজনৈতিক ক্ষমতা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর করায়ত্ত হইল। শ্রমিকেরা এই ব্যবস্থা মানিয়া লইল না। তাহাদের আন্দোলনের ফলে এবং অন্যান্য কারণে ১৮৬৭ এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুইটি আইন (Second and Third Reform Acts) বিধিবদ্ধ করিয়া শহরের ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হইল। ইংলণ্ডে প্রকৃত গণতন্ত্রের সূত্রপাত হইল। দ্বিতীয়তঃ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মালিক ও মজুরের দ্বন্দ্ব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন হইল। একদিকে ওয়েন (Robert Owen), ও'কোনর প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে মজুরগণ রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অপর দিকে সরকার ক্রমশঃ নানাবিধ আইন করিয়া মালিকের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে ও মজুরদের দুরবস্থা লাঘব করিতে বাধ্য হইল। অর্থনৈতিক জীবনে মালিক ও মজুরের দ্বন্দ্ব চিন্তাজগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করিল। সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ও সাম্যবাদের (Communism) জন্ম হইল। কিন্তু ইংলণ্ডে সাম্যবাদ কখনও জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমাজতন্ত্রবাদী শ্রমিক দলের (Labour Party) উৎপত্তি হয়। বিংশ শতাব্দীতে এই দল মন্ত্রিত্ব লাভ করে। তৃতীয়তঃ, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংলণ্ডে কৃষিস্বার্থের সহিত শিল্পস্বার্থের সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী পীল (Sir Robert Peel) শস্যকর রহিত করিয়া শিল্পস্বার্থকে জয়যুক্ত করিলেন। ইংলণ্ডে ক্রমশঃ অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free Trade) প্রবর্তিত হইল। ইহার প্রভাব বৈদেশিক নীতিতেও দেখা গেল।

রাজনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন

শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক যুগের অবসান ও অপর যুগের আরম্ভ সূচনা করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ সমস্যার রূপ শিল্প-বিপ্লব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইল। শিল্পবিপ্লব শুধু ইংলণ্ডের ইতিহাসের ঘটনা নহে; ইহা ক্রমশঃ সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া দিয়াছে। শিল্পযুগে মানুষের সভ্যতা নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। ইংলণ্ডেই

যে শিল্পবিপ্লবের উৎপত্তি ইহা ইংরেজ জাতির পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পবিপ্লবঃ ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হইতে না হইতেই ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং প্রায় ২৫ বৎসর আভ্যন্তরীণ অশান্তি এবং বৈদেশিক যুদ্ধের ফলে শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি ফ্রান্সে প্রচলিত হয়। নেপোলিয়ন বয়নশিল্পে যন্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন, কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন এবং শিল্পপতিগণকে সরকারী আর্থিক সাহায্য দিয়া তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন। তথাপি নেপোলিয়নের পতনকাল পর্যন্ত ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। ফ্রান্সে কয়লার অভাব ইহার অন্যতম কারণ। লুই ফিলিপের রাজত্বকালে (১৮৩০-১৮৪৮) ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লবের যথেষ্ট প্রসার ঘটে এবং একটি বৃহৎ ও প্রভাবশীল শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে ইউরোপে ইংলণ্ডের পরেই ছিল ফ্রান্সের স্থান। তৃতীয় নেপোলিয়ন বাণিজ্যের উৎসাহদাতা ছিলেন।

ফ্রান্স

বহু রাজ্যে বিভক্ত জার্মানীতে স্বভাবতঃই শিল্পবিপ্লবের গতি অতি মন্থর ছিল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একমাত্র প্রাশিয়া ব্যতীত জার্মানীর অন্য কোন দেশে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার তেমন প্রচলিত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক ঐক্য লাভের ফলে এবং অন্যান্য কারণে জার্মানীতে শিল্প-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে বাণিজ্যসঙ্ঘ (Zollverein) গঠনে শিল্পোন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। জার্মান সাম্রাজ্য গঠনের পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার্মানী ফ্রান্সকে অতিক্রম করিয়া বিশ্ববাণিজ্যে ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। বাণিজ্যক্ষেত্রে ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ।

জার্মানী

পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্স ও জার্মানী ছাড়া কেবলমাত্র বেলজিয়মে শিল্পবিপ্লবের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফল ঃ ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলাফল পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শিল্পবিপ্লবের ফলাফল অনেকাংশে ইংলণ্ডের মতই হইয়াছিল। সকল দেশেই শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং তাহারা ক্রমশঃ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানাবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি উপস্থিত করে। তাহাদের দাবি সমর্থন করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) এবং সাম্যবাদের (Communism) উৎপত্তি হয়। এই দুইটি নূতন মতবাদের কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স ও জার্মানী। পরে সাম্যবাদ রাশিয়ায় প্রসারিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক লুই ব্ল্যাঙ্ক (Louis Blanc) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য কাজের দাবি ("right to work") উত্থাপন করেন। ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র (Second Republic) স্থাপিত হইলে এই নীতি কিছুদিনের জন্য সরকারী ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে ইহা স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। জার্মানীতে ঐক্য স্থাপনের পর সমাজতন্ত্রবাদী দল প্রবল হইয়া উঠে। বিসমার্ক কঠোর হস্তে এই দলের আন্দোলন দমন করেন, কিন্তু তিনি শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই সকল ব্যবস্থা "রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রবাদ" (State Socialism) নামে পরিচিত। শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সকল দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

(১) সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ

শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল ইউরোপে এবং প্রায় দেড়শত বৎসর কাল ইহা ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইহার প্রভাব নানা ভাবে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপের যে সকল দেশে শিল্পবিপ্লবের ফলে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইল তাহারা পণ্য বিক্রয়ের জন্য ইউরোপের বাহিরে নূতন বাজার খুঁজিতে লাগিল। ইহার প্রত্যক্ষ ফল এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় দেশসমূহের সাম্রাজ্য বিস্তার। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিলে ঐ সকল দেশে শাসক জাতি স্বদেশে উৎপন্ন পণ্য সহজে বিক্রয়ের সুযোগ পাইত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে ইস্ট ইণ্ডিয়া

(২) সাম্রাজ্য বিস্তার

কোম্পানার কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ করিয়া ভারতের বাজারে ইংলণ্ডজাত বস্ত্রাদি বিক্রয়ের পথ সুগম করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প ও বাণিজ্য ভারতের অর্থনীতিতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ একান্তভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশে পরিণত হয়। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব না ঘটিলে এবং ইংরেজের শাসনযন্ত্র ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হইলে এদেশে এই বিরাট পরিবর্তন ঘটিত না।

(৩) অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ

এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল দেশে ভারতবর্ষের মত প্রত্যক্ষভাবে কোন ইউরোপীয় দেশের রাজত্ব স্থাপিত হয় নাই সেই সকল দেশেও শিল্পবিপ্লবের ফলে পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইউরোপীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনদেশের উল্লেখ করা যায়। এই দেশে পুরাতন মাঞ্চু রাজবংশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও ইহার বৈদেশিক বাণিজ্য পাশ্চাত্ত্য জাতিদের হস্তগত হইয়াছিল। যে জাতি রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন তাহার অর্থনৈতিক জীবনের উপর বৈদেশিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে "অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ" (Economic Imperialism) বলা যায়। পারস্যদেশের তৈলসম্পদের উপর ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব এইরূপ সাম্রাজ্যবাদের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য স্থাপনের কারণ ও ফল

এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য স্থাপনের অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল সস্তায় কাঁচামাল (raw materials) সংগ্রহ। ইউরোপের কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট কাঁচামালের চাহিদা ছিল। এশিয়া ও আফ্রিকায় কলকারখানা না থাকায় কাঁচামাল সস্তাদরে পাওয়া যাইত। তাই এই দুই মহাদেশ হইতে ইউরোপীয় শিল্পের জন্য উপাদান সংগ্রহ করা হইত। সস্তায় কাঁচামাল কিনিয়া ইউরোপীয় শিল্পপতিরা ইউরোপের কলকারখানায় যে সকল পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিত তাহাই চালান হইয়া এশিয়া ও আফ্রিকায় আসিয়া চড়া দামে বিক্রয় হইত। ফলে ইউরোপীয় দেশগুলিতে মোটা মুনাফা সঞ্চিত হইত। বাঙ্গালা দেশের পাট চাষীদের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া ইংরেজ বণিকেরা ব্রিটেনে চালান দিত। সেখানে কলে পাট হইতে চট প্রস্তুত হইত, পরে তাহা পৃথিবীর নানাদেশে চালান দেওয়া হইত। ভারত ও মিশর হইতে

তূলা ইংলণ্ডে যাইত। সেখানে কলে তূলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, সেই বস্ত্র ভারত ও অন্যান্য দেশের লোক চড়া দামে কিনিত।

এইভাবে ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিনষ্ট বা বিপন্ন হইয়াছিল, কোটি কোটি মানুষ দীর্ঘকাল ইউরোপীয়দের দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হইয়া দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। ইউরোপীয়দের অবাধ কর্তৃত্বের ফলে এই দুই মহাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব ঘটে নাই, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইতে পারে নাই।

কিন্তু শিল্পবিপ্লবের কুফল কেবলমাত্র এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে ভোগ করিতে হয় নাই। নূতন বাজার ও নূতন কাঁচামালের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতার্ণ হইয়া ইউরোপীয় জাতিগুলি নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়াছিল এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সহিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও আফ্রিকায় ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আফ্রিকায় ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কঠিন আন্তর্জাতিক সমস্যা অনেকাংশে শিল্পবিপ্লবের পরোক্ষ ফল। আফ্রিকার খণ্ডীকরণ (Partition of Africa) বিনাযুদ্ধে সম্পন্ন হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকা আন্তর্জাতিক রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা বুঝিতে হইলে শিল্পবিপ্লবকে অন্যতম মূলসূত্র রূপে গণ্য করিতে হইবে।

(৪) আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

চতুর্থ অধ্যায়

ইউরোপের পুনর্গঠন (১৮১৫-১৮৪৮)

নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের পুনর্গঠন : ভিয়েনা কংগ্রেস : ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর প্যারিসের সন্ধি (মে, ১৮১৪) দ্বারা বিজয়ী শক্তিবর্গ ফ্রান্সের সহিত শান্তি স্থাপন করে। ফ্রান্সে বুর্বোঁ রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা বুর্বোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইর অধিকারভুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। অতঃপর ইউরোপের অন্যান্য দেশে কি কি রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন তাহা নির্ধারণের জন্য অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের এক বৈঠক (Congress) বসে। নেপোলিয়ন এল্বা দ্বীপ হইতে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলে কংগ্রেসের কার্য কিছুদিন স্থগিত থাকে। ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর কংগ্রেস যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনের সমস্যা আলোচনা করে। রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডার, অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস, প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম এবং ডেনমার্ক, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশের রাজা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অস্ট্রিয়ার মেটারনিক (Metternich), ইংলণ্ডের ক্যাসল্রি (Castlereagh) এবং ফ্রান্সের ট্যালির‍্যাণ্ড (Talleyrand)। মেটারনিক সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল (১৮০৯-১৮৪৮) অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ভিয়েনা বৈঠকে এবং তাহার পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য প্রভাব ছিল। যে শক্তিবর্গের চেষ্টায় নেপোলিয়নের পতন ঘটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ইংলণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া ছিল প্রধান। সুতরাং এই চারি শক্তির প্রতিনিধিগণই ভিয়েনা কংগ্রেসের কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন।

ভিয়েনা কংগ্রেস

দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনার ফলে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভিয়েনা বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি এক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র রূপে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি কয়েকটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমতঃ, ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যে দেশে যে রাজবংশ রাজত্ব করিত তাহা সেই দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে

হইবে ; বিপ্লবের ফলে বা নেপোলিয়নের আমলে যদি কোন পরিবর্তন হইয়া থাকে তবে তাহা স্বীকার করা হইবে না। এই নীতির নাম 'ন্যায্য অধিকার নীতি' (principle of legitimacy)। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্স, স্পেন এবং নেপলসে বুর্‌বোঁ বংশ, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ (Orange) বংশ এবং পীডমণ্টে (Piedmont) স্যাভয় (Savoy) বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল; পোপ এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট ইটালীতে স্ব স্ব অধিকার ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়মের সংযোগ এবং সুইডেনের সহিত নরওয়ের সংযোগ—এই দুইটি ক্ষেত্রে উক্ত রীতি অনুসরণ করা হইল না।

ভিয়েনা সন্ধির মূলনীতি

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল রাজ্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তাহারা জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ নূতন রাজ্যখণ্ড লাভ করিল। ইহার নাম ক্ষতিপূরণ নীতি বা পুরস্কার নীতি (principle of compensation or reward)। ইংলণ্ড লাভ করিল ফ্রান্স ও স্পেনের অধীন কয়েকটি ঔপনিবেশিক বাণিজ্যকেন্দ্র এবং হল্যাণ্ড হইতে বিজিত সিংহল দ্বীপ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংলণ্ড ইউরোপে নূতন রাজ্যখণ্ড চাহে নাই, কারণ ইংলণ্ডের প্রকৃত স্বার্থ ছিল বাণিজ্যবিস্তার এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার। ভিয়েনা সন্ধির ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইংলণ্ড পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইল। সিংহল ও দক্ষিণ আফ্রিকা হারাইবার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হল্যাণ্ড পাইল অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন নেদারল্যাণ্ডস্ (বেলজিয়ম)। আবার অস্ট্রিয়ার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উত্তর ইটালীতে মিলান প্রদেশ অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হইল এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাটের আত্মীয়দিগকে মধ্য ইটালীর কয়েকটি রাজ্যখণ্ডে (Tuscany, Parma, Modena) স্থাপন করা হইল। ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার অধিকারভুক্ত রহিল, পরিবর্তে সুইডেন পাইল সমগ্র নরওয়ে। প্রাশিয়া জার্মানীর অন্তর্গত কয়েকটি বৃহৎ রাজ্যখণ্ড (পোমারেনিয়া ও ওয়েস্টফেলিয়া এবং স্যাক্সনী ও রাইনল্যাণ্ডের অধিকাংশ) লাভ করিল। হল্যাণ্ড এবং প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের দুই দিকে দুইটি সতর্ক প্রহরী স্থাপন করা—যেন ভবিষ্যতে ফ্রান্স আবার প্রবল হইয়া ইউরোপের শান্তি নষ্ট করিতে না পারে। নেপোলিয়নের শাসন-ক্ষমতা লাভের পূর্বে ফ্রান্সের যে সীমা ছিল তাহা মানিয়া লওয়া হইল, অর্থাৎ ফ্রান্স নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের ফলভোগ হইতে বঞ্চিত হইল।

রাজ্য বণ্টন

তৃতীয়তঃ, ন্যায্য অধিকার নীতি এবং ক্ষতিপূরণ নীতি প্রয়োগকালে বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে যাহাতে শক্তিসাম্য (balance of power) বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন শক্তিশালী রাজ্য যাহাতে উহার সমকক্ষ অন্যান্য রাজ্য হইতে বেশী শক্তিশালী হইয়া তাহাদের স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শক্তিসাম্য

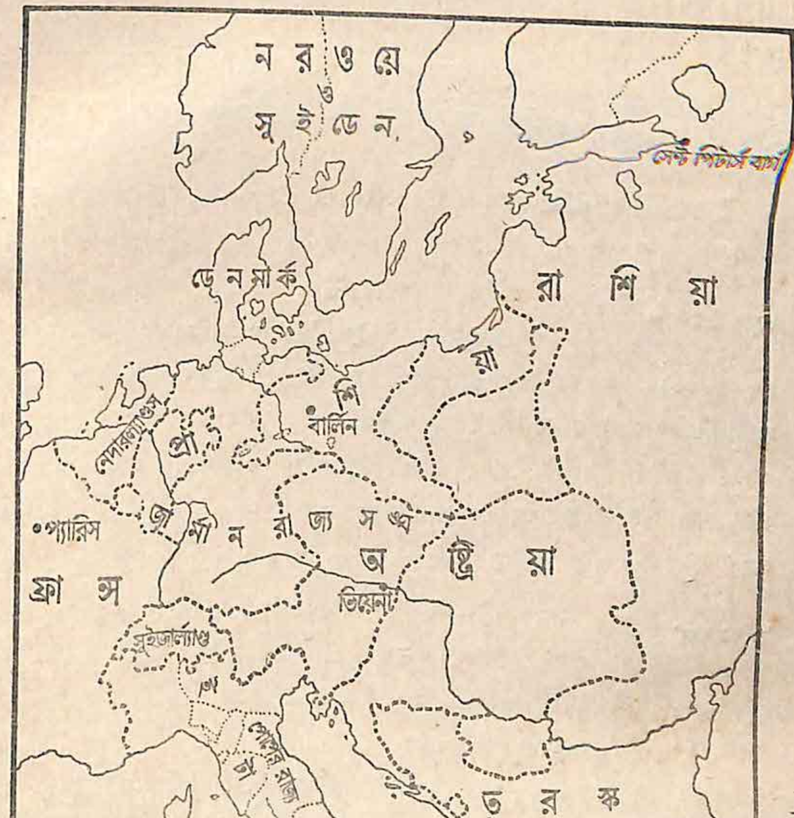
এই সকল পরিবর্তনের ফলে ইউরোপ পুনর্গঠিত হইল, সমগ্র মহাদেশের মানচিত্র নূতনভাবে অঙ্কিত হইল। কিন্তু যে সকল রাজা ও মন্ত্রী এইভাবে ইউরোপকে নূতন রূপ দিলেন তাঁহারা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিন্দুমাত্র মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফরাসী বিপ্লবের ফলে পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র জাতীয় ভাব উদ্বোধিত হইয়াছিল—যাহারা একই দেশে বাস করে, একই ভাষায় কথা বলে, তাহারা একই রাষ্ট্রের শাসনাধীন থাকিবে, এই ধারণা ক্রমশঃ প্রবল হইতেছিল। কিন্তু ইউরোপের নূতন মানচিত্র এই নীতি অনুসারে অঙ্কিত হয় নাই। বিভিন্ন ভাষাভাষী হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম এক সঙ্গে যুক্ত হইল; নরওয়ে ও সুইডেন ভাষা এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের পার্থক্য সত্ত্বেও সম্মিলিত হইল। আবার এক ভাষাভাষী জার্মানী ও ইটালীর রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলি ঐক্যবদ্ধ না হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত রহিল। পোল্যাণ্ডের জাতীয় অস্তিত্ব পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল; এই দেশটির বিভিন্ন অংশ রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার অধীন রহিল। পোল্যাণ্ডের মত বেলজিয়ম, নরওয়ে এবং ইটালী কার্যতঃ পরাধীন হইল।

ভিয়েনা সন্ধির ত্রুটি

ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাম্য (Equality) ও গণতন্ত্রের (Democracy) যে নূতন আদর্শ ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও ভিয়েনা বৈঠকে স্বীকৃতি পাইল না। সকল দেশেই বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা এবং স্বৈরাচারমূলক শাসন-পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করা হইল। জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইল। মেটারনিক বিপ্লবের পুনরাবির্ভাবের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন। ইউরোপের যে কোন দেশে বিপ্লব আরম্ভ হইলে তাহা সংক্রামক ব্যাধির মত অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়িবে এবং সমগ্র মহাদেশের শান্তি বিনষ্ট করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। ভিয়েনা বৈঠকের অন্যান্য নায়কগণও সাধারণভাবে এই ধারণা পোষণ করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর

বিপ্লব রোধের চেষ্টা

শেষভাগে দেখা গেল, ইউরোপের ইতিহাস ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয় নাই, বিপ্লব ও যুদ্ধের ফলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ জয়লাভ করিয়াছে। ভিয়েনা সন্ধির সর্ত বাতিল করিয়া বেলজিয়ম হল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন



হইল, ফ্রান্স হইতে বুর্বোঁ রাজবংশ বিতাড়িত হইল, ইটালীতে ও জার্মানীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

তথাপি ভিয়েনা সন্ধির সমালোচকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে (১৭৯৩-১৮১৫) ইউরোপ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং শান্তিস্থাপনই ছিল সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ইউরোপের পুনর্গঠন কার্যে অগ্রসর হইলে বহু নূতন বাধার সৃষ্টি হইত, স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। ভবিষ্যতে নূতন পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে অবসর প্রয়োজন তাহাই ইউরোপ ভিয়েনা সন্ধি হইতে পাইয়াছিল।

ভিয়েনা সন্ধির পক্ষে যুক্তি

ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ (Concert of Europe): যাহাতে বৃহৎ শক্তিগুলি সম্মিলিত ভাবে বিপ্লবের প্রতিরোধ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ভিয়েনা বৈঠকের শেষে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং ইংলণ্ড এক সন্ধি (Quadruple Alliance)-সূত্রে আবদ্ধ হয় (১৮১৫)। ভিয়েনা সন্ধির সর্ত অনুসারে ইউরোপের নূতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করাই চতুঃশক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপের প্রধান চারিটি শক্তির এই যৌথ সংগঠন 'ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ' নামে পরিচিত। পরে ফ্রান্স এই শক্তিসঙ্ঘে যোগদান করে। ইহা ছাড়া এই সময়েই রাশিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডার প্রাশিয়ার রাজা এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'পবিত্র সঙ্ঘ' (Holy Alliance) গঠন করেন। রাজগণ ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা অনুসারে প্রজাদের মঙ্গলার্থে রাজ্যশাসন করিবেন, ইহাই ছিল 'পবিত্র সঙ্ঘের' প্রতিশ্রুতি।

চতুঃশক্তির সন্ধি

'পবিত্র সঙ্ঘ'

প্রকৃতপক্ষে চতুঃশক্তির সন্ধি এবং 'পবিত্র সঙ্ঘ' উভয়ই ছিল জনগণের বৈপ্লবিক দাবি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণের সংগঠন। এই সংগঠনের প্রকৃত নায়ক ছিলেন মেটারনিক। ইউরোপের কোন দেশে যাহাতে বিপ্লব ঘটিতে না পারে, প্রাচীন রাজবংশসমূহের অধীনে স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করাই মেটারনিকের মূল নীতি ছিল।

মেটারনিকের প্রচেষ্টা এবং সম্মিলিত রাজশক্তির সতর্কতা সত্ত্বেও ইউরোপে বিপ্লবের গতি রুদ্ধ হইল না। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নেপলসে অত্যাচারী বুর্বোঁ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইল। পর বৎসর পীডমণ্টে বিদ্রোহ দেখা দিল। উভয় ক্ষেত্রেই মেটারনিক অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া অত্যাচারী রাজগণকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিলেন।

নানা দেশে বিপ্লব

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে বিপ্লব ঘটিল। তিন বৎসর পরে ফ্রান্সের সৈন্যদল স্পেনে স্বৈরাচারী বুর্‌বোঁ রাজার ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল।

বিপ্লব দমন সম্বন্ধে মেটারনিকের প্রধান সমর্থক ছিলেন রাশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার। ইংলণ্ডের মন্ত্রী ক্যাসলরি তাঁহাকে মোটামুটি সমর্থন করিতেন। কিন্তু ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং (Canning) ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইলে মেটারনিক ইংলণ্ডের সমর্থন হারাইলেন। ১৮১৮-২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারিবার বিভিন্ন স্থানে চতুঃশক্তির বৈঠক (Congress of Aix-la-Chapelle, Troppau, Laibach, Verona) বসিয়াছিল। এই সকল বৈঠকে মেটারনিকের বিপ্লবদমন নীতি সমর্থিত হয়।

ইতিমধ্যে স্পেনের অধীন দক্ষিণ আমেরিকায় বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। স্পেনে স্বৈরাচারী বুর্‌বোঁ রাজার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের (১৮২৩) পর মেটারনিক দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রী ক্যানিং এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মনরো (President Monroe) ইহাতে বাধা দিলেন। মেটারনিক এই বাধা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। এই ব্যর্থতার ফলে ইউরোপীয় শক্তিসজ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল।

শক্তিসজ্ঘের ব্যর্থতা

ইউরোপীয় শক্তিসজ্ঘের ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ কারণ ইংলণ্ডের অসহযোগিতা— ক্যানিঙের আমলে ইংলণ্ড ইউরোপে স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার সক্রিয় সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিল না। দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি মনরোর নীতি (Monroe Doctrine) প্রত্যক্ষভাবে শক্তিসজ্ঘের বিরোধী ছিল। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে যে বিপ্লবের বন্যা বহিতেছিল কেবলমাত্র কূটনীতি ও সামরিক বলের প্রয়োগে তাহার গতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব (Revolution of 1830): ইউরোপীয় শক্তিসজ্ঘ ইটালীতে এবং স্পেনে যে বিপ্লব দমন করে তাহা ঐ দুইটি দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিপ্লব ঘটিল তাহা আন্তর্জাতিক বিপ্লবে পরিণত হইল।

নেপোলিয়নের পতনের পর বুর্‌বোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুই বিজয়ী শক্তিবর্গের সাহায্যে ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করেন (১৮১৪)। তাঁহার রাজত্বকালে ফ্রান্সে উদারনৈতিক দল এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ

হইল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপোষ মীমাংসার পক্ষপাতী হইলেও প্রতিক্রিয়াশীল দলকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বয়ং প্রতিক্রিয়াশীল দলের উগ্র সমর্থক ছিলেন। ফলে তিনি জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। জাতীয় সভা (Chamber of Deputies) প্রতিক্রিয়াশীল প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে রাজা ঐ সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। নবনির্বাচিত সভাতেও উদারনৈতিক দলের সংখ্যাধিক্য রহিল। তখন রাজা এই সভাও ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং বহু ভোটদাতার ভোটাধিকার কাড়িয়া লইলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে বিপ্লব (July Revolution) ঘটিল।

ফ্রান্সে 'জুলাই বিপ্লব

সৌভাগ্যক্রমে এই বিপ্লব কঠোর ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করিল না, রাজবংশের পরিবর্তনে এবং শাসননীতির সংস্কার সাধনে ইহা সীমাবদ্ধ রহিল। দশম চার্লস সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, বুর্বোঁ রাজবংশের এক শাখার বংশধর লুই ফিলিপ (Louis Philippe) উদারনৈতিক দলের সাহায্যে এবং জনমতের সমর্থনে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার (Divine Right) বলে সিংহাসন লাভ করেন, এই প্রাচীন ধারণার অবসান হইল। জনগণের মনোনীত ব্যক্তি রাজত্ব লাভ করিবেন, এই বৈপ্লবিক নীতি বিপ্লবের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্সে উদারনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তির সূত্রপাত হইল।

'জুলাই বিপ্লবে'র ফল

'জুলাই বিপ্লবে'র প্রভাব বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হইল। ভিয়েনা সন্ধির সর্তানুযায়ী হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের সম্মিলন বেলজিয়মবাসীদের মনঃপূত হয় নাই। দুই দেশের মধ্যে ভাষা, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্য ছিল। হল্যাণ্ডরাজের শাসননীতি বেলজিয়মের স্বার্থ ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর হইয়াছিল। জুলাই মাসে প্যারিসে বিপ্লব ঘটে; বেলজিয়মে বিপ্লব আরম্ভ হইল অক্টোবর মাসে (১৮৩০)। পর বৎসর এক আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা বেলজিয়মের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। বেলজিয়মে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হইল।

বেলজিয়ম

জার্মানীর কোন কোন অংশে ১৮৩০-১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবের সূচনা

হইয়াছিল, কিন্তু মেটারনিকের কূটনীতির ফলে বিপ্লবিগণ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। মধ্য ইটালীর রাজ্যখণ্ডগুলিতেও (Papal States, Parma, Modena) বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, কিন্তু মেটারনিকের নির্দেশে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়াছিল। রাশিয়ার শাসনাধীন পোল্যাণ্ডে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘটিলে সম্রাট প্রথম নিকোলাস (Nicholas) উহা কঠোর হস্তে দমন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেবলমাত্র ফ্রান্সে এবং বেলজিয়মে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব সাফল্যলাভ করিয়াছিল, অন্যান্য দেশে প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রের দমননীতি জয়যুক্ত হইয়াছিল।

জার্মানী ; ইটালী

পোল্যাণ্ড

ইংলণ্ডে বিপ্লব সংঘটিত না হইলেও জনবিক্ষোভের ফলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক সংস্কার আইন (First Reform Act) পাশ হয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভোটাধিকার লাভ করে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রকৃত গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়।

ইংলণ্ড

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব (Revolution of 1848) : ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করিয়া লুই ফিলিপ যে শাসননীতি প্রবর্তন করেন তাহা জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শাসন-ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর হস্ত হইতে ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হস্তে দেওয়া হইয়াছিল, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের যে দুর্দশা ঘটিতেছিল সেদিকে সরকারের দৃষ্টি ছিল না। এইজন্য সমাজতন্ত্রবাদিগণ (Socialists) লুই ফিলিপের সমালোচনা করিতেন। উদারনৈতিক ব্যক্তিগণ ভোটাধিকার সম্প্রসারণ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করিতেন। কিন্তু সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ভোটাধিকার প্রথা পরিবর্তিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, লুই ফিলিপের বৈদেশিক নীতি সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই ; নেপোলিয়নের ন্যায় সামরিক গৌরব ও রাজ্যবিস্তার দ্বারা তিনি ভাবপ্রবণ ফরাসী জাতির হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। নেপোলিয়নের কীর্তি-কাহিনী তখনও ফ্রান্সের ঘরে ঘরে উন্মাদনার সৃষ্টি করিত। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের বিরোধে লুই ফিলিপ বেলজিয়মের পক্ষ সমর্থন করিবেন, ইহাই ফরাসী জাতি আশা করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। মিশরে ও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্সের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন

ফ্রান্সে 'ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে'র কারণ

(Louis Napoleon) দুইবার রাজ্যলাভের জন্য বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও নাম-মাহাত্ম্যে তিনি বহু লোকের সমর্থন পাইয়াছিলেন। বুর্‌বোঁ বংশের সমর্থক এবং প্রজাতন্ত্রের সমর্থক দলেরও অভাব ছিল না।

এই সকল কারণে লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হইতেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কারণে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শাসন-সংস্কারের দাবি উপলক্ষ করিয়া প্যারিসে বিপ্লব ঘটিল। রাজধানীর শ্রমিকগণ এই বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করিল। লুই ফিলিপ জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন মন্ত্রী গিজোকে (Guizot) পদচ্যুত করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। ফ্রান্সে "দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র" (Second Republic) স্থাপিত হইল। সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) প্রতিষ্ঠা এই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সাময়িকভাবে শ্রমিকদের কিছু সুবিধা হইলেও ফ্রান্স সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল না। নূতন সংবিধান অনুসারে লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হইলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কার্যতঃ সাধারণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়া সমুদয় ক্ষমতা নিজের হস্তে গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর তিনি "ফরাসী জাতির সম্রাট" (Emperor of the French) উপাধি গ্রহণ করিলেন। ফ্রান্সে "দ্বিতীয় সাম্রাজ্য" (Second Empire) প্রতিষ্ঠিত হইল। বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইল না।

'ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে'র ফল

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের মূলে ছিল সমাজতন্ত্রবাদ এবং শ্রমিকদিগের কাজ পাইবার (Right to Work) দাবি। ঐ বৎসর অন্যান্য দেশে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। ঐ সকল বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্য স্বৈরাচারী অস্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপন।

অন্যান্য দেশের বিপ্লব

হাঙ্গেরী মধ্যযুগে স্বাধীন রাজ্য ছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌সবুর্গ বংশের শাসনাধীন হয়। অস্ট্রিয়ার শাসনে হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয়, হাঙ্গেরীয় জাতির নিজস্ব ভাষা ও রীতি-নীতি বিপন্ন হইয়া পড়ে। বহুদিন যাবৎ হাঙ্গেরীর নেতৃগণ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লুই কসুথের (Louis Kossuth) নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। পর বৎসর

হাঙ্গেরী

(১৮৪৯) হাঙ্গেরী স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন বোহেমিয়ার (Bohemia) বিদ্রোহের ফলে অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) গঠিত হইয়াছিল। জার্মানীতে ও ইটালীতে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। চতুর্দিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশের রাজনৈতিক অধিকার বিপন্ন হইল। মেটারনিক ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট ফার্দিনান্দ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন; ফ্রান্সিস জোসেফ (Francis Joseph) তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

অস্ট্রিয়া

জার্মানী ও ইটালীতে বিপ্লবের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইবে। অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল বোহেমিয়ায় বিদ্রোহ দমন করিল। হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিল, কারণ রাশিয়ার সম্রাট নিকোলাস (Nicholas I) নিজ রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হাঙ্গেরীতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। তবে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সম্রাট হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন; অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী একটি যৌথ রাজ্যে (Dual Monarchy) পরিণত হয় (Ausgleich)।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশের মৌলিক দুর্বলতার সূচক হইলেও আপাতদৃষ্টিতে এই প্রাচীন রাজবংশের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। জার্মানী, ইটালী, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া—সর্বত্রই অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব আপাততঃ অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু মেটারনিকের অস্ট্রিয়া হইতে পলায়ন প্রমাণ করিল যে তাঁহার নীতি (Metternich system) শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের আদর্শ নির্মূল করিতে পারে নাই। জার্মানীতে এবং ইটালীতে জাতীয় ঐক্য স্থাপনে এবং ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব বিলোপে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর গুরুত্ব কম নহে।

মেটারনিক (Metternich) : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন মেটারনিক। তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল (১৮০৯-৪৮) অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সম্রাটগণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ভিয়েনা বৈঠকে এবং তাহার পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই যুগকে মেটারনিকের যুগ (Era of Metternich) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে মেটারনিকের জন্ম হয়। বিপ্লবিগণের উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপে বিরক্ত হইয়া তিনি প্রথম জীবনেই ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্বেষ গভীরতর হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার খ্যাতনামা মন্ত্রী কৌনিজের (Kaunitz) পৌত্রীকে বিবাহ করিয়া তিনি অস্ট্রিয়ায় প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হন এবং হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সম্রাটের অধীনে কূটনৈতিক কর্ম গ্রহণ করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রধান মন্ত্রীর (Chancellor) পদে উন্নীত হন। তৎকালীন সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস কার্যক্ষম ও দৃঢ়চেতা ছিলেন না। রাজ্যশাসনের দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে মেটারনিকের উপর ন্যস্ত ছিল।

প্রথম জীবন

নেপোলিয়ন জার্মানীতে মেটারনিকের পৈতৃক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বিজয়ী ফরাসী সম্রাট ছিলেন অস্ট্রিয়ার শত্রু। তথাপি মেটারনিক প্রথমে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হন নাই, রাশিয়ার সহিত সংঘর্ষে নেপোলিয়নের শক্তিক্ষয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের মস্কো হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মেটারনিক তাঁহার পতন ঘটাইবার সুযোগ পাইলেন। লাইপ্‌জিগের যুদ্ধে (Battle of the Nations) অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং ইংলণ্ডের সৈন্যদল সম্মিলিত ভাবে ফ্রান্স আক্রমণ করিয়া নেপোলিয়নকে পরাজিত করিল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে যাইতে বাধ্য হইলেন।

নেপোলিয়ন

এই সকল ঘটনা আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিল; অস্ট্রিয়ার নীতির সংগঠক ও পরিচালক রূপে মেটারনিক ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ রূপে খ্যাতি অর্জন করিলেন। রাশিয়ার সম্রাট (প্রথম আলেকজাণ্ডার) এবং প্রাশিয়ার রাজা তাঁহার বিজ্ঞতার নিকট মাথা নত করিয়া তাঁহার উপদেশে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করিলেন।

অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং সেই প্রতিপত্তি প্রয়োগ দ্বারা সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের গতিরোধ—এই দুইটি ছিল মেটারনিকের নীতির প্রধান লক্ষ্য। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই নীতি হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই। প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে বিপ্লবের

মেটারনিকের নীতি

প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বিরাগ ছিল। বিপ্লব কেবল ধ্বংস করে, সৃষ্টি করিতে পারে না, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে এবং নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ে তিনি বিপ্লবের ধ্বংসের দিক লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষের মনে যে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার-বোধ জাগ্রত হইয়াছিল তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ফ্রান্সের উদাহরণ হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে বিপ্লব দুষ্টক্ষতের (gangrene) মত, এক দেশে বিপ্লব ঘটিলে তাহা রাজনৈতিক সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং সমগ্র ইউরোপের শান্তি ক্ষুণ্ণ করে। সুতরাং বিপ্লবের প্রতিরোধ করা তিনি শান্তিরক্ষার জন্য অপরিহার্য বলিয়া মনে করিতেন। এই প্রতিরোধের দায়িত্ব প্রধানতঃ অস্ট্রিয়াকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ অস্ট্রিয়াই সর্বপ্রথম বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করে এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অস্ট্রিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য জার্মানীতে এবং ইউরোপে অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ভিয়েনা বৈঠক

ভিয়েনা বৈঠকে ইউরোপের পুনর্গঠন কার্যে মেটারনিক তাঁহার নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করেন। ফরাসী বিপ্লবের ফলে অধিকারচ্যুত রাজবংশগুলি সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। নেপোলিয়নের সহিত সংগ্রামে বিজয়ী দেশগুলি জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ নূতন রাজ্যখণ্ড লাভ করিল। অস্ট্রিয়া নেদারল্যাণ্ডস্ (বেলজিয়ম) পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ইটালীতে মিলান প্রদেশ পাইল এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাটের আত্মীয়দিগকে মধ্য ইটালীর কয়েকটি রাজ্যখণ্ডে (Tuscany, Parma, Modena) স্থাপন করা হইল। কার্যতঃ সমগ্র উত্তর ও মধ্য ইটালী অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্বাধীন হইল। জার্মানীতে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Confederation) স্থাপিত হইল তাহার সভাপতিত্ব লাভ করিল অস্ট্রিয়া। এইরূপে ইটালীতে এবং জার্মানীতে মেটারনিকের বিপ্লববিরোধী নীতি প্রয়োগের পথ পরিষ্কৃত হইল। সকল দেশেই বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত স্বৈরাচারমূলক শাসন-পদ্ধতি এবং বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের আয়োজন করা হইল। আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র ইউরোপে মেটারনিকের পদ্ধতি (Metternich System) প্রচলিত হইল।

যাহাতে বৃহৎ শক্তিগুলি সম্মিলিতভাবে বিপ্লবের প্রতিরোধ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ভিয়েনা বৈঠকের শেষে 'ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ' (Concert of Europe) গঠিত হইল। এই শক্তিসঙ্ঘের প্রকৃত নায়ক ছিলেন মেটারনিক।

কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা এবং সম্মিলিত রাজশক্তির সতর্কতা সত্ত্বেও ইউরোপে বিপ্লবের গতি রুদ্ধ হইল না। ইটালীতে এবং স্পেনে বিপ্লব ঘটিল। শক্তিসঙ্ঘের প্রচেষ্টায় এই সকল স্থানীয় বিপ্লব দমন করা হইল। ১৮১৮-২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারিবার বিভিন্ন স্থানে শক্তিসঙ্ঘের বৈঠক (Congress of Aix-la-Chapelle, Troppau, Laibach, Verona) বসিয়াছিল। এই সকল বৈঠকে মেটারনিকের বিপ্লব-দমন নীতি সমর্থিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিয়া মেটারনিক ব্যর্থ হইলেন; ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নূতন মহাদেশে মেটারনিকের পদ্ধতি প্রয়োগে বাধা দিল। মেটারনিকের এই ব্যর্থতার ফলে শক্তিসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল।

'ইউরোপীয় শক্তিসঙ্ঘ'

জার্মানীতে মেটারনিকের পদ্ধতি দীর্ঘকাল (১৮১৫-৪৮) প্রচলিত ছিল। জার্মান রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতি রূপে অস্ট্রিয়া কার্যতঃ জার্মানীর রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসননীতি নিয়ন্ত্রিত করিত। মেটারনিকের নির্দেশ অমান্য করিবার মত শক্তি ও সাহস কোন জার্মান রাজ্যের ছিল না। তিনি জার্মানীর সর্বত্র রক্ষণশীলদিগকে সমর্থন এবং বিপ্লববাদীদিগকে দমন করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত কার্লসবাদের নির্দেশসমূহ (Carlsbad Decrees) উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেটারনিকের নেতৃত্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি-সভা (Federal Diet) নির্দেশ দিল যে কোন রাজ্যে প্রজাদের দাবি স্বীকার করিয়া রাজতন্ত্রবিরোধী সংবিধান (Constitution) প্রবর্তন করা যাইবে না, বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের রাজনীতিচর্চা বন্ধ করিতে হইবে এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমালোচনাকারী সংবাদপত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জার্মানীর কোন কোন অংশে বিভীষিকার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

জার্মানীতে মেটারনিক পদ্ধতি

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লবের ফলে বুর্বোঁ রাজবংশের পতন ঘটিল। বেলজিয়ম হল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। ভিয়েনা সন্ধির সর্তবিরোধী এই দুইটি বিরাট পরিবর্তনে মেটারনিক বাধা দিতে পারিলেন না। কিন্তু জার্মানীতে এবং ইটালীতে যে ছোটখাট বিপ্লব ঘটিল তাহা অপেক্ষাকৃত সহজেই দমন করা হইল। এই দুই দেশে মেটারনিকের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ঢেউ তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই বিপ্লব ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীতে সীমাবদ্ধ ছিল না; হ্যাপ্সবুর্গ সম্রাটের প্রত্যক্ষ

শাসনাধীন অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং বোহেমিয়ায় ইহা প্রবল আকার ধারণ করিল। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে মেটারনিক ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। যে বিপ্লব দমন তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল সেই বিপ্লবের ফলেই তাঁহার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিল।

১৮৩০ এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব

মেটারনিকের নীতি যে মূলতঃ ভ্রান্ত এবং অবাস্তব ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগে জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্থায়ীভাবে ইউরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব ছিল না। এই কারণেই মেটারনিকের নীতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই নীতির আংশিক সাফল্য অস্বীকার করা যায় না; ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা জার্মানী এবং ইটালীতে বিপ্লব প্রতিরোধ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। মেটারনিকের যুগে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ইউরোপ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং শান্তিস্থাপনই ছিল সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ইউরোপের পুনর্গঠন কার্যে অগ্রসর হইলে বহু নূতন বাধার সৃষ্টি হইত, স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। এইদিক হইতে বিচার করিলে মেটারনিকের নীতি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য বজায় রাখিতে হইলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র রোধ করা ছাড়া মেটারনিকের উপায়ান্তর ছিল না। এই সাম্রাজ্যে বহু জাতির বাস ছিল, হ্যাপ্‌সবুর্গ সম্রাটের প্রতি বংশানুক্রমিক আনুগত্য এবং তাঁহার স্বৈরাচারী শাসন ছাড়া তাহাদের মধ্যে আর কোন যোগসূত্র ছিল না। মেটারনিক বিপ্লবের সমর্থক হইলে এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িত।

মেটারনিকের ব্যর্থতা ও সাফল্য

তৃতীয় নেপোলিয়ন (Napoleon III) : পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে "দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র" (Second Republic) স্থাপিত হয় এবং এই সাধারণতন্ত্রের নূতন সংবিধান অনুসারে লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Louis Napoleon Bonaparte) রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হন। তিনি মহাবীর নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ফ্রান্স হইতে নির্বাসিত হইয়া সুইজারল্যাণ্ডে বাস করেন। তিনি ইটালীর 'কার্বোনারি' (Carbonari) দলে যোগদান করিয়া একবার অস্ট্রিয়ার সৈন্যদলের

হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। পরে লুই ফিলিপের রাজত্বকালে তিনি দুইবার ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করেন এবং কিছুকাল ফ্রান্সের একটি দুর্গে বন্দী থাকেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে মহাবীর নেপোলিয়নের কীর্তি সম্বন্ধে নানাবিধ অতিশয়োক্তি (Napoleonic legend) প্রচারিত হইতে থাকে এবং ফ্রান্সের সিংহাসনে লুই নেপোলিয়নের দাবির সমর্থক এক রাজনৈতিক দলের (Bonapartists) উদ্ভব হয়।

প্রথম জীবন

লুই ফিলিপের পতনের পর রাজতন্ত্রের অবসান হইল, লুই নেপোলিয়ন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন (১৮৪৮)। প্রথম তিন বৎসর তিনি মোটামুটি গণতান্ত্রিক ও জনহিতকর নীতি অনুসরণ করিলেন। ফলে তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কার্যতঃ সাধারণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়া সমুদয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর তিনি "ফরাসী জাতির সম্রাট" (Emperor of the French) উপাধি গ্রহণ করিলেন। ফ্রান্সে "দ্বিতীয় সাম্রাজ্য" (Second Empire) প্রতিষ্ঠিত হইল। নূতন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে পরিচিত হইলেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ কাল (১৮৫২-৭০) তিনি সিংহাসনে আসীন রহিলেন।

"দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র"

সম্রাট রূপে তৃতীয় নেপোলিয়ন যে শাসননীতি প্রবর্তন করেন তাহার ভিত্তি ছিল গণতান্ত্রিক; তিনি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ জনগণের প্রতিনিধি-সভা তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইত। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে নানা বিষয়ে ফ্রান্সের উন্নতি হইয়াছিল। বাণিজ্যবিস্তারে এবং শিক্ষাপ্রসারে তাঁহার উৎসাহ ছিল। তিনি শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করিয়া প্রতিনিধি-সভার গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করেন।

"দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের" আভ্যন্তরীণ নীতি

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল তিনটি: (১) ইউরোপে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং (প্রথম) নেপোলিয়নের যুগের গৌরবের যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার; (২) যে ভিয়েনার সন্ধি (প্রথম) নেপোলিয়নের পতনের স্মারক তাহা বাতিল করা; এবং (৩) বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের

"দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের" পররাষ্ট্রনীতি

সমর্থন। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সাম্রাজ্যের অর্থ শান্তি ("I say the Empire means peace.")। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে পড়িয়া তিনি ইউরোপে তিনটি এবং ইউরোপের বাহিরে কয়েকটি যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়েন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সহযোগিতায় তুর্কী সাম্রাজ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে বাধা দেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন এবং ফ্রান্সের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি এই যুদ্ধে যোগদানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে ফরাসী সম্রাটের এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সন্ধির সর্ত নির্ধারণের জন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আন্তর্জাতিক বৈঠক (Congress of Paris) বসিল (১৮৫৬)। দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার অগ্রগতি রুদ্ধ হইল, তুর্কী সাম্রাজ্য রক্ষা পাইল, ফ্রান্স নূতন রাজনৈতিক মর্যাদার অধিকারী হইল।

ইটালী

অতঃপর তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। 'কার্বোনারি' দলের ভূতপূর্ব সভ্য রূপে ইটালীর জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল। ইটালীর সহিত মহাবীর নেপোলিয়নের স্মৃতি বিজড়িত ছিল। ইটালী অস্ট্রিয়ার শাসন হইতে মুক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ হইলে ভিয়েনার সন্ধির একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটিবে। স্বৈরাচারী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফ্রান্সে বিশেষ জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী কাভূরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন। অতঃপর ফ্রান্স ও পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সম্মিলিত বাহিনী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে (Austro-Sardinian War) অবতীর্ণ হইল। কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের পর নেপোলিয়ন অকস্মাৎ অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি (Armistice of Villafranca) করিলেন। ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ইটালী রাজ্য স্থাপিত হইলে ফ্রান্সের স্বার্থহানি ঘটিবে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা জন্মিল। তাই তিনি ইটালীর ঐক্যস্থাপনের পথে খানিকটা অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ইহাতে তিনি কাভূর ও ইটালীর জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন হইলেন, কিন্তু ইটালীকে আংশিক সাহায্য দানের জন্য ফ্রান্স স্যাভয় ও নীস নামক পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার অন্তর্গত দুইটি অঞ্চল লাভ করিল। ইটালীর জাতীয়তাবাদিগণের আক্রমণ হইতে পোপের রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন রোমে ফরাসী সৈন্য স্থাপন করিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত

যুদ্ধকালে তিনি এই সৈন্যদল রোম হইতে সরাইয়া আনিতে বাধ্য হন। তখন রোম ঐক্যবদ্ধ ইটালীর অন্তর্গত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভূরের আশা সম্পূর্ণ পূরণ না করিলেও ইটালীর ঐক্যসাধনে তাঁহার দান সামান্য নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) বিনষ্ট হইল এবং পরোক্ষ-ভাবে ফ্রান্সের স্বার্থহানি ঘটিল, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহাতে বাধা দিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিয়াছিল, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার ব্যক্তিগত শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল হইতেছিল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিল না। শ্লেজভিগ এবং হলস্টাইন সংক্রান্ত

জার্মানী

যুদ্ধে (Schleswig-Holstein War) এবং সাত সপ্তাহের যুদ্ধে (Seven Weeks' War, Austro-Prussian War) অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া প্রাশিয়া জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ পরিষ্কার করিল, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন নিশ্চেষ্ট রহিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্কের কূটনীতির জাল তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। ফরাসী জনমতের চাপে তিনি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ (Franco-Prussian বা Franco-German War) ঘোষণা করিলেন। সিডানের (Sedan) যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি আশী হাজার ফরাসী সৈন্যসহ জার্মানদের হস্তে বন্দী হইলেন। তাঁহার সিংহাসনচ্যুতি ঘোষণা করিয়া ফরাসী নায়কগণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। "দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে''র অবসান এবং "তৃতীয় সাধারণতন্ত্রে"র ভিত্তিস্থাপন হইল (সেপ্টেম্বর, ১৮৭০)। জার্মান শিবির হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাজ্যচ্যুত সম্রাট ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ইউরোপের বাহিরে ফ্রান্সের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। চীনে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহযোগিতায় চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে (Second China War, ১৮৫৭-৫৮)। তাঁহার সময়েই আনাম, কোচিন-চীন এবং কাম্বোডিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম ও বাণিজ্য সংক্রান্ত স্বার্থরক্ষার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকোতে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু ইহা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় ঐক্য আন্দোলন

১। ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা

ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শ

ইটালীতে নেপোলিয়নের প্রভুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু তিনি যে রাজনৈতিক ঐক্য এবং সুশাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি ইটালীর জনসাধারণের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইটালীতে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হইয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার বৎসর ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না, ইটালীর অনেক অংশ দীর্ঘকাল বিদেশীদের শাসনাধীন ছিল। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগে ইটালীতে জাতীয়তাবোধ জন্মিল, ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শ নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিল।

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইটালী

ভিয়েনা সন্ধি ঃ কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেসে সম্মিলিত শক্তিবর্গ নূতন ইটালী গঠনের চেষ্টা না করিয়া পুরাতন ইটালীকে পুনর্জীবিত করিতে তৎপর হইলেন। ইটালী ছোট-বড় কয়েকটি রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত হইল। উত্তরে লোম্বার্ডি (Lombardy) ও ভেনিসিয়া (Venetia) অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। মধ্য ইটালীতে টাস্‌কেনী (Tuscany), পার্মা (Parma) প্রভৃতি রাজ্যখণ্ডে (Duchy) হ্যাপ্‌সবুর্গ বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট শাসকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। পোপ তাঁহার রাজ্যখণ্ড (Papal States) ফিরিয়া পাইলেন। দক্ষিণে নেপলস্‌ ও সিসিলী রাজ্যের (Kingdom of Two Sicilies) শাসনভার দেওয়া হইল অস্ট্রিয়ার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ এক বুর্‌বোঁ রাজার (Ferdinand I) উপর। পীডমণ্ট (Piedmont) এবং সার্ডিনিয়ার অধিপতি ভিক্টর ইম্যানুয়েল (Victor Emmanuel) জাতিতে ইটালীয় হইলেও অস্ট্রিয়ার হুকুম মানিয়া চলিতেন। সুতরাং কার্যতঃ সমগ্র ইটালীতে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিপ্লববিরোধী মেটারনিকের দমননীতি সর্বত্র গৃহীত হইল। আপাতদৃষ্টিতে ইটালীতে জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা রহিল না। ইটালী ভাবগত ঐক্য হারাইয়া একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞায় (geographical expression) পরিণত হইল।

অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব

ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনঃ তথাপি ইটালীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই অন্যায় ব্যবস্থা মানিয়া লইল না, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র বিরাগ নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রতিফলিত হইল। নির্যাতনের ভয়ে প্রকাশ্যে

গুপ্ত সমিতি



ইটালীর ঐক্য

আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না, তাই জাতীয়তাবাদিগণ গুপ্ত সমিতি

গঠন করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল সমিতির মধ্যে 'কার্বোনারি'র (Carbonari) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু নেপলস্ এবং সিসিলীতেই এই সমিতির কয়েক সহস্র সভ্য ছিল। মেটারনিক কর্তৃক নিয়োজিত পুলিশ ও সৈন্যদলের নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া বিপ্লবীরা দেশের সর্বত্র নূতন ভাব, নূতন আদর্শ প্রচার করিল। ক্রমে উচ্চ রাজকর্মচারী হইতে সাধারণ শ্রমজীবী পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

কাভূরের নীতি

গুপ্তহত্যা, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিদ্রোহের দ্বারা জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে, ইহাই ছিল 'কার্বোনারি' ও অন্যান্য গুপ্ত সমিতির ধারণা। কিন্তু পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী কাভূর (Cavour) জানিতেন যে এই সকল উপায়ে অস্ট্রিয়ার ন্যায় প্রবল শত্রুকে পরাজিত করা যাইবে না, সেজন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সৈন্যবলের প্রয়োজন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজবংশের অধীনে সমগ্র ইটালীব্যাপী এক রাজ্য গঠন এবং সেই রাজ্যে উদারনৈতিক, পার্লামেণ্টীয় (Parliamentary) শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন। পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া যাহাতে জাতীয় ঐক্য স্থাপনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে সেজন্য তিনি এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক, প্রজার মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। কিন্তু ইটালীর

ম্যাট্‌সিনি

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিপ্লবী নায়ক জোসেফ ম্যাট্‌সিনির (Joseph Mazzini) আদর্শ ছিল অন্যরূপ। তিনি 'নব্য ইটালী' (Young Italy) নামক একটি গুপ্তসমিতি স্থাপন করেন। 'কার্বোনারি'র মত এই সমিতিও গুপ্তহত্যা, বিদ্রোহ প্রভৃতি দ্বারা স্বাধীনতা লাভ সম্ভব বলিয়া মনে করিত। ইটালীর ঐক্যস্থাপন সম্বন্ধে ম্যাট্‌সিনির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ; সমগ্র ইটালীর মুক্তি তাঁহার কাম্য ছিল, ইটালীর কোন বিশেষ অংশের মুক্তি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। তিনি রাজতন্ত্রবিরোধী ছিলেন ; সমগ্র ইটালীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাঁহার রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। এই কারণে তিনি কাভূরের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

পোপের সমর্থক দল

ইটালীতে পোপের সমর্থক আর একটি রাজনৈতিক দল (Neo-Guelfs) ছিল। এই দল পোপের অধীনে ইটালীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল।

শেষ পর্যন্ত কাভূরের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে তাঁহার আদর্শ ই জয়যুক্ত হইল—পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজবংশের অধীনে ইটালীতে ঐক্য এবং উদার-

নৈতিক পার্লামেণ্টীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ম্যাট্‌সিনির কার্যপদ্ধতি এবং প্রজাতন্ত্র স্থাপনের প্রয়াস অবাস্তব বলিয়াপ্রতিপন্ন হইল। কিন্তু ইটালীর নবজীবন লাভে তাঁহার আদর্শবাদ কম সাহায্য করে নাই। তাঁহার শিক্ষার ফলে জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের আদর্শ ইটালীবাসীর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য ব্যাপক মানসিক প্রস্তুতি তাঁহারই প্রচেষ্টার ফল।

বিপ্লব (১৮২০-১৮৪৮)ঃ ভিয়েনা কংগ্রেসের কিছুকাল পরেই ইটালীতে বিপ্লব ও বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নেপলসে এবং পর বৎসর পীডমণ্টে বিদ্রোহ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই অস্ট্রিয়ার সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে পোপের রাজ্যে এবং পার্মা ও মোডেনাতে (Modena) আবার বিদ্রোহ ঘটে (১৮৩১); এবারও অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপের ফলে বিপ্লবীরা ব্যর্থকাম হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে নেপলসে বিদ্রোহ হয়; পরে অস্ট্রিয়ার বিপ্লব এবং মেটারনিকের পতনের সংবাদ প্রচারিত হইলে মিলান, ভেনিস প্রভৃতি স্থানে হ্যাপ্‌সবুর্গ-শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম দিকে বিপ্লবীরা সাফল্য লাভ করিলেও ১৮৪৮-১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল সর্বত্র বিদ্রোহ দমন করিল। পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিপ্লব ব্যর্থ হইল, সমগ্র ইটালীতে আবার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮৪৯)। বারবার বিপ্লবের ব্যর্থতা হইতে অস্ট্রিয়ার শক্তি প্রমাণিত হইল, ইহাও দেখা গেল যে অস্ট্রিয়ার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকা পর্যন্ত ইটালীতে ঐক্য আসিবে না এবং ইটালীর কোন অংশেই স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিবে না।

অস্ট্রিয়ার জয়

ইটালীর এই দুর্দিনে কাভূর পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী হইলেন (১৮৫২)। এই রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েল (Victor Emmanuel) ইটালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। অস্ট্রিয়াকে ইটালী হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিতে না পারিলে ইটালীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশা নাই, ইহা উভয়েই স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছিল যে গুপ্ত আন্দোলন এবং বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ দ্বারা অস্ট্রিয়াকে বিতাড়ন করা অসম্ভব এবং ক্ষুদ্র পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া রাজ্যের পক্ষে অস্ট্রিয়াকে প্রকাশ্য যুদ্ধে পরাজিত করা দুরাশা মাত্র। সুতরাং কাভূর স্থির করিলেন যে ইটালীর সমস্যার প্রতি সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিতে হইবে এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া যাহাতে অন্যান্য পরাক্রান্ত দেশের সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কাভূরের নীতি

এই উদ্দেশ্যে কাভূরের পরামর্শে ভিক্টর ইম্যানুয়েল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (Crimean War, ১৮৫৪-১৮৫৬) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যোগদান করিলেন। এই যুদ্ধের অবসানে প্যারিসে যে শান্তি বৈঠক (Congress of Paris, ১৮৫৬) বসিল তাহাতে কাভূর যোগদান করিলেন এবং সম্মিলিত ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মুখে ইটালীর সমস্যা আলোচনা করিলেন। ইহাতে আপাততঃ কোন ফল না হইলেও ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন (Napoleon III) ইটালী সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সিংহাসন লাভের পূর্বে 'কার্বোনারি' দলের সভ্য ছিলেন। ইটালীর সহিত মহাবীর নেপোলিয়নের স্মৃতি বিজড়িত ছিল। স্বৈরাচারী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফ্রান্সে বিশেষ জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাভূরের সহিত তাঁহার কথাবার্তা পাকাপাকি হইল (Pact of Plombieres)। স্থির হইল যে পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া অস্ট্রিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ফ্রান্সের সাহায্য পাইবে; যুদ্ধে মিত্রশক্তি বিজয়ী হইলে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন লোম্বার্ডি-ভেনিসিয়া পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইবে, আর ফ্রান্স সাহায্যের প্রতিদানে স্যাভয় (Savoy) ও নীস (Nice) পাইবে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

তৃতীয় নেপোলিয়ন ও কাভূর

অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ (Austro-Sardinian War): এই চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কাভূর কূটনৈতিক কৌশলে অস্ট্রিয়াকে পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিলেন (Austro-Sardinian War, ১৮৫৯-১৮৬০)। ফরাসী বাহিনী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল। কয়েকটি যুদ্ধে (Magenta, Solferino) অস্ট্রিয়ার পরাজয় হইল। সমগ্র ইটালীতে নূতন আশার সঞ্চার হইল। জনমত সমগ্র উত্তর ও মধ্য ইটালী পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজবংশের অধীনে আনয়ন করিবার দাবি করিল। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার এতখানি শক্তি বৃদ্ধি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কেবলমাত্র উত্তর ইটালীর অন্তর্গত লোম্বার্ডি-ভেনিসিয়া ঐ রাজ্যের সহিত যুক্ত করিবার জন্য তিনি কাভূরের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার

অস্ট্রিয়ার পরাজয়

ধারণা হইল যে ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী ইটালী রাজ্য গঠিত হইলে ভবিষ্যতে ফ্রান্সের স্বার্থহানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। তাই তিনি অকস্মাৎ কাভূরের সহিত পরামর্শ না করিয়াই অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি (Armistice of Villafranca) স্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে কেবলমাত্র লোম্বার্ডি পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে দেওয়া হইল, ভেনিসিয়া অস্ট্রিয়ার অধীন রহিল। তৃতীয় নেপোলিয়নের এইরূপ আকস্মিক বিশ্বাসঘাতকতায় ইটালীর জনসাধারণ চঞ্চল ও মর্মাহত হইল, কিন্তু ভিক্টর ইম্যানুয়েল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেও এই বন্দোবস্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। কাভূর এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে পদত্যাগ করিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই পুনরায় স্বপদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

যুদ্ধের ফল

ইতিমধ্যে মধ্য ইটালীর রাজ্যখণ্ডগুলিতে এবং পোপের রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিল; জনসাধারণ গণভোট (plebiscite) দ্বারা পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সমগ্র মধ্য ইটালী পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ায় সহিত যুক্ত হইল, কেবলমাত্র পোপের রাজ্য পূর্ববৎ পোপের শাসনাধীন রহিল (১৮৬০)। তৃতীয় নেপোলিয়ন অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন। বিনিময়ে কাভূর তাঁহাকে স্যাভয় ও নীস প্রদান করিলেন।

মধ্য ইটালী

দক্ষিণ ইটালী: এইরূপে ইটালীতে আংশিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল—উত্তর ইটালীতে ভেনিসিয়া অস্ট্রিয়ার অধীন এবং মধ্য ইটালীতে রোম ও তৎসংলগ্ন প্রদেশ পোপের অধীন রহিল, আর দক্ষিণে নেপলস-সিসিলী রাজ্যে স্বৈরাচারী বুর্বোঁ রাজার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিল। দক্ষিণ ইটালীর এই বৃহৎ কুশাসিত রাজ্যটি বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিবার ভার লইলেন বীরশ্রেষ্ঠ গ্যারিবল্ডী (Garibaldi)। তিনি এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (Volunteers) সংগ্রহ করিলেন এবং লালকোর্তা (Red Shirts) নামে পরিচিত এই সৈন্যদল লইয়া প্রথমে সিসিলী দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। কাভূর প্রকাশ্যে গ্যারিবল্ডীর সহিত সহানুভূতি না দেখাইলেও তাঁহাকে সৈন্য সংগ্রহের ও সিসিলী যাত্রার সুযোগ দিলেন। সিসিলীর বিপ্লবগণ এবং জনসাধারণ মুক্তিদাতা গ্যারিবল্ডীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। সিসিলী দ্বীপে বুর্বোঁ শাসনের অবসান হইল (১৮৬০)। গ্যারিবল্ডী সসৈন্যে নেপলসে উপস্থিত হইলে বুর্বোঁ রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

গ্যারিবল্ডী

সিসিলী আক্রমণ

তখন কাভূরের নির্দেশে পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সৈন্যদল পোপের রাজ্যের মধ্য দিয়া নেপলস অভিমুখে অগ্রসর হইল। গ্যারিবল্ডী ম্যাটসিনির ন্যায় ইটালীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন, পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজবংশের অধীনে ঐক্য স্থাপন তাঁহার মনঃপূত ছিল না। এইজন্য কাভূরের মনে স্বভাবতঃই আশঙ্কা হইল যে দক্ষিণ ইটালীতে (নেপলস-সিসিলী রাজ্যে) গ্যারিবল্ডীর প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে সেখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, রাজতন্ত্রশাসিত উত্তর ইটালীর সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিবে, ফলে ইটালী ঐক্যবদ্ধ না হইয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে। এইজন্য কাভূর গ্যারিবল্ডী কর্তৃক নেপলস বিজয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন।

পোপের রাজ্য ও নেপলস জয়

পোপের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সৈন্যদল পোপের রাজ্য অধিকার করিল, কেবলমাত্র রোম শহর পোপের অধীন রহিল। অতঃপর এই সৈন্যদল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া নেপলসে গ্যারিবল্ডীর সহিত যোগ দিল। তিনি ইটালীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি না করিয়া নেপলস-সিসিলী রাজ্য রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বুর্বোঁ রাজা ফ্রান্সিস দুর্গ ত্যাগ করিয়া নির্বাসন বরণ করিলেন (১৮৬১)। ভিক্টর ইম্যানুয়েল 'সার্ডিনিয়ার রাজা' উপাধির পরিবর্তে 'ইটালীর রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৮৬১)। ইহার অল্পদিন পরেই কাভূরের মৃত্যু হইল। ভেনিসিয়া প্রদেশ এবং রোম শহরের মুক্তি তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইটালীয় জাতি তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছে।

ভেনিসিয়া

ঐক্য সম্পন্ন ঃ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ (Austro-Prussian War) উপস্থিত হইলে ইটালীর রাজা প্রাশিয়ার সহিত যোগদান করিলেন। অস্ট্রিয়া পরাজিত হইল, অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন ভেনিসিয়া প্রদেশ স্বাধীন ইটালীর সহিত যুক্ত হইল।

রোম

ফ্রান্সের ক্যাথলিকগণকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করার জন্য ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম শহরে একদল ফরাসী সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত তাঁহার যুদ্ধ (Franco-German War) উপস্থিত হইলে তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনে ঐ সৈন্যদল সরাইয়া নিতে বাধ্য হইলেন। ঐ যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। তখন ইটালীরাজের

সৈন্যদল রোমে প্রবেশ করিল। রোম ঐক্যবদ্ধ ইটালী রাজ্যের রাজধানী হইল। পোপের রাজনৈতিক অধিকার বিলুপ্ত হইল, কিন্তু তিনি পূর্ববৎ ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুরু রহিলেন। এতদিনে ইটালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হইল; ম্যাটসিনি, কাভুর, গ্যারিবল্ডী ও বহু সহস্র বিপ্লবীর স্বপ্ন সফল হইল।

ইটালীর ঐক্য স্থাপনে তৃতীয় নেপোলিয়নের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের সময় অর্ধপথে সন্ধি স্থাপন করিয়া এবং রোমে সৈন্য স্থাপন দ্বারা পোপের সহায়তা করিয়া তিনি ইটালীর জাতীয়তাবাদিগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কাভূর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ইটালীর ঐক্য আন্দোলন বাস্তব পরিণতির পথে অগ্রসর হয়।

২। জার্মানীর ঐক্য

ভিয়েনা সন্ধি: নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেসে সম্মিলিত বিজয়ী শক্তিবর্গ জার্মানীর মানচিত্র সম্পূর্ণ নূতন ভাবে অঙ্কন করিতে পারেন নাই। 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য' (Holy Roman Empire) পুনঃস্থাপিত হয় নাই, নেপোলিয়নের আমলে যে সকল শাসক গদীচ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলে গদী ফিরিয়া পান নাই। প্রাশিয়ার সীমা প্রসারিত করা হইল; রাইন নদীর তীরবর্তী কয়েকটি বর্ধিষ্ণু প্রদেশ প্রাশিয়ার শাসনাধীন হইল। অস্ট্রিয়া নেদারল্যাণ্ড্স (বেলজিয়ম) হারাইল (ইহা হল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত হইল), কিন্তু ইহার পরিবর্তে পোল্যাণ্ডে এবং ইটালীতে বিস্তৃত রাজ্যখণ্ড লাভ করিল। নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্যের অপরাধে স্যাক্সনীর সীমা সঙ্কুচিত করা হইল। হ্যানোভারের অধিপতি রাজা উপাধি পাইলেন; পূর্বে তাঁহার উপাধি ছিল Elector ('পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে'র সম্রাট-নির্বাচক)। জার্মানীতে ৩৯টি রাজ্য এবং রাজ্যখণ্ড রহিল। এগুলি সম্মিলিতভাবে জার্মান রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Germanic Confederation) গঠন করিল। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতি হইল অস্ট্রিয়া এবং ইহার একটি প্রতিনিধি-সভা (Federal Diet) স্থাপিত হইল। এই প্রতিনিধি-সভায় কেবলমাত্র শাসকদের প্রতিনিধি থাকিতেন, প্রজাদের কোন প্রতিনিধির স্থান এই সভায় ছিল না।

জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি

প্রতিক্রিয়াশীল শাসনঃ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগের পর জার্মানীতে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের জয় হয় নাই। রাজনৈতিক অনৈক্য বজায় রহিল (যদিও ইহার গুরুত্ব কমিয়া গেল) এবং শাসনক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসকগণের কর্তৃত্ব বদ্ধমূল হইল। প্রতিনিধি-সভা কার্যতঃ অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী মেটারনিকের প্রভাবাধীন হইল এবং তাঁহার নির্দেশে বিভিন্ন রাজ্যে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের দাবি নির্যাতন দ্বারা বন্ধ করা হইল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিনিধি-সভা নির্দেশ (Carlsbad Decrees) দিল যে কোন রাজ্যে প্রজাদের দাবি স্বীকার করিয়া রাজতন্ত্র-বিরোধী সংবিধান (Constitution) প্রবর্তন করা চলিবে না, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের রাজনীতি-চর্চা বন্ধ করিতে হইবে এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমালোচনাকারী সংবাদপত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জার্মানীর কোন কোন অংশে বিভীষিকার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিপ্লব (১৮৩০)ঃ জার্মানীতে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে যে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হইতেছিল তাহার আংশিক প্রকাশ হইল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পরে। স্যাক্সনী, হ্যানোভার এবং হেসি (Hesse) রাজ্যে প্রজাবিদ্রোহের ভয়ে নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইল; কিন্তু অল্পদিন পরে মেটারনিকের নিকট সাহায্যের আশ্বাস পাইয়া হ্যানোভার ও হেসির শাসকগণ নূতন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব জার্মানীতে কোন স্থায়ী পরিবর্তন আনিতে পারে নাই।

অর্থনীতিক্ষেত্রে ঐক্যঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যপ্রচেষ্টা সার্থক না হইলেও ইতিমধ্যে জার্মানীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ জার্মানীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের বাণিজ্য-শুল্ক প্রচলিত ছিল। ইহাতে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ব্যাহত হইত, বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সহিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের বাণিজ্য-সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা উভয় রাজ্যের মধ্যে শুল্ক স্থাপন ও শুল্ক আদায় সম্বন্ধে সহযোগিতার ব্যবস্থা হয়। ক্রমে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য এই বন্দোবস্ত সুবিধাজনক মনে করিয়া ইহা গ্রহণ করে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর এক বৃহৎ অংশ এই শুল্ক সমবায়ের (Customs Union, জার্মান ভাষায় ইহা Zollverein নামে পরিচিত) অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭টি রাষ্ট্রের অধিবাসী আড়াই

শুল্ক সমবায়

কোটি লোক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইল। পরে অন্যান্য রাজ্যও এই সমবায়ে যোগ দিল। জার্মানী রাজনীতিক্ষেত্রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেও অর্থনীতিক্ষেত্রে ঐক্য ও সহ-সহযোগিতার নীতি স্বীকার করিয়া লইল। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হইল, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিল—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন বৃহত্তর ঐক্যের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

ঐক্যের ফল

বিপ্লব (১৮৪৮): ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ফ্রান্স হইতে জার্মানীতে ছড়াইয়া পড়ে। এই বিপ্লবে জাতীয়তাবাদী জার্মানগণ এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি—সমগ্র জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন। ইটালীর মত জার্মানীতে বৈদেশিক অধিকার ছিল না; কিন্তু জার্মানীর রাজগণ জার্মান জাতীয় হইলেও জার্মান জনসাধারণের কোন দাবি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইটালী ও জার্মানী—উভয় দেশেই জনগণের দাবির প্রবল বিরোধী ছিল অস্ট্রিয়া।

বিপ্লবের উদ্দেশ্য

প্যারিসে লুই ফিলিপের পতন ঘটিবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই জার্মানীর কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে শাসকগণ ভীত হইয়া নূতন সংবিধান প্রচার করিলেন এবং প্রজাদের গণতান্ত্রিক দাবি অনেকটা মানিয়া লইলেন। বার্লিনে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে প্রাশিয়ারাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম (Frederick William IV) "স্বাধীন, নবজাত জার্মান জাতির" ("of a free and newborn German nation") নায়কত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ভিয়েনাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে মেটারনিক ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন; কয়েকমাস পরে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফার্দিনান্দ পদত্যাগ করিলেন এবং ফ্রান্সিস জোসেফ (Francis Joseph) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, উত্তর ইটালী প্রভৃতি রাজ্যখণ্ডেও বিপ্লব ঘটিয়াছিল।

প্রাশিয়া

অস্ট্রিয়া

ফ্রান্সিস জোসেফের রাজ্যলাভের কিছুদিন পূর্বেই সম্রাটের সৈন্যদল ভিয়েনা দখল করিয়াছিল এবং ২৪ জন বিপ্লবী নায়ককে ফাঁসি দিয়াহ্যাপ্‌সবুর্গ রাজধানীতে শান্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। ১৮৪৮-১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া এবং উত্তর ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হইল।

এদিকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জার্মানীর জাতীয়তাবাদী নায়কগণের

আহ্বানে ফ্রাঙ্কফুর্ট নগরে এক জাতীয় মহাসভার (Frankfurt Parliament) অধিবেশন আরম্ভ হইল। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্য হইতে পাঁচশতের বেশী প্রতিনিধি এই মহাসভায় সমবেত হইলেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; অধ্যাপক, সাহিত্যিক, আইনজীবী প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জার্মানীর জাতীয় আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানাবিধ তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে সমগ্র জার্মানীতে এক শাসকের অধীনে একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federal State) প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দুইটি কক্ষ (chamber) সহ একটি প্রতিনিধি-সভা থাকিবে। এই শাসক বংশানুক্রমে সিংহাসন লাভ করিবেন এবং সম্রাট উপাধি ধারণ করিবেন। অস্ট্রিয়া এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না, কারণ হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সম্রাটের প্রজাদের মধ্যে অনেকেই জার্মানজাতীয় নহে। যুক্তরাষ্ট্রটি সর্বতোভাবে জার্মানীর জাতীয় রাষ্ট্র হইবে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট মহাসভা

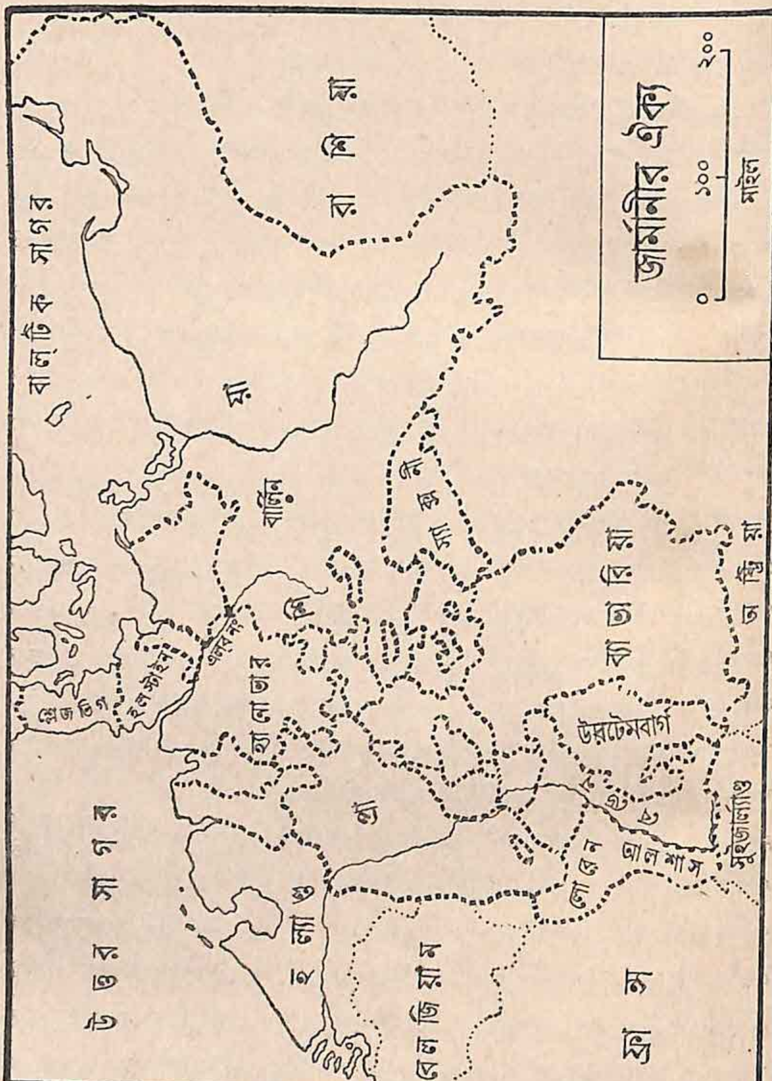
অতঃপর মহাসভার পক্ষ হইতে প্রাশিয়ার রাজাকে সম্রাটের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল (১৮৪৯)। কিন্তু ফ্রেডারিক উইলিয়ম মনে করিতেন যে ঈশ্বরানুগ্রহেই (Divine Right) রাজ্যলাভ ঘটে, প্রজাদের অনুগ্রহে নহে। সুতরাং তিনি বিপ্লবী মহাসভার নিকট হইতে সম্রাটের সিংহাসন গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। অস্ট্রিয়া এই নূতন ব্যবস্থা মানিয়া লইবে না, ইহাও তিনি জানিতেন। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী এবং উত্তর ইটালীতে বিদ্রোহ দমন করিয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। এই সকল কারণে ফ্রেডারিক উইলিয়ম ফ্রাঙ্কফুর্ট মহাসভার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন জাতীয়তাবাদিগণ সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া মহাসভা ভাঙ্গিয়া দিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া—জার্মানীর নেতৃস্থানীয় এই দুইটি রাজ্যের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানীতে ঐক্যস্থাপন সম্ভব ছিল না। তাহাদের প্রবল উৎসাহ ছিল, জীবন্ত আদর্শবাদ ছিল, কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির অভাবে তাহাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল। জার্মানীর কঠিন সমস্যার সমাধান করিবার মত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাহাদের ছিল না।

ফ্রাঙ্কফুর্ট মহাসভার ব্যর্থতা

অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের ফলে জার্মানীতে আবার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-পদ্ধতি চালু হইল। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল প্রাশিয়া। এই রাজ্যে রাজতন্ত্র বর্তমান থাকিলেও একটি মোটামুটি উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তিত হইল (১৮৫০)।

যুদ্ধ দ্বারা জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা: বিসমার্ক: প্রথম উইলিয়মের

রাজত্বকালে (১৮৫৭-১৮৮৮) প্রাশিয়ার—তথা জার্মানীর—বিস্ময়কর পরিবর্তন



এবং উন্নতি ঘটে। তিনি নিজে যে বিশেষ কৃতী বা দূরদর্শী শাসক ছিলেন তাহা নহে, তবে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের হস্তে দায়িত্বভার সমর্পণের মত বুদ্ধি ও উদারতা তাঁহার ছিল। প্রধান সেনাপতি মোলটকে (Moltke) এবং সমর-সচিব রুন (Roon) সৈন্য বিভাগে বহু সংস্কার প্রবর্তন করিয়া প্রাশিয়ার সামরিক

প্রাশিয়ার উন্নতি

শক্তি ইউরোপে অতুলনীয় করিয়া তুলিলেন। আর এই সামরিক শক্তির সুদক্ষ ব্যবহার করিয়া প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক (Bismarck) প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে সম্মিলিত আদর্শবাদী নেতৃগণ যুক্তি ও বক্তৃতা দ্বারা যাহা করিতে পারেন নাই ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ (diplomat) বিসমার্ক ছলে বলে তাহা সুসম্পন্ন করিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে কঠিন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বক্তৃতা ও ভোটের দ্বারা হয় না— হয় রক্তপাত ও অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা ("The great questions of the time are not to be solved by speeches and Parliamentary votes, but by blood and iron.")। বিসমার্ক এই নীতি প্রয়োগ করিয়া অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই নীতি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত জার্মানীর পক্ষে বিষময় হইয়াছিল।

বিসমার্কের নীতি

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী (Junker) বংশে বিসমার্কের জন্ম হয়। ত্রিশ বৎসর বয়সে স্থানীয় প্রতিনিধি-সভার (Provincial Diet) সভ্যরূপে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব উপলক্ষ্যে তাঁহার রক্ষণশীল মনোবৃত্তি এবং রাজতন্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। পরে জার্মান রাজ্যসঙ্ঘের (Germanic Confederation) প্রতিনিধি-সভার (Diet) সভ্যরূপে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি প্রাশিয়ার মর্যাদা ও স্বার্থের পক্ষে হানিকর। কয়েক বৎসর রাশিয়াতে এবং ফ্রান্সে প্রাশিয়ার রাজদূত রূপে কাজ করিবার পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীর (Chancellor) পদ অধিকার করেন।

বিসমার্কের প্রথম জীবন

প্রধান মন্ত্রী রূপে বিসমার্ক

প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াই বিসমার্ক প্রতিনিধি-সভার মতামত অগ্রাহ্য করতঃ সৈন্যদলের শক্তিবৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার এই কার্য গণতান্ত্রিক এবং পার্লামেণ্টীয় রীতির দিক হইতে অসঙ্গত হইলেও ইহাতে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হইল এবং রাজতন্ত্রের প্রভাব দৃঢ়মূল হইল। এতদিনে প্রাশিয়া জার্মানীর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল।

বিসমার্ক জানিতেন যে ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়া জার্মানীতে যে প্রতিপত্তি ভোগ করিত তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে না পারিলে প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা যাইবে না। ইটালীর ন্যায় জার্মানীতেও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা ছিল অস্ট্রিয়া। সেই বাধা যুদ্ধ দ্বারা দূর করিবার জন্য বিসমার্ক প্রস্তুত হইলেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্লেজভিগ (Schleswig) এবং হলস্টাইন (Holstein) নামক দুইটি রাজ্যখণ্ড (Duchy) সম্বন্ধে ডেনমার্কের সহিত জার্মানীর বিরোধ উপস্থিত হইল। এই দুইটি প্রদেশ ডেনমার্কের রাজার শাসনাধীন হইলেও এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই জার্মানজাতীয় ছিল এবং এই কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদিগণ প্রদেশ দুইটিকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিতেন। যুদ্ধে (Schleswig-Holstein War) পরাজিত হইয়া ডেনমার্ক উভয় রাজ্যখণ্ড অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে সম্মিলিতভাবে সমর্পণ করিল (১৮৬৪)। পরে প্রাশিয়া শ্লেজভিগ দখল করিল, হলস্টাইন অস্ট্রিয়ার ভাগে পড়িল। তখন বিসমার্ক হলস্টাইন প্রাশিয়ার অধিকারভুক্ত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। তিনি গোপনে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং ইটালীর রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি লইলেন। ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার সমরায়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল (১৮৬৬)। মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে এই যুদ্ধ (Seven Weeks' War অথবা Austro-Prussian War) সমাপ্ত হইল। অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া সন্ধি করিল (Treaty of Prague, ১৮৬৬)। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত জার্মান রাজ্যসঙ্ঘ (Germanic Confederation) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল; এই সঙ্ঘের সভাপতিরূপে অস্ট্রিয়া সমগ্র জার্মানীতে যে প্রতিপত্তি ভোগ করিত তাহা বিলুপ্ত হইল। উত্তর জার্মানীর রাজ্যগুলি লইয়া এক নূতন সঙ্ঘ (North German Confederation) গঠিত হইল (১৮৬৭)। প্রাশিয়ার রাজা ইহার সভাপতি হইলেন, বিসমার্ক স্বয়ং হইলেন ইহার প্রধান মন্ত্রী। উত্তর ইটালীতে ভেনিসিয়া প্রদেশ অস্ট্রিয়ার হস্তচ্যুত হইয়া ইটালী রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল। কিন্তু প্রাশিয়া স্বয়ং অস্ট্রিয়ার কোন রাজ্যাংশ অধিকার করিল না, বিসমার্ক ভবিষ্যতে অস্ট্রিয়ার সহিত বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত রাখিলেন।

ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ

অস্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ

এই দুইটি যুদ্ধের কাহিনী আলোচনা করিলে বিসমার্কের অসামান্য কূটনৈতিক বুদ্ধি এবং প্রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় যুদ্ধের ফলই প্রাশিয়ার পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল। শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন অধিকারের ফলে উত্তর জার্মানীর বিখ্যাত বন্দর কিয়েল (Kiel) প্রাশিয়ার হস্তগত হইল এবং ভবিষ্যতে একটি খাল কাটিয়া উত্তর সাগরের সহিত বাল্টিক সাগরের সংযোগ সাধনের সম্ভাবনা রহিল। জার্মান রাজ্যসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের অবসান ঘটিল। উত্তর জার্মান রাজ্যসঙ্ঘ গঠিত হওয়ায় উত্তর জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকৃত হইল।

প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি

অতঃপর বিসমার্কের সমস্যা হইল দক্ষিণ জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্থাপন করিয়া সমগ্র জার্মানীর ঐক্যসাধন। এই কার্যের পথে দুইটি প্রধান বাধা ছিল। প্রথমতঃ, দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের সহিত অস্ট্রিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অস্ট্রিয়ার ন্যায় এই রাজ্যগুলিও ছিল ক্যাথলিক মতাবলম্বী, আর প্রাশিয়া ছিল প্রোটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী। সুতরাং দক্ষিণ জার্মানী সহজে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকার করিবে কিনা তাহাতে সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (Diplomatic Revolution, ১৭৫৬) হইতে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। সুতরাং প্রাশিয়া সমগ্র জার্মানীর নেতৃত্ব লাভ করিয়া আরও শক্তিমান হউক, ইহা ফ্রান্স চাহিত না। ফরাসী-সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্কের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের (Austro-Prussian War) পূর্বে বিসমার্ক তাঁহাকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং প্রাশিয়া দক্ষিণ জার্মানীতে নেতৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস করিলে ফ্রান্স তাহাতে বাধা দিবে ইহা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল।

উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানীর সম্মিলনে বাধা

কিন্তু বিসমার্কের অদ্ভুত কৌশল এবং প্রাশিয়ার সামরিক বল এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানীর সম্মিলন ঘটাইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন লুক্সেমবার্গে (Luxemberg) প্রদেশ অধিকার করিতে চাহেন এবং প্রয়োজন হইলে বেলজিয়ম আক্রমণ করিতে পারেন, এই কথা প্রচার করিয়া বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মানীতে এবং ইংলণ্ডে ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে সন্দেহের সৃষ্টি

বিসমার্কের কূটনীতি

করিলেন। বেলজিয়ম ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হইলে ইংলণ্ডের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে বলিয়া ইংরেজদের আশঙ্কা ছিল। ফলে প্রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড তৃতীয় নেপোলিয়নকে সমর্থন বা সাহায্য করিবে না, এই বিষয়ে বিসমার্ক নিশ্চিত হইলেন। আর প্রধানতঃ জার্মান-অধ্যুষিত লুক্সেমবার্গ হল্যাণ্ডের হস্তচ্যুত হইয়া ফ্রান্সের অধীন হয় ইহা ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলির অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং তাহারা রাজ্যলোভী ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইল।

ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ

অতঃপর বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। স্পেনের সিংহাসন শূন্য হওয়ায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজবংশীয় (Hohenzollern) প্রিন্স লিওপোল্ড স্পেনের সরকার কর্তৃক রাজপদের জন্য মনোনীত হন। বিসমার্ক কৌশলে এই মনোনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের আপত্তিতে লিওপোল্ড বিসমার্কের পরামর্শে সিংহাসন গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে প্রাশিয়া অপমানিত হইয়াছে মনে করিয়া ফ্রান্সে উল্লাসের সঞ্চার হয় এবং ফরাসী সরকার প্রাশিয়ার রাজার কাছে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করে যে ভবিষ্যতে আর কখনও লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসনের জন্য প্রার্থী হইবেন না। প্রাশিয়ার রাজা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন এবং এই বিষয়ে ফরাসী রাজদূতের সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বিসমার্কের নিকট একটি টেলিগ্রাম (Ems telegram) প্রেরণ করেন। এই টেলিগ্রাম সম্বন্ধে বিসমার্ক সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহা পড়িয়া জার্মানরা মনে করিল যে ফরাসী সরকার রাজদূত দ্বারা প্রাশিয়ার রাজাকে অপমান করিয়াছে, আর ফ্রান্সে ধারণা হইল যে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রান্সের দূতকে অপমান করিয়াছেন। বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন, কারণ ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ফরাসীরা তাঁহার কূটনীতি বুঝিতে না পারিয়া ফাঁদে পা দিল।

প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ (Franco-Prussian War, Franco-German War) মাত্র কয়েকমাস স্থায়ী হইয়াছিল (জুলাই ১৮৭০-জানুয়ারী, ১৮৭১)। সিডানের (Sedan) যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন

আশী হাজার ফরাসী সৈন্যসহ জার্মানদের হাতে বন্দী হইলেন। তাঁহার সিংহাসনচ্যুতি ঘোষণা করিয়া ফরাসী নায়কগণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (Second Empire) অবসান এবং তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের (Third Republic) ভিত্তি স্থাপন হইল (সেপ্টেম্বর, ১৮৭০)।

ফ্রান্সের পরাজয় ও তাহার ফল

কয়েক মাস পরে বিজয়ী জার্মান বাহিনী প্যারিস অধিকার করিল (জানুয়ারী, ১৮৭১)। ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার আলশাস (Alsace) ও লোরেন (Lorraine) প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকৃত হইয়া প্রাশিয়ার সহিত সন্ধি করিল (Treaty of Frankfurt—মে, ১৮৭১)।

কিন্তু বিসমার্ক রাজ্যবিস্তারের জন্য ফ্রান্স আক্রমণ করেন নাই, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীতে ঐক্য স্থাপন করা। দক্ষিণ জার্মানীতে ইতিপূর্বেই প্রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাব দেখা দিয়াছিল, ব্যাভেরিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী প্যারিসের নিকটবর্তী ভা র্সা ই (Versailles) শহরে প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়ম জার্মান সম্রাট (Kaiser) উপাধি গ্রহণ করিলেন, জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হইল।

জার্মানীতে ঐক্য স্থাপন

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচ্য সমস্যা (১৭৬৩-১৯১৪)

তুর্কীর প্রসার: ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ওসমানবংশীয় তুর্কীরা (Ottoman Turks) পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের (Eastern Roman Empire) রাজধানী কন্‌স্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে। অতঃপর প্রায় দুইশত বৎসর তাহারা অপ্রতিহত গতিতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাজ্যবিস্তার করিতে থাকে। গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ভিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ এবং পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার কিয়দংশ তাহাদের হস্তগত হয়। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হয়। এই আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হইলে মধ্য ইউরোপে তাহাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপিত হইত। অতঃপর তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল।

তুর্কীর প্রসারে বাধা

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশের শাসনাধীন হইল (Treaty of Karlowitz)। ক্রমশঃ নবজাগ্রত রাশিয়া তুর্কীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া—ইউরোপের এই দুইটি প্রধান শক্তির আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার দায়িত্ব দুর্বল তুর্কী সুলতানেরা পালন করিতে পারিলেন না।

তুর্কীর দুর্বলতার কারণঃ তুর্কী সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার নানাবিধ কারণ ছিল। ইউরোপে যে সকল দেশ সুলতানদের শাসনাধীন ছিল সেখানে জনসাধারণের অধিকাংশ ছিল খ্রীষ্টান; ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীরা সংখ্যায় কম হইলেও শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা এবং প্রচুর ভূসম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। তুর্কী শাসক সম্প্রদায় এবং খ্রীষ্টান প্রজাদের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল না। বহু খ্রীষ্টান কৃষক নির্যাতিত ভূমিদাসে (serf) পরিণত হইয়াছিল। সামরিক বল এবং ধর্মান্ধতা ছিল তুর্কী-শাসনের ভিত্তি। দ্বিতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর সুলতানেরা পূর্ববর্তী সুলতানদের মত যুদ্ধক্ষেত্রে বা শাসনকার্যে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। মন্ত্রীদের উপর রাজকার্যের ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা বিলাসে কাল কাটাইতেন। রাজদরবারের ষড়যন্ত্রের ফলে মন্ত্রীদের উত্থানপতন ঘটিত। শাসনযন্ত্রে নানাবিধ অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সামরিক দিক হইতেও তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। রাশিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি দেশে রণনীতি ও অস্ত্রশস্ত্রের যে উন্নতি ঘটিতেছিল তুর্কী সাম্রাজ্য তাহার সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। তুর্কী সৈন্যদলে শৃঙ্খলার অভাব ক্রমশঃ প্রবল হইতেছিল। 'জানিজারি' নামে পরিচিত (Janizaries) সৈন্যেরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া কার্যতঃ সুলতানদের এবং মন্ত্রীদের প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তুর্কী ও রাশিয়াঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপে তুর্কী [illegible]াজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অস্ট্রিয়া এবং উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার [illegible]ান ক্ষেত্র ছিল হাঙ্গেরী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাশিয়া তুর্কীর নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সম্রাট পীটারের (Peter the Great) শাসনাধীনে (১৬৮২-১৭২৪) রাশিয়া একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এতদিন পর্যন্ত রাশিয়া ভৌগোলিক হিসাবে ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সভ্যতা এবং রাজনীতির দিক দিয়া ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। পীটার

পীটারের পররাষ্ট্রনীতি

রাশিয়ার পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিলেন এবং রাশিয়াকে ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করাইলেন। উত্তরে বাল্টিক সাগরে এবং দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরে (Black Sea) রাশিয়ার প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই দুইটি সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরগুলি ছিল রাশিয়ার সহিত পশ্চিম ইউরোপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পথ। সুইডেনকে পরাজিত করিয়া পীটার বাল্টিক সাগরের পূর্বতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করেন। রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের পথ তুর্কী কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিল; রাশিয়ার দক্ষিণাংশে ক্রিমিয়া (Crimea) অঞ্চল তখন তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পীটার ক্রিমিয়ার অন্তর্গত আজভ (Azov) বন্দর অধিকার করেন, কিন্তু ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী কর্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি এই বন্দরটি তুর্কীকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন (Treaty of the Pruth)।

ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার সহিত তুর্কীর শত্রুতা চলিতেছিল। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সার্ভিয়ার অধিকাংশ অধিকার করিয়া লইল (Treaty of Passarowitz)। কিছুকাল পরে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া সম্মিলিত হইয়া তুর্কী সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল (১৭৩৬-৩৯)। এই যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া সার্ভিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল; রাশিয়া আজভ বন্দর ফিরিয়া পাইল, কিন্তু কৃষ্ণসাগরে জাহাজ পাঠাইবার অধিকার পাইল না (Treaty of Belgrade)।

দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও তুর্কী সাম্রাজ্য: অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের (Catherine II) সুদীর্ঘ রাজত্বকালে (১৭৬২-৯৬) রাশিয়া ইউরোপের একটি প্রধান শক্তি (Great Power) রূপে গণ্য হয়। তাঁহার আক্রমণাত্মক (aggressive) নীতি এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার সময়ে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় এবং ঐ বৃহৎ দেশের পূর্ব ও মধ্য অঞ্চল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। পোল্যাণ্ডের বৃহত্তম অংশ গ্রাস করিয়াই ক্যাথারিন ক্ষান্ত হন নাই। তুর্কী সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তিনি পীটারের নীতি অনুসরণ করেন এবং তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস তুর্কীতে ভীতির সঞ্চার করে। পোল্যাণ্ড গ্রাস করিয়া রাশিয়া তুর্কীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, ইহা মনে করিয়া তুর্কী ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে তুর্কী পরাজিত

হইল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুচুক কাইনার্জির সন্ধি (Treaty of Kutchuk Kainardji) দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইল। আজভ এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল, কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে তুর্কী-অধিকার বিলুপ্ত হইল, রাশিয়া তুর্কীর কতৃত্বাধীন সমুদ্রে বাণিজ্যপোত প্রেরণের অধিকার লাভ করিল, তুর্কী ওয়ালাচিয়া-মোল্ডাভিয়া অঞ্চলে (Wallachia-Moldavia : ভবিষ্যতে এই দুইটি প্রদেশে সম্মিলিত হইয়া রুমানিয়া রাজ্য গঠন করে) সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিল এবং রাশিয়া কনস্ট্যান্টিনোপল শহরে অবস্থিত কয়েকটি গির্জার রক্ষক (protector) রূপে স্বীকৃত হইল। রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং তুর্কী সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদে কুচুক কাইনার্জির সর্তগুলি অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কুচুক কাইনার্জির সন্ধি (১৭৭৪)

অস্ট্রিয়ার অধিপতি, পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট (Holy Roman Emperor) দ্বিতীয় জোসেফ দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের ন্যায় তিনিও তুর্কী সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া অস্ট্রিয়ার অধিকার প্রসারের চেষ্টা করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিন জোসেফের পরোক্ষ সাহায্যের সুযোগ লইয়া সমগ্র ক্রিমিয়া অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন ; তুর্কী এই ক্ষতি মানিয়া লইতে বাধ্য হয় (Treaty of Constantinople)। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিন এবং জোসেফ একসঙ্গে ক্রিমিয়ায় ভ্রমণ করেন। ইহা দ্বারা তুর্কী এবং সমগ্র ইউরোপের নিকট রাশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার মিত্রতা স্পষ্টীকৃত হইল। অতঃপর মিত্রশক্তিদ্বয় সম্মিলিত ভাবে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জোসেফের মৃত্যুর পর (১৭৯০) জ্যাসির সন্ধি (Treaty of Jassy) দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিল (১৭৯১)। অস্ট্রিয়ার কোন লাভ হইল না। রাশিয়ার সীমা নীস্টার (Dneister) নদী পর্যন্ত প্রসারিত হইল।

ক্রিমিয়া অধিকার

রাশিয়ার দিক হইতে বিচার করিলে তুর্কীর প্রতি ক্যাথারিনের নীতি তিনটি ফল প্রসব করিয়াছিল। প্রথমতঃ, রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূল পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়া স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমা (natural boundary) লাভ করিল এবং কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার নৌবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইল। ইহা ছাড়া রাশিয়ার বাণিজ্য জাহাজ তুর্কীর অন্তর্ভুক্ত বোস্ফোরাস (Bosphorus) ও দার্দানেলিস (Dardanelles) প্রণালী অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের অধিকার পাইল ;

ক্যাথারিনের নীতির সাফল্য

পশ্চিম ইউরোপের সহিত রাশিয়ার বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ, তুর্কীর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রজারা সুলতানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে নিজেদের রক্ষক রূপে গণ্য করিতে শিখিল। ইহার ফলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুবিধা হইল। তৃতীয়তঃ, কন্স্ট্যান্টিনোপল শহরে অবস্থিত কয়েকটি গির্জা সম্বন্ধে কুচুক কাইনার্জির সন্ধিতে রাশিয়াকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল তাহা রাশিয়া ক্রমে সমগ্র তুর্কী সাম্রাজ্যে প্রযোজ্য বলিয়া দাবি করিল। ইহাতে তুর্কীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার একটি সুন্দর সুযোগ রাশিয়ার হস্তগত হইল।

ক্যাথারিন তুর্কী সাম্রাজ্যের এতখানি অনিষ্ট করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, তুর্কী সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলোপ করিয়া তাহার স্থানে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল নূতন গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপনের অদ্ভুত কল্পনা তাঁহাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। যে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য তুর্কীরা ধ্বংস করিয়াছিল তাহার অপর নাম ছিল গ্রীক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের যে রূপ প্রচলিত ছিল তাহার নাম ছিল 'গ্রীক খ্রীষ্টধর্ম' (Greek Christianity) বা 'গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম' (Orthodox Christianity)। রাশিয়াতেও খ্রীষ্টধর্মের এই বিশেষ রূপটি প্রচলিত ছিল। তাই ক্যাথারিন রাশিয়াকে বিলুপ্ত পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী রূপে গণ্য করিতেন। তাঁহার পৌত্রকে গ্রীকরীতি অনুসারে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত (baptized) করা হইয়াছিল এবং গ্রীক ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। রাশিয়ার সৈন্যদলে গ্রীকভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন, ইহা বুঝাইবার জন্য একটি পদক (medal) বিতরণ করা হইয়াছিল। কন্স্ট্যান্টিনোপলের প্রধান মসজিদটি বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত হইতেছে—এইরূপ একটি চিত্র ঐ পদকে ক্ষোদিত ছিল। ক্যাথ্যারিনের এই স্বপ্ন সফল হয় নাই, কিন্তু কনস্ট্যান্টিনোপল দখলের কল্পনা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত সযত্নে পোষণ করিয়াছিলেন।

ক্যাথারিনের সুদূর-প্রসারী কল্পনা

প্রাচ্য সমস্যা (Eastern Question) : তুর্কী সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে যে সকল রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদিগকে সম্মিলিত ভাবে 'প্রাচ্য সমস্যা' বলা হয়। ক্যাথারিনের নীতি এই সমস্যাকে একটি মোটামুটি সুনির্দিষ্ট রূপ দান করে। তুর্কী সাম্রাজ্য যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে তবে তুর্কী-শাসন হইতে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে কি রাজনৈতিক

ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে—ইহাই ছিল মূল প্রশ্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া তুর্কী হইতে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিতে স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত তাহারা এই চেষ্টা ত্যাগ করে নাই। কোন কোন সময় অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া তুর্কীর অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

অষ্টাদশ শতাব্দী

উনবিংশ শতাব্দীতে 'প্রাচ্য সমস্যার' দুইটি নূতন দিক দেখা গেল। প্রথমতঃ, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, মিশরে এবং পশ্চিম এশিয়ায় নিজেদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যসংক্রান্ত স্বার্থ রক্ষার জন্য দুর্বল তুর্কী সাম্রাজ্যের রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। ফলে রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার সহিত তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। দ্বিতীয়তঃ, ফরাসী বিপ্লবের পরে জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের আদর্শ তুর্কী সাম্রাজ্যের নির্যাতিত খ্রীষ্টান প্রজাদের মনে নূতন প্রেরণা আনিল, তাহারা বিদ্রোহের পথে স্বাধীনতা অর্জনে প্রয়াসী হইল। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া গ্রীস, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল; তুর্কী সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দী

খ্রীষ্টান জাতিগুলির স্বাধীনতা লাভ একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল। তাহারা এত দুর্বল ছিল যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহারা কোন বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী হইত। সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়ার সহিত রাশিয়ার জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বন্ধন ছিল। এই সকল দেশে অধিকাংশ অধিবাসী জাতিতে শ্লাভ (Slav) এবং ধর্মে গ্রীক খ্রীষ্টান (Greek Christian) ছিল; ইহাদের ভাষাও শ্লাভ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তুর্কীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি রাশিয়ার সহানুভূতি ও সাহায্য পাইত। স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতঃই এই সকল দেশে রাশিয়ার প্রভাব প্রবল হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স সহ্য করিতে পারিত না। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে প্রবল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চলিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনেকাংশে এই প্রতিযোগিতার ফল।

নেপোলিয়নের যুগে তুর্কী সাম্রাজ্যঃ নেপোলিয়ন যখন তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মিশর আক্রমণ করেন (১৭৯৮) তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যের পথ রোধ করা। টিলসিটের সন্ধির

(Treaty of Tilsit) ফলে নেপোলিয়নের সহিত মিত্রতাবদ্ধ রুশ সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার পূর্ব ইউরোপে বিনা বাধায় রাজ্যবিস্তারের সুযোগ পাইলেন। তুর্কীর সহিত পাঁচ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে প্রাথ (Pruth) নদী পর্যন্ত রাশিয়ার সীমা প্রসারিত হইল (Treaty of Bucharest, ১৮১২)। তুর্কীর ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগে এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে সার্ভিয়ায় এবং গ্রীসে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) এবং স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া উঠিল। সার্ভিয়ায় বিপ্লবের নেতা ছিলেন কারাজর্জ (Karageorge) নামক জনৈক কৃষক। তিনি রাশিয়ার সাহায্যে সাময়িক সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত স্বদেশ স্বাধীন করিতে পারেন নাই। অতঃপর মিলোস অব্রেনোভিক (Milos Obrenovic) নামক অপর এক নেতার অধীনে সার্ভিয়া আংশিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে। কিন্তু গ্রীসে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

গ্রীসের স্বাধীনতা ঃ গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম (Greek War of Independence, ১৮২১-১৮২৯) প্রাচ্য সমস্যার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করে। তুর্কীর অধীন খ্রীষ্টান জাতিগুলির মধ্যে গ্রীকেরাই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা লাভ করে। পরে অন্যান্য খ্রীষ্টান জাতি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দ্বারা তুর্কী সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীস তুর্কীর শাসনাধীন হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্যান্য খ্রীষ্টান প্রজাদের অপেক্ষা গ্রীকদের অবস্থা উন্নত ছিল। গ্রীক বণিকেরা তুর্কী সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের একটি বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণ করিত। যে সকল সরকারী চাকুরিতে খ্রীষ্টানদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল না সেই সকল চাকুরির বেশীর ভাগই গ্রীকদিগকে দেওয়া হইত। গ্রীসে শিক্ষিত এবং মোটামুটি সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল। অত্যাচারী, বিধর্মী তুর্কীদের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গ্রীসের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য জাতীয়তাবাদী দল বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীসের জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না ; প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গ্রীক জাতীয়তাবাদের প্রধান নায়ক ছিলেন কোরাইস (Korais) এবং রিগাস (Rhigas)। তাঁহারা

গ্রীক জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি

উভয়েই সাহিত্যিক ছিলেন এবং ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ভাবধারায় প্লাবিত হইয়াছিলেন। ইটালীর 'কার্বোনারি'র মত গ্রীসেও একটি প্রভাবশালী গুপ্ত সমিতি (Hetaira Philike) গঠিত হইয়াছিল।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীর অধীন মোল্‌ডাভিয়া (Moldavia) প্রদেশের গ্রীকজাতীয় শাসনকর্তা আলেকজাণ্ডার ইপ্‌সিলান্টি (Alexander Ypsilanti) গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তিনি রাশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডারের নিকট হইতে সাহায্য প্রত্যাশা করেন, কিন্তু বিপ্লববিরোধী মেটারনিকের পরামর্শে আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন।

গ্রীসে বিদ্রোহ

তুর্কীরা ইপ্‌সিলান্টির বিদ্রোহ দমন করে। অতঃপর গ্রীসে এবং এশিয়া মাইনরে খ্রীষ্টানদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হয়। মেটারনিক কোনক্রমেই বিদ্রোহীদিগকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আলেকজাণ্ডার তুর্কীর অনিষ্ট কামনা করিলেও স্বয়ং স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন ; তাঁহার পক্ষে প্রজাবিদ্রোহের সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রীকদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখাইল। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন (Lord Byron) গ্রীসে যুদ্ধ করিতে গিয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন।

রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার গ্রীকবিরোধী নীতি সত্ত্বেও গ্রীসে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সুলতানের অনুরোধে মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা অভূতপূর্ব বর্বরতার সহিত বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিলেন। ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন আসিল। আলেকজাণ্ডারের

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ

মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম নিকোলাস তুর্কীর শক্তি খর্ব করিবার জন্য গ্রীসের সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসে শান্তিস্থাপনের জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া চুক্তিবদ্ধ হইল (Treaty of London)। তুর্কী শান্তিস্থাপনে অস্বীকৃত হইল। নাভারিনো (Navarino) নামক স্থানে তুর্কীর সহিত মিত্রশক্তির নৌ-সংঘর্ষ ঘটিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়ার সৈন্যদল বিজয়গর্বে কনস্ট্যান্টিনোপলের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তুর্কী বাধ্য হইয়া শান্তি স্থাপন করিল।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি (Treaty of Adrianople) দ্বারা তুর্কী গ্রীসের স্বাধীনতা এবং সার্ভিয়া ও রুমানিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

স্বীকার করিল। সার্ভিয়ায় অব্রেনোভিক বংশের বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। রুমানিয়ায় কার্যতঃ রাশিয়ার অভিভাবকত্ব স্বীকৃত হইল। জর্জিয়া এবং ককেশাস (Caucasus) অঞ্চলে রাশিয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে জাতীয়তাবাদের জয় হইল, তুর্কীর শক্তিহ্রাস এবং রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হইল। গ্রীসে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

গ্রীসের সাফল্য

মিশর ঃ মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদ আলি নামে তুর্কীর সুলতানের অধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকাল (১৮০৫-১৮৪৯) স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার নিজস্ব সৈন্যদল এবং নৌ-বাহিনী ছিল। গ্রীসে বিদ্রোহ দমনের জন্য তুর্কীর সুলতান তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম পাশা সুলতানের শাসনাধীন সিরিয়া আক্রমণ করেন। এই বিপদে সুলতান রাশিয়ার সহায়তা গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত সুলতান মহম্মদ আলিকে সিরিয়া এবং মেসোপোটেমিয়ার একাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। রাশিয়া সাহায্য দানের পুরস্কার স্বরূপ তুর্কীর উপর সামরিক প্রভুত্ব লাভ করিল (Treaty of Unkiar-Skelessi, ১৮৩৩)। রাশিয়ার রণতরী বোসফোরাস এবং দার্দানেলিস প্রণালীর মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরে প্রবেশের অবাধ অধিকার পাইল। কৃষ্ণ সাগর সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে আসিল।

মিশরের ও রাশিয়ার লাভ

১৮৩৯ গ্রীষ্টাব্দে তুর্কীর সুলতান সিরিয়া পুনরায় অধিকার করিবার জন্য মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৮৪১ গ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়। মহম্মদ আলি সিরিয়া সুলতানকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং সুলতানের অধীনে মিশরের বংশানুক্রমিক শাসক রূপে স্বীকৃত হইলেন। বোসফোরাস এবং দার্দানেলিস প্রণালীতে রুশ রণতরী প্রবেশের ব্যবস্থা বাতিল করা হইল। তুর্কী ও মিশরের এই সংঘর্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। তুর্কী নিজের দুর্বলতা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের সাহায্যে মিশরের শত্রুতা এবং রাশিয়ার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ড প্রত্যক্ষ ভাবে তুর্কীর বন্ধু এবং রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রাচ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

তুর্কীর আত্মরক্ষা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (The Crimean War, ১৮৫৪-১৮৫৬) ঃ তুর্কী-মিশর

সংঘর্ষের পর রাশিয়া বুঝিতে পারিল যে ইংলণ্ডের সহযোগিতা ব্যতীত 'প্রাচ্য সমস্যা'র সমাধান হইবে না, তুর্কীর দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাশিয়া কোন সুবিধা আদায় করিলে ইংলণ্ড তাহা মানিয়া লইবে না।

রাশিয়ার প্রস্তাব

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সম্রাট প্রথম নিকোলাস প্রস্তাব করিলেন যে তুর্কী "ইউরোপের রোগী" ("sick man of Europe") হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং রোগীর মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির বিভাগ সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন। ইংলণ্ড এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিল না। ফলে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার সম্মিলিত প্রভাবে 'প্রাচ্য সমস্যা' সমাধানের সম্ভাবনা রহিল না।

যুদ্ধের কারণ

কয়েক বৎসর পরে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্যালেস্টাইনে খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থানগুলির কর্তৃত্ব সম্বন্ধে রোমান ক্যাথলিক বা ল্যাটিন (Latin) এবং গ্রীক বা গোঁড়া (Greek, Orthodox) সন্ন্যাসীদের (monks) মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। আইন অনুসারে এই বিরোধ মীমাংসার ভার ছিল তুর্কী সরকারের উপর। কিন্তু ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ল্যাটিন সন্ন্যাসীদের দাবি সমর্থন করিবার জন্য তুর্কীর উপর চাপ দিলেন। এই দাবি স্বীকৃত হইলে মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসী-প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া রাশিয়া ইহার বিরোধিতা করিল। কিন্তু তুর্কী সরকার মোটামুটি ল্যাটিন সন্ন্যাসীদের দাবি মানিয়া লইল। তখন রাশিয়া এই ব্যবস্থা বাতিল করিবার জন্য তুর্কীর উপর প্রবল চাপ দিল। দুর্ভাগ্যক্রমে রাশিয়া তীর্থস্থানগুলি সম্বন্ধে নিজের দাবি সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তুর্কীর সকল গ্রীক-খ্রীষ্টান প্রজার উপর অভিভাবকত্ব দাবি করিল। এই দাবির ভিত্তি ছিল কুচুক কাইনার্জির সন্ধির অপব্যাখ্যা। ইহা স্বীকৃত হইলে তুর্কী প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইত। তুর্কীর উপর চাপ দিবার জন্য রাশিয়ার সৈন্যদল রুমানিয়া অধিকার করিল। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও তুর্কী সম্মিলিতভাবে রাশিয়াকে বাধা দিল। পরে পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া রাশিয়ার বিপক্ষে যোগ দিল। দক্ষিণ রাশিয়ার অন্তর্গত ক্রিমিয়া উপদ্বীপে যুদ্ধক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল। রাশিয়ার অন্তর্গত সিবাস্টোপোলের (Sebastopol) পতন এই যুদ্ধের প্রধান ঘটনা।

দুই বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপিত হইল (Treaty of Paris, ১৮৫৬)।

রাশিয়া যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তুর্কীর অস্তিত্ব বজায় রহিল। ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গ তুর্কীর রাজ্যসীমা এবং স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। সুলতান খ্রীষ্টান প্রজাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিনিময়ে প্রধান শক্তিবর্গ তুর্কীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। কৃষ্ণসাগর নিরস্ত্রীকরণের (neutralization) ব্যবস্থা করা হইল এবং এই সাগরে সকল জাতির বাণিজ্য জাহাজের প্রবেশের অধিকার রহিল। ইহাতে রাশিয়ার নৌ-বল খর্ব হইল, কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। রুমানিয়া ও সার্ভিয়া কার্যতঃ তুর্কীর কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইল। রুমানিয়াতে রাশিয়ার অভিভাবকত্বের বিলোপ ঘটিল।

যুদ্ধের ফল

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তিবর্গ একটি বিরাট নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিল। তুর্কীর সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়া এবং তুর্কীর আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহারা পরোক্ষভাবে তুর্কীর খ্রীষ্টান প্রজাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য দায়ী হইল। কিন্তু পরে তুর্কী খ্রীষ্টান প্রজাদের মঙ্গলজনক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। তাই একজন ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ড অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছিল।" ("England backed a wrong horse.")।

প্যারিসের সন্ধি রাশিয়ার স্বার্থহানি ও মর্যাদাহানি করিয়াছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্বের দাবি টিকিল না। "ইউরোপের রোগী" মৃত্যুর পথে না গিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যে বাঁচিয়া রহিল। কৃষ্ণসাগরের নিরস্ত্রীকরণে পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডের জয় ঘোষিত হইল। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে (যখন ইউরোপ ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের উপলক্ষ্যে বিব্রত ছিল) রাশিয়া ঘোষণা করিল যে কৃষ্ণসাগরের নিরস্ত্রীকরণ বাতিল করা হইল ; ইংলণ্ড ইহাতে বাধা দিতে পারিল না।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের কোন লাভ হইল না, কিন্তু ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হইলেন। যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায় এবং প্যারিসে শান্তিবৈঠকের অনুষ্ঠান হওয়ায় তাঁহার মর্যাদা বাড়িল। ফ্রান্সের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার আসন সুদৃঢ় হইল।

পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়া প্যারিস বৈঠকে আসন পাইল, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বীকৃত হইল। কাভূর তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের

সহিত যুক্ত করিলেন। অস্ট্রিয়ার সহিত পীডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের যোগদান ইহারই পরিণতি।

বার্লিন কংগ্রেস (Berlin Congress) ঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে তুর্কী আপাততঃ রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শাসন-সংস্কার প্রবর্তন দ্বারা খ্রীষ্টান প্রজাদের দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করিল না। ফলে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোস্‌নিয়া (Bosnia) ও হার্জিগোভিনা (Herzegovina) প্রদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল ; ক্রমে ইহা সার্ভিয়া, মণ্টেনিগ্রো (Montenegro) এবং বুলগেরিয়াতে ছড়াইয়া পড়িল। তুর্কী সৈন্যদল বিদ্রোহ দমনের জন্য নির্মম অত্যাচার আরম্ভ করিল। বুলগেরিয়াতে অকথ্য অত্যাচারের ("Bulgarian atrocities") কাহিনী সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভিয়া এবং মণ্টেনিগ্রো তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাশিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নির্যাতিত খ্রীষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (Russo-Turkish War, ১৮৭৭-১৮৭৮) এবং সহজেই তুর্কী সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া সুলতানকে স্যান স্টিফানোর সন্ধিপত্র (Treaty of San Stephano) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল। এই সন্ধিপত্রের সর্তগুলি প্রতিপালিত হইলে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত। এই ব্যবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ইংরেজদের স্বার্থ বিপন্ন হইবে মনে করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলী (Disraeli) রুশ-তুর্কী সন্ধি মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে সমগ্র 'প্রাচ্য সমস্যা' সম্বন্ধে একটি ইউরোপীয় বৈঠকে আলোচনা করা হউক। এই ব্যবস্থা রাশিয়ার স্বার্থ ও মর্যাদার বিরোধী হইলেও যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া তিনি রাশিয়াকে ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য করিলেন। রাশিয়ার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ অস্ট্রিয়া ইংলণ্ডকে সমর্থন করিল। জার্মানীর পক্ষে বিসমার্ক রাশিয়ার অসন্তুষ্টি উপেক্ষা করিয়া অস্ট্রিয়ার পক্ষে দাঁড়াইলেন। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সম্মিলিত প্রতিরোধের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি রাশিয়ার ছিল না।

তুর্কী সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ

ইংলণ্ডের নীতি

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্যের রাজধানী বার্লিনে বৃহৎ শক্তিবর্গের কংগ্রেস বসিল, জার্মানীর প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক ইহার সভাপতি হইলেন। রাশিয়া ও

তুর্কীর মধ্যে স্তান স্টিফানোতে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা বাতিল হইল ; নূতন সন্ধিপত্র (Treaty of Berlin) রচিত হইল। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বোস্‌নিয়া ও হার্জিগোভিনা প্র দে শ নামে মাত্র সুলতানের অধীনে রাখিয়া কার্যতঃ অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন করা হইল। ইহা অস্ট্রিয়ার সহিত জার্মানীর বন্ধুত্বের পুরস্কার। ইহাতে সার্ভিয়া অসন্তুষ্ট হইল, কারণ এই দুইটি প্রদেশের সহিত সার্ভিয়ার জাতিগত ও ভাষাগত ঐক্য ছিল এবং প্রদেশ দুইটি সার্ভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হউক—ইহাই জাতীয়তাবাদীদের কাম্য ছিল। সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও মণ্টেনিগ্রো তুর্কীর কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। রুমানিয়া হইতে বেসারেবিয়া (Bessarabia) প্রদেশটি বিচ্ছিন্ন করিয়া রাশিয়াকে দেওয়া হইল, বিনিময়ে রুমানিয়া পাইল ডব্রুজা (the Dobrudja) প্রদেশের অংশ।

বার্লিনের সন্ধি

বুলগেরিয়া দুইটি প্রদেশে (Bulgaria এবং Eastern Rumelia) বিভক্ত হইল, কোনটিই পূর্ণ স্বাধীনতা পাইল না। বুলগেরিয়া তুর্কীর সার্বভৌমত্বের (suzerainty) অধীনে স্বাধীন রাজ্য হইল ; পূর্ব রুমেলিয়া সুলতানের অধীন রহিল, কিন্তু এই প্রদেশ শাসনের জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশ্বাসভাজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। স্তান স্টিফানোর সন্ধিতে ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়া স্থাপনের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা বাতিল করা হইল। সাইপ্রাস দ্বীপ তুর্কীর হস্তচ্যুত হইয়া বিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। জার্মানী কোন রাজ্যখণ্ড গ্রহণ করিল না, বিসমার্ক 'সাধু দালাল' ("honest broker") রূপে অস্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ডের সহায়তা করিলেন।

বার্লিন সন্ধির ফলে তুর্কী সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি হইলেও ইহা আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাববৃদ্ধি স্থগিত হইল। সুতরাং ইংলণ্ডের দিক হইতে সন্ধিটি বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল। তদুপরি সাইপ্রাস অধিকার তো ছিলই। এজন্য ডিজে্‌রেলী বলিয়াছিলেন যে তিনি সম্মানজনক সর্তে শান্তি রক্ষা ("Peace with Honour") করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের খ্রীষ্টান জাতিগুলির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইল না। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে জাতীয়তাবাদের জয় সম্পূর্ণ হইল না, বোধহয় হওয়া সম্ভবও ছিল না—কারণ এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সংমিশ্রণ এমনভাবে

বার্লিন সন্ধির ত্রুটি

ঘটিয়াছিল যে এক ভাষাভাষী জনসমষ্টি দ্বারা এক রাজ্য গঠনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করা সাধ্যাতীত ছিল।

যাহা হউক, বার্লিন সন্ধি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই ; পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার অনেকগুলি সর্ত বাতিল করিতে হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়ার দুই অংশ সম্মিলিত হইয়া এক রাজার শাসনাধীন হইল এবং তুর্কীর কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইল ; প্রকাশ্য স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। রাশিয়া নূতন বুলগেরিয়ায় প্রভাব স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। সুতরাং বুলগেরিয়ায় ঐক্য রাশিয়ার স্বার্থের অনুকূল এবং ইংলণ্ডের স্বার্থের প্রতিকূল হইল না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনা প্রদেশে তুর্কীর নামমাত্র আধিপত্য বিলোপ করিয়া ঐ অঞ্চলটি হাপ্‌স্‌বুর্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিল। তুর্কীতে ক্রমশঃ জার্মান-প্রভাব প্রবল হইল, দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের সহায়তা লাভ করিয়াও তুর্কী ইংলণ্ডের অনুগত রহিল না। এইদিক হইতে ইংলণ্ড বার্লিন সন্ধির সুফল অনেকটা হারাইল।

তুর্কী সাম্রাজ্য (১৮৭৮-১৯১৪) ঃ বার্লিন সন্ধির পরে কুড়ি বৎসরের মধ্যে বুলগেরিয়ায় এবং বোসনিয়া-হার্জিগোভিনায় তুর্কীর নামমাত্র আধিপত্য বিলুপ্ত হয় এবং ক্রীটদ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া গ্রীসের সহিত সম্মিলিত হয়। ইতিমধ্যে তুর্কীর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তাহার পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত হইতেছিল।

জার্মানী ও তুর্কী

বিসমার্ক তুর্কীতে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের (১৮৯০) পর দ্বিতীয় উইলিয়মের পরিবর্তিত নীতির ফলে তুর্কীর সুলতান কার্যতঃ জার্মানীর আনুগত্যমূলক বন্ধুত্ব স্বীকার করেন। জার্মান সেনাপতিগণ তুর্কী বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করেন। তুর্কী সরকারের সম্মতি লইয়া জার্মানী বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত রেলওয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা সফল হইলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইত। তুর্কীতে জার্মান-প্রভাব প্রতিষ্ঠার ফলে ইংলণ্ড তুর্কীর প্রতি মৈত্রীভাব পরিত্যাগ করিল এবং রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের সৌহার্দ্য স্থাপন (Anglo-Russian Convention, ১৯০৭) সম্ভব হইল।

জার্মানীর সহিত সংযোগ স্থাপনের ফলে তুর্কীর পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত হইলেও তাহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূর হয় নাই। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে "নব্য তুর্কী"

দল (Young Turks) বিপ্লব দ্বারা সুলতানের স্বৈরাচারী শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাইল। পর বৎসর বিপ্লবীরা সুলতান আবদুল হামিদকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইল। এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া বুলগেরিয়া স্বাধীন হইল, ক্রীট দ্বীপ (Crete) গ্রীসের সহিত যোগ দিল এবং অস্ট্রিয়া বার্লিন সন্ধির (১৮৭৮) সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া বোস্‌নিয়া ও হার্জিগোভিনা প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিল।

অস্ট্রিয়ার এই কার্যে প্রকৃতপক্ষে তুর্কীর তেমন কোন ক্ষতি হইল না, কারণ এই দুইটি প্রদেশ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন ছিল। কিন্তু স্বাধীন সার্ভিয়া রাজ্য আশা করিয়াছিল যে এই দুইটি প্রদেশ কোন দিন দুর্বল তুর্কী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সার্ভিয়ার সহিত যোগ দিবে, কারণ এই দুইটি প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত সার্ভিয়ার অধিবাসীদের জাতিগত ও ভাষাগত ঐক্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে বোস্‌নিয়া ও হার্জিগোভিনা অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে সার্ভিয়ার জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ হইত না। সুতরাং সার্ভিয়া আশাভঙ্গে মর্মাহত হইল, কিন্তু জার্মানীর সাহায্যে বলীয়ান অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করিতে সাহসী হইল না।

অস্ট্রিয়া ও সার্ভিয়া

তুর্কীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের যে সকল জাতি স্বাধীন হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না; জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত সংঘর্ষ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯১২-১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বলকান উপদ্বীপে দুইটি যুদ্ধ (First and Second Balkan Wars) ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের ফলে তুর্কী সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল, গ্রীসের লাভ হইল সবচেয়ে বেশী। সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোও লাভবান হইল। সার্ভিয়ার রাজ্যসীমা প্রসারণ ও শক্তিবৃদ্ধি অস্ট্রিয়া এবং জার্মানীর পক্ষে অসুবিধার কারণ হইল।

বলকান যুদ্ধ

সপ্তম অধ্যায়

ইউরোপ (১৮৭৮-১৯১৪)

১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও ইটালীর ঐক্য স্থাপিত হইলে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের সন্ধি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ পরিষ্কার করে। এই সকল পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই যুগের পরিণতি ঘটে।

সাধারণতঃ এই যুগকে 'অস্ত্রসজ্জিত শান্তির যুগ' (Age of Armed Peace) বলা হয়। বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে এই যুগে ইউরোপে মোটের উপর শান্তি বিরাজিত ছিল। ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে যে দুইটি বল্‌কান যুদ্ধ (Balkan Wars) ঘটিয়াছিল। তাহা তেমন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ নহে; প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভায মাত্র। কিন্তু শান্তির অন্তরালে ইউরোপ ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় স্বার্থ প্রসারের জন্য সামরিক বল প্রয়োগের ইচ্ছা ইউরোপকে যুদ্ধের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। ইউরোপে আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার সহিত ইউরোপের বাহিরে—বিশেষতঃ আফ্রিকায়—সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা যুক্ত হইয়াছিল।

পরাজিত ফ্রান্স: ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে (Franco-Prussian War) ফ্রান্সের পরাজয়ের (১৮৭০-৭১) ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন সিংহাসনচ্যুত হইলেন, ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (Second Empire) স্থানে তৃতীয় সাধারণতন্ত্র (Third Republic) স্থাপিত হইল, আলশাস-লোরেন প্রদেশ দুইটি ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইল এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ফ্রান্স জার্মানীকে প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হইল। ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খর্ব হইল। প্রায় দুইশত বৎসর কাল ইউরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্র ছিল প্যারিস; এই যুদ্ধের ফলে সেই কেন্দ্র বার্লিনে স্থানান্তরিত হইল। ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্যে (balance of power) পরিবর্তন ঘটিল। নবস্থাপিত জার্মান সাম্রাজ্য শক্তিতে ও প্রভাবে ইউরোপে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল।

ফ্রান্সের পরাজয়ের ফল

কিন্তু পরাজিত ফ্রান্স অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই পরাজয়ের ক্ষতি ও গ্লা
হইতে মুক্তিলাভ করিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইল, রাজত
পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্স গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইল। যুদ্ধের পর তি
বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই জার্মানীর ক্ষতিপূরণের দাবি সম্পূর্ণ মিটাই
দেওয়া হইল, যে জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে মোতায়েন রাখা হইয়াছিল তাহা স্বদে
প্রত্যাবর্তন করিল। এই দুর্দিনে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলে
থীয়ার্স (Thiers)।

বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ নীতিঃ জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন বিসমার্কে
অক্ষয় কীর্তি। সাম্রাজ্য স্থাপনের পর সমগ্র জার্মানীর শাসনভার দীর্ঘকা
(১৮৭১-১৮৯০) কার্যতঃ তাঁহার হস্তগত ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতী
উইলিয়মের সহিত মতবিরোধের ফলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর (Chancellor) প
পরিত্যাগ করেন।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে বিসমার্ক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না
সুতরাং জাতীয় প্রতিনিধি-সভার (Reichstag) সহিত নানা বিষয়ে তাঁহা
মতানৈক্য ও সংঘর্ষ ঘটিত। ক্যাথলিকদের সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ ঘ
তাহাকে 'সভ্যতার জন্য সংগ্রাম' (Kulturkampf) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে
বিসমার্ক মনে করিতেন যে ক্যাথলিকগণ পোপের প্রভাবে
জাতীয়তাবিরোধী এবং জার্মানীর স্বার্থবিরোধী মতবাদ
পোষণ করে। পোপের প্রতি অনুগত ক্যাথলিক
রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব তিনি জার্মান সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক বলি
মনে করিতেন। প্রথমে তিনি ক্যাথলিকদের দমনের জন্য কঠোর আইন প্রবর্ত
করেন, পরে সমাজতন্ত্রবাদী দলের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ আরম্ভ হইলে তি
ক্যাথলিকদের সহিত আপোষ-মীমাংসা করেন।

ক্যাথলিকদের সহি
সং

সমাজতন্ত্রবাদী দলের (Social Democrats) সহিত বিসমার্কের সংগ্রা
দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। এখানে তিনি আপোষ-মীমাংসার পথে না গি
কঠোর আইন ও শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা বিরোধী দলকে দমন করিবার চেষ্টা করেন
কিন্তু তিনি কেবলমাত্র দমন নীতি অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শ্রমিকদে
অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে
নানা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রই শ্রমিকদের
স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলসাধন করিবে—এই নীতিতে বিসমার্কের আস্থা ছিল। ইউরো

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্র

বিসমার্কই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রবাদের (State Socialism) প্রথম প্রবর্তক। তাঁহার প্রবর্তিত উদার ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকেরা পীড়িত বা দুর্ঘটনায় আহত হইলে সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য পাইত, বার্ধক্যবশতঃ কাজ করিতে অক্ষম হইলে সরকার তাহাদের ভরণপোষণে সাহায্য করিত। সেকালে ইউরোপের আর কোন দেশে শ্রমিকেরা এই সকল সুবিধা পাইত না। কিন্তু বিসমার্কের এই নীতি সমাজতন্ত্রবাদী দলের প্রভাব খর্ব করিতে পারে নাই।

বিসমার্কের সুদীর্ঘ শাসনকালে জার্মানীর শিল্প ও বাণিজ্য অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করিয়াছিল, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জার্মান জাতির রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। জার্মান শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য বিসমার্ক স্বাধীন বাণিজ্যের (Free Trade) নীতি পরিত্যাগ করিয়া রক্ষণনীতি (Protection) গ্রহণ করেন।

বিসমার্ক প্রথমে ইউরোপের বাহিরে জার্মানীর উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু পরে দেখা গেল যে শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জার্মানীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য নূতন ক্ষেত্র প্রয়োজন। এশিয়ায় ইতিমধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তাই আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে জার্মানী ঔপনিবেশিক অধিকার স্থাপন করিল। বিসমার্কের যুগেই জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৭১-৯০) ঃ ফ্রান্স ঃ বিসমার্ক মনে করিয়াছিলেন যে ফ্রান্স পরাজয়ের ফলে দীর্ঘকাল দুর্বল হইয়া থাকিবে এবং এই দুর্বলতার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করা ফরাসী জাতির পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু ফ্রান্স অল্পদিনের মধ্যেই হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া তাঁহার মনে আশঙ্কার সঞ্চার করিল। তিনি মনে করিলেন যে ফ্রান্স প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য এবং আলশাস-লোরেন পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে আবার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা যে একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল তাহা নহে। ফ্রান্সে উগ্র জার্মান-বিরোধী দলের অভাব ছিল না, একাধিকবার ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হইয়াছিল। তাই বিসমার্ক ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সকে নির্বান্ধব (isolated) এবং দুর্বল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সই জার্মানীর প্রধান শত্রু, ইহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। মিশরে

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থসংঘর্ষের সুযোগ লইয়া তিনি ঐ দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্যের পথ পরিষ্কার করিলেন। ইটালীকে আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারে উৎসাহিত করিয়া তিনি ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষের সৃষ্টি করিলেন। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সহিত জার্মানীর মৈত্রী স্থাপন করিয়া তিনি এই দুইটি দেশের সহিত ফ্রান্সের বন্ধুতা স্থাপনের সম্ভাবনা দূর করিলেন। এইরূপে বিসমার্কের কূটনীতির ফলে ফ্রান্স ইউরোপে বন্ধুহীন হইল, ফরাসী আক্রমণে জার্মানীর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দূর হইল।

বিসমার্কের পদত্যাগের পর জার্মানীর রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিল। নূতন সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম (১৮৮৮-১৯১৮) বিসমার্কের ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার ভ্রান্ত নীতির ফলে রাশিয়া এবং ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর বিচ্ছেদ ঘটিল। ফ্রান্স জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য রাশিয়া এবং ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা করিল (Triple Entente)। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে এই দুই দেশের সহায়তা পাইল।

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৭১-৯০) : দ্বিশক্তির সন্ধি (Dual Alliance) ও ত্রিশক্তির সন্ধি (Triple Alliance) : জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর বিসমার্কের কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে নবস্থাপিত জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ফ্রান্সকে দুর্বল রাখিবার চেষ্টা করেন এবং ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্যও তিনি বিশেষ উৎসুক ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তিনি এই ক্ষেত্রে তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বার্লিন বৈঠকে (১৮৭৮) তিনি রাশিয়ার স্বার্থরক্ষা না করিয়া বরং অস্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তারের বন্দোবস্ত সমর্থন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার পদত্যাগ পর্যন্ত রাশিয়ার সহিত জার্মানীর তেমন অসদ্ভাব ঘটে নাই। দ্বিতীয় উইলিয়মের সময়ে রাশিয়া ক্রমশঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের দিকে সরিয়া যায় এবং তাহাদের সহিত সম্মিলিতভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

রাশিয়ার সহিত সম্বন্ধ

জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের জন্য বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ (Austro-Prussian War) করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধাবসানে তিনি বিশেষ সতর্কভাবে পরাজিত অস্ট্রিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষা করেন। অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর

অধিনায়কত্ব হইতে বিতাড়িত এবং প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন, পরাজিত অস্ট্রিয়ার রাজ্যাংশ প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন নাই। অস্ট্রিয়াও হ্যাপস্‌বুর্গ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বশতঃ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য বৃথা চেষ্টা না করিয়া প্রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করে। প্রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলে অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে (১৮৭০)।

অস্ট্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্কের চেষ্টায় জার্মানী, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সম্রাট 'ত্রয়ী মিত্রসঙ্ঘ' (Dreikaiserbund) গঠন করেন। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার স্বার্থসংঘর্ষের ফলে তিন সম্রাটের মৈত্রী স্থায়ী হয় নাই। বিসমার্ক রাশিয়া অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন। বার্লিন বৈঠকে (১৮৭৮) তাঁহার সহায়তায় অস্ট্রিয়া তুর্কীর অন্তর্গত বোস্‌নিয়া ও হার্জিগোভিনা প্রদেশের অধিকার পাইল, কিন্তু রাশিয়া তুর্কীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও হতমান হইল। ফলে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইল, অস্ট্রিয়ার সহিত জার্মানীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইল। পর বৎসর (১৮৭৯) জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এক গুপ্ত সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাই দ্বিশক্তির সন্ধি (Dual Alliance) নামে পরিচিত। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে যে কোন পক্ষ (জার্মানী বা অস্ট্রিয়া) রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ তাহাকে সামরিক সাহায্য দিতে বাধ্য রহিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানীকে শক্তিশালী করা এই সন্ধির পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল।

অস্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী

এইরূপে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মৈত্রী দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া বিসমার্ক ইটালীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে ফ্রান্সের সহিত ইটালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। সুতরাং জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইলে ইটালী তাহা ত্যাগ করিবে কেন? ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর সহিত জার্মানী-অস্ট্রিয়ার সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইল। ইউরোপের ইতিহাসে ইহা ত্রিশক্তির সন্ধি (Triple Alliance) নামে প্রসিদ্ধ। এই সন্ধি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বার স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

ইটালীর সহিত মৈত্রী

ত্রিশক্তির সন্ধি দ্বারা বিসমার্ক অস্ট্রিয়া ও ইটালীর সহযোগিতায় জার্মানীর

নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তখন পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে ছিল ; ইউরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তার উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডের সহিত রাশিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। সুতরাং এই তিনটি দেশ সম্মিলিত হইয়া জার্মানীকে আক্রমণ করিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। রাশিয়া বা ফ্রান্স পৃথকভাবে জার্মানীকে আক্রমণ করিলে ত্রিশক্তির সন্ধি কার্যকরী হইত। জার্মানীর মত ইটালীও ফরাসী আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল ; ত্রিশক্তির সন্ধি অনুসারে ইটালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানী-অস্ট্রিয়ার সামরিক সাহায্য লাভের অধিকারী হইল।

বিসমার্কের কৃতিত্ব : উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কর্ণধারগণের মধ্যে বিসমার্ক নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কূটনীতির ক্ষেত্রে তিনি যে সাফল্য লাভ করেন তাহার তুলনা নাই। প্রথমে তিনি "রক্ত ও লৌহ" নীতির (policy of "blood and iron") সমর্থক ছিলেন এবং তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে জার্মানীতে ঐক্য স্থাপন করেন। কিন্তু জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের পর তিনি ঐ নীতি পরিত্যাগ করেন এবং কেবলমাত্র কূটনীতি দ্বারা ঐ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার সুশৃঙ্খল ও সাফল্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানীর বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রেও বিসমার্কের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি গণতন্ত্রের সমর্থক না হইলেও জার্মানীতে আধা-পার্লামেন্টিয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল এবং তাঁহার শাসননীতি জার্মানীর শিল্পায়নের (industrialization) সহায়তা করিয়াছিল। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি যে ব্যবস্থা (State Socialism) প্রবর্তন করেন তাহা সেকালের ইউরোপে সম্পূর্ণ নূতন ছিল। নূতন জার্মানীর স্রষ্টা রূপে বিসমার্ক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

ত্রিশক্তির সন্ধির পরিণতি : ত্রিশক্তির সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ইহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছিল। ইটালীর সহিত অস্ট্রিয়ার মৈত্রী প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক ছিল। অস্ট্রিয়ার অধীন কোন কোন স্থানে ইটালীয় ভাষা-ভাষী লোক ছিল।

অস্ট্রিয়া ও ইটালী

তাহারা জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ইটালীর শাসনাধীন হইতে চাহিত, ইটালীও ঐ সকল স্থান পুনরধিকারের জন্য ব্যগ্র ছিল। ইহা

ছাড়া আফ্রিকায় ফ্রান্স ও ইটালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা কমিয়া গেল। ফলে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত ইটালীর মিত্রতা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইটালী প্রথমে জার্মানী-অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ না দিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল, পরে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিল। ত্রিশক্তির সন্ধি কার্যতঃ আবার দ্বিশক্তির সন্ধিতে পরিণত হইল।

জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মিত্রতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তন সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোস্‌নিয়া ও হার্জিগোভিনা প্রদেশ দুইটি স্বরাজ্যভুক্ত করিলে রাশিয়ার প্রতিবাদ সত্ত্বেও জার্মানী অস্ট্রিয়ার কার্য সমর্থন করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার বিরোধ উপস্থিত হইলে জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষে দাঁড়াইল। এই বিরোধের পরিণতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই মহাসংগ্রামে জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল।

ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Entente) : পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইউরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তার উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। ত্রিশক্তির সন্ধির প্রত্যুত্তরে—বিশেষতঃ দ্বিতীয় উইলিয়মের রাজত্ব-কালে জার্মানীর নীতির ফলে—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের মোটামুটি সদ্ভাব ছিল। বেলজিয়ম অধিকারের বাসনা প্রকাশ করিয়া তিনি ইংলণ্ডের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ (১৮৭০) উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন স্বার্থসংঘর্ষ ছিল না, কিন্তু ইউরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এই দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক ছিল। মিশরে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের সংলগ্ন সুদানে অবস্থিত ফ্যাসোডা (Fashoda) অধিকার উপলক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দুই দেশেই বৈরীভাবের পরিবর্তন ঘটিল। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে (Boer War) বুয়রদের সাফল্য কামনা করিয়া ইংলণ্ডবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিলেন। জার্মানী

শক্তিশালী নৌবহর নির্মাণ করিয়া সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের অপ্রতিহত আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিল। ইংলণ্ড আর ইউরোপে বন্ধুহীন থাকা সঙ্গত মনে করিল না। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেল্‌কাসে (Delcasse) ইংলণ্ড ও ইটালীর সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। এই সকল কারণে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কয়েকটি চুক্তি দ্বারা সকল সমস্যার মীমাংসা করিল। চুক্তি দ্বারা মিশরে ইংলণ্ডের অধিকার এবং মরক্কোতে ফ্রান্সের প্রভাব স্বীকৃত হইল; এই দুইটি দেশ সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আর বিরোধের সম্ভাবনা রহিল না। পশ্চিম আফ্রিকা, শ্যাম, মাডাগাস্কার, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে যাহাতে দুই দেশের মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষ না ঘটে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইল। পৃথিবীর সর্বত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধের পথ রুদ্ধ করিয়া ইউরোপে তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু ত্রিশক্তির সন্ধির ন্যায় কোন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল না, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কতদূর সহযোগিতা করিবে তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইল না। এইজন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এই নূতন সম্বন্ধকে বলা হয় "আন্তরিক মৈত্রী" (*Entente Cordiale*); সন্ধি দ্বারা সঙ্ঘ (Alliance) স্থাপনের সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য আছে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে জার্মানীর প্রতি বিরোধিতাই এই "আন্তরিক মৈত্রী"র প্রধান কারণ এবং উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেল, সামরিক চুক্তি না থাকা সত্বেও ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স সম্মিলিতভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মৈত্রী

উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ায় ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রাশিয়া। আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য রাশিয়া দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াছিল এবং ইহাতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিপন্ন হইতে পারে মনে করিয়া ইংলণ্ড সর্বপ্রযত্নে রাশিয়াকে বাধা দিয়াছিল। রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তানের পথে ভারত আক্রমণের আশঙ্কা দুইটি ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের প্রধান কারণ। পারস্যে, তিব্বতে এবং সুদূর প্রাচ্যে (Far East) ইংলণ্ড ও রাশিয়ার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংক্রামিত হইয়াছিল। সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে বাধা দিবার জন্য নবজাগ্রত জাপানকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ১৯০২

ইংলণ্ড ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা

খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল (Anglo-Japanese Alliance)।

কিন্তু ফ্রান্সের মত রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবলমাত্র ইউরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার রোধ করিবার জন্য তুর্কীর সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে 'প্রাচ্য সমস্যা'র (Eastern Question) বিভিন্ন স্তরে ইংলণ্ড এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এবং বার্লিন বৈঠকে ইংলণ্ড রাশিয়ার বিরোধিতা করিয়াছিল।

বিসমার্কের ফ্রান্সবিরোধী নীতি এবং জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের ইংলণ্ডবিরোধী নীতি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে মৈত্রীসূত্রে গ্রথিত করিল। বিসমার্কের পদত্যাগের (১৮৯০) অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে রাশিয়া ফ্রান্সের নিকট প্রভূত আর্থিক সাহায্য পাইয়া সৈন্যবাহিনীর উন্নতিসাধন করে এবং সাইবেরিয়ায় এক সুদীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়া সামরিক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। পর বৎসর দুই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশই জার্মানীকে শত্রুরূপে গণ্য করিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল।

ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী

কয়েক বৎসর পরে ইংলণ্ড এই মিত্রসঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী স্থাপিত হইল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি (Anglo-Russian Convention) দ্বারা আফগানিস্তানে, তিব্বতে ও পারস্যে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইল। এই চুক্তির ফলে প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডই বেশী লাভবান হইল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তুর্কী জার্মান-প্রভাবের আওতায় পড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কীকে সাহায্য করিবার প্রাচীন নীতি অনুসরণ করা ইংলণ্ডের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। এইজন্য দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সমস্যা ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মিত্রতার পথে প্রতিবন্ধক হইল না।

ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মৈত্রী

দুই সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত ইউরোপ : বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে দুইটি শক্তিসঙ্ঘ পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইল : একদিকে

সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ত্রিশক্তি (Triple Alliance), অর্থাৎ জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালী ; অপর দিকে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ত্রিশক্তি (Triple Entente), অর্থাৎ ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া। নানা ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া উভয় শক্তিসঙ্ঘে পরস্পরবিরোধী মনোভাব প্রবল হইতে লাগিল। ইউরোপ প্রায় অনিবার্য ভাবেই এক মহাসংগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

ফ্রান্স ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের বেদনা ও অপমান ভুলিতে পারে নাই। ফরাসী জাতি আলশাস-লোরেন প্রদেশ দুইটিকে ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করিত। জার্মানী ঐ দুইটি প্রদেশ সামরিক বলের সাহায্যে আত্মসাৎ করায় ফ্রান্স উহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। বিসমার্ক যে ইউরোপের রাজনীতিতে ফ্রান্সকে বন্ধুহীন ও দুর্বল করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ফরাসী জাতি ভুলিতে পারে নাই। ফ্রান্সের মনে প্রতিহিংসার (*revanche*, revenge) আগুন জ্বলিতেছিল। জার্মানীতে ইহা অজ্ঞাত ছিল না। জার্মানীও সুযোগ পাইলেই ফ্রান্সকে অপদস্থ ও দুর্বল করিতে চেষ্টা করিত।

ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা

উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত মরক্কোর সমস্যা উপলক্ষ্য করিয়া ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা উপস্থিত হইল। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেল্‌কাসে মরক্কোতে ফরাসী আধিপত্য (Protectorate) স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় ইটালী, ইংলণ্ড ও স্পেনের সম্মতি ছিল। কিন্তু জার্মানী ইহাতে বাধা দিল। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম মরক্কোর অন্তর্গত ট্যাঞ্জিয়ারে (Tangier) উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে মরক্কোর সুলতান স্বাধীন এবং তাঁহার রাজ্যে সকল বৈদেশিক শক্তির সমান অধিকার থাকিবে। জার্মানীর এই হুমকিতে ফ্রান্স নতি স্বীকার করিল। দেল্‌কাসে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং ফরাসী সরকার একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে মরক্কো সমস্যার আলোচনা করিতে স্বীকৃত হইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অন্তর্গত আলজেসিরাস নামক স্থানে আন্তর্জাতিক বৈঠক (Algeciras Conference) বসিল। এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে মরক্কো নামে স্বাধীন রাজ্য রহিল, কিন্তু কার্যতঃ সুলতানের রাজ্যে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হইল।

মরক্কো সঙ্কট

স্বভাবতঃই জার্মানী এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইল না। পরবর্তী কয়েক বৎসর মরক্কো সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে ছোটখাট বিবাদ চলিল।


নরওয়ে
ফিনল্যাণ্ড
এস্থোনিয়া
ল্যাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
ডেনমার্ক
জার্মানী
পোল্যাণ্ড
রাশিয়া
বেলজিয়াম
ফ্রান্স
সুইজার্ল্যাণ্ড
চেকোস্লোভাকিয়া
অস্ট্রিয়া
হাঙ্গেরী
রুমানিয়া
বুলগেরিয়া
গ্রীস
ইউরোপ
(প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ও পরে)
জার্মান সাম্রাজ্য, ১৯১৪
অষ্ট্রিয়ার " , "
রাশিয়ার " , "
যুদ্ধের পরে সীমারেখা -----
০ ২০০ ৪০০
মাইল

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স মরক্কোর রাজধানী ফেজ (Fez) শহরে শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিল। তখন জার্মানী মরক্কোর অন্তর্গত আগাদির (Agadir) বন্দরে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাইল। দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপোষে মীমাংসা হইল। জার্মানী মরক্কোতে ফ্রান্সের আধিপত্য (Protectorate) স্বীকার করিয়া লইল, বিনিময়ে ফ্রান্স মরক্কোতে সকল দেশের বাণিজ্যের সমান অধিকার (open door) স্বীকার করিল।

ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মরক্কো সংক্রান্ত বিবাদে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করে, কারণ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী (Anglo-French Entente) স্থাপিত হইয়াছিল। ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর মূলে ছিল রাশিয়া ও জার্মানীর সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থসংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী (Anglo-Russian Convention) স্থাপিত হয়, কিন্তু ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে থাকে। বিসমার্ক ইংলণ্ডের বন্ধুতার মূল্য বুঝিতেন, তাই তিনি কখনও ইংলণ্ডের স্বার্থহানির চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু জার্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম (১৮৮৮-১৯১৮) এই নীতি পরিত্যাগ করেন।

ইংলণ্ড ও জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র হইয়াও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে (Boer War) বুয়রদের সাফল্য কামনা করিয়া প্রকাশ্যভাবে ইংলণ্ডবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানী শক্তিশালী নৌবহর নির্মাণ করিয়া সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের অপ্রতিহত আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করে। ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য নৌবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংলণ্ডের মৌলিক স্বার্থে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিল। ফলে ইংলণ্ড জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল।

এদিকে বার্লিন সন্ধির (১৮৭৮) পরে 'প্রাচ্য সমস্যা' (Eastern Question) খুবই জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। কার্যতঃ ইহার সমাধান করা ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। বিসমার্ক মৃত্যুর পূর্বে (১৮৯৮) বলিয়াছিলেন, "আমি বিশ্বযুদ্ধ দেখিতে পাইব না, তোমরা দেখিবে। এই যুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আরম্ভ হইবে।" তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছিল।

১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে বলকান উপদ্বীপে দুইটি যুদ্ধ (First and Second Balkan Wars) ঘটিয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নব্য তুর্কী দলের বিপ্লবের

(Young Turk Revolution) ফলে তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া, গ্রীস এবং সার্ভিয়া সম্মিলিতভাবে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। তুর্কী পরাজিত হইল। লণ্ডনে শান্তিবৈঠকে সন্ধির সর্ত করা হইল। আলবেনিয়া নামক নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইল। কিন্তু তুর্কীর যে রাজ্যখণ্ড বিজয়ী মিত্রশক্তিগণ অধিকার করিয়াছিল তাহার ভাগাভাগি সম্বন্ধে মতৈক্য হইল না। তখন বুলগেরিয়া অকস্মাৎ গ্রীস ও সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইহাই দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ। রুমানিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। বুলগেরিয়ার পরাজয়ের পর বুখারেস্টের সন্ধি (Treaty of Bukharest) দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইল (১৯১৩)। দুইটি বলকান যুদ্ধের ফলে তুর্কী সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল, গ্রীসের লাভ হইল সবচেয়ে বেশী। সার্ভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং মন্টিনিগ্রোও লাভবান হইল। সার্ভিয়ার রাজ্যসীমা প্রসারণ ও শক্তিবৃদ্ধি অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর পক্ষে অসুবিধার কারণ হইল—সার্ভিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন ছিল। সার্ভিয়ায় অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থসংঘাত উপলক্ষ্য করিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

বলকান যুদ্ধ

অষ্টম অধ্যায়

ইউরোপের প্রসার

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ঔপনিবেশিক প্রসারের কারণ :

উনবিংশ শতাব্দীতে নানা কারণে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ ইউরোপের বাহিরে—এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে—ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য (colonial empire) স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। এই বিষয়ে অর্থ নৈতিক কারণগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পবিপ্লবের ফলে কারখানায় অল্পসময়ে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত। এই সকল দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য নূতন নূতন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন হইল। যে সকল দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটে নাই সেই সকল দেশে ইউরোপের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ ঘটিল। আবার ঐ সকল অনুন্নত দেশ হইতে ইউরোপের কল-কারখানার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা যাইত। সুতরাং পণ্য

(১) অর্থ নৈতিক

বিক্রয়ের এবং কাঁচা মাল সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলি ইউরোপের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ঐ সকল দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের লোভ স্বভাবতঃই প্রবল হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণও উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সূচিত করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ইউরোপে ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার স্থান সঙ্কুলান হইত না; মাতৃভূমির বাহিরে—অথচ রাজনৈতিক হিসাবে মাতৃভূমির কর্তৃত্বাধীন—জনবিরল কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা হইলে এই সকল সমস্যার সমাধান হইত। উদ্বৃত্ত লোকেরা নূতন দেশে যাইয়া জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাইত, আবার জনসংখ্যার চাপ হ্রাসের ফলে মাতৃভূমির আথিক অবস্থার উপর চাপ কমিয়া যাইত। এই সকল কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং নিউজীলণ্ডে বহু ইংরেজ বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

(২) সামাজিক

তৃতীয়তঃ, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টাও সময় সময় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনে পরিণত হইত। একটি প্রচলিত কথা আছে: প্রথমে পাদ্রী, পরে বণিক, সর্বশেষে সৈনিক—অর্থাৎ ধর্মপ্রচারের পরে বাণিজ্যবিস্তার, তারপর সামরিক অভিযান।

(৩) ধর্মপ্রচার

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য প্রাচ্য দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন আবশ্যক বলিয়া মনে করা হইত। ইংলণ্ড পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ফ্রান্সও সুবৃহৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিল। সুতরাং রাশিয়া, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশের পক্ষেও একই রাজনৈতিক পথে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সম্মিলিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। অনুন্নত দেশগুলি রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা বশতঃ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের অভিযান রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

(৪) রাজনৈতিক

চতুর্থতঃ, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল শক্তি ও মর্যাদার উৎস; সুতরাং বৃহৎ শক্তিগুলি সাধারণতঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য উৎসুক ছিল।

ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সামাজ্য বিস্তারের ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অনুন্নত দেশগুলির স্বাধীনতা লোপ ও আর্থিক দুর্গতি ঘটিল, পক্ষান্তরে ইউরোপের

কয়েকটি দেশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের লোভ তাহাদেরও অনিষ্ট করিয়াছিল; সাম্রাজ্য-বিস্তারকামী শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের উদ্ভব হইয়াছিল। এশিয়ায় ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইহার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আফ্রিকায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্য-বিস্তার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছিল দীর্ঘকালব্যাপী আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব।

সাম্রাজ্য বিস্তারের ফল

১। আফ্রিকা

আফ্রিকায় ইউরোপের প্রসারঃ ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির শাসনাধীন হয়।

মিশর (Egypt) দীর্ঘকাল তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নেপোলিয়নের অভিযানকালে মিশরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে তুর্কীর দুর্বলতার সুযোগে মিশরের পরাক্রান্ত শাসনকর্তা মহম্মদ আলি (Mehemet Ali) কার্যতঃ এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মিশর নামে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও মহম্মদ আলির "খেদিভ" (Khedive) উপাধিধারী বংশধরগণ স্বাধীনভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খেদিভের অনুমতি লইয়া ফার্দিনান্দ ডি লেসেপ্‌স্ (Ferdinand de Lesseps) নামক জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সুয়েজ খাল খননের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই খালের খননকার্য সম্পূর্ণ হয়। খালটি একটি কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন ছিল। কোম্পানীর বহুসংখ্যক অংশের (shares) মালিক ছিলেন খেদিভ ইসমাইল। তিনি অর্থাভাবে অংশগুলি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী (Disraeli) স্বদেশের পক্ষ হইতে সেগুলি ক্রয় করেন (১৮৭৪)। ফলে সুয়েজ খালে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরেজের জাহাজ যাহাতে বিনা বাধায় খালের পথে ভারতে আসিতে পারে তাহার পাকাপাকি ব্যবস্থা হইল।

সুয়েজ খাল

এদিকে ঋণগ্রস্ত খেদিভ ইসমাইল অর্থাভাবে পাওনাদারদিগের দাবি মিটাইতে

না পারিয়া বিপন্ন হইলেন। ইহাদের অধিকাংশই ছিল ফরাসী ও ইংরেজ। তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে মিশরের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। হতভাগ্য খেদিভ দেনার দায়ে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা হারাইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অধীন হইলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে গদীচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র তিউফিককে (Tewfik) সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। কিন্তু দেশের দুর্গতি রোধ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আরাবী পাশার (Arabi Pasha) নেতৃত্বে মিশরের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইল। ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনী ও সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন করিল। ফ্রান্স বিদ্রোহ দমনে অংশ গ্রহণ না করিয়া মিশরে কর্তৃত্বের দাবি হারাইল। তুর্কীর সার্বভৌমত্ব (suzerainty) নামে বজায় রহিল, খেদিভ পূর্ববৎ সিংহাসনে আসীন রহিলেন, কিন্তু মিশর প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের শাসনাধীন হইল।

মিশরে ইংরেজ-প্রভুত্ব

সুদান (the Sudan) মিশরের অধীন ছিল। কিন্তু মিশরে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে সুদানে বিদ্রোহ হইল, এক ধর্মনায়ক "মাহ্‌দী" (Mahdi, Messiah) আখ্যা গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে দেশ-শাসনের দাবি প্রচার করিল। এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া ইংরেজ সেনাপতি গর্ডন (Gordon) নিহত হইলেন (১৮৮৫)। কয়েক বৎসর সুদান মাহ্‌দীর অধীন রহিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কিচেনার (Kitchener) ওমডুরমানের (Omdurman) যুদ্ধে মাহ্‌দীর দলকে বিধ্বস্ত করিয়া সুদানে মিশরের (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সুদানে ইংরেজ-প্রভুত্ব

মিশরে এবং সুদানে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব স্থাপন ফ্রান্স সুনজরে দেখিতে পারে নাই। ওমডুরমানের যুদ্ধের কিছুদিন পরে এক ফরাসী সেনানায়ক (Victor Marchand) নীল নদের উৎসের নিকটবর্তী ফ্যাসোডা (Fashoda) নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় কিচেনারের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের উপক্রম হয় (১৮৯৮)। ফরাসী সরকার যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিলেন এবং সুদানে ব্রিটিশ-প্রভুত্ব মানিয়া লইলেন (১৮৯৯)। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স মিশরে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকার করিল, নীলনদের উপত্যকায় ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইল।

সুদানে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মিশরে ও সুদানে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপিত

হইলেও ইংরেজ বা অপর কোন শ্বেতাঙ্গ জাতি আফ্রিকার এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন (Colonisation) করে নাই। আফ্রিকায় ব্রিটিশ-প্রভুত্বের অপর প্রধান কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনি (Cape Colony) ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হয়, কিন্তু এই প্রদেশের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ওলন্দাজ জাতীয়। ওলন্দাজ কৃষকেরা ব্রিটিশ-শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া কেপ কলোনি পরিত্যাগ করিয়া দুইটি নূতন রাষ্ট্র—ট্রান্সভ্যাল (Transvaal) এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট (Orange Free State)—স্থাপন করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ড এই দুইটি রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করে। ইংরেজরা নাটালে (Natal) নূতন উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ট্রান্সভ্যাল অধিকার করিল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রথম বুয়র যুদ্ধ (১৮৮০-১৮৮১) ঘটে। (ওলন্দাজ কৃষকদিগকে বুয়র—Boer—বলা হইত।) যুদ্ধাবসানে বুয়রদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল ; তিন বৎসর পরে (১৮৮৪) ট্রান্সভ্যাল 'দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্র' (South African Republic) নামে পরিচিত হইল। অতঃপর সিসিল রোড্‌সের (Cecil Rhodes) চেষ্টায় তাঁহার নাম অনুসারে পরিচিত রোডেশিয়া (Rhodesia) নামক ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৯৫)।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ-প্রভুত্ব

ইতিমধ্যে ট্রান্সভ্যালে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্বর্ণলোভী ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সিসিল রোড্‌সের কৌশলে দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২) আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করা ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে সহজ হয় নাই। যুদ্ধাবসানে বুয়রেরা ইংরেজের অধীন হইল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেপ কলোনি, নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট এবং ট্রান্সভ্যাল সম্মিলিত হইয়া 'দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র' (Union of South Africa) গঠন করিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইল। বুয়রদের সমরনায়ক বোথা (Botha) এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ক্রমে বুয়র ও ইংরেজদের মধ্যে বিদ্বেষভাব দূর হইল, দক্ষিণ আফ্রিকায় এক সম্মিলিত শ্বেতাঙ্গ জাতি গড়িয়া উঠিল।

আফ্রিকায় ইউরোপের প্রসার : আফ্রিকার খণ্ডীকরণ (Partition of Africa) : ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ইউরোপীয় জাতি আফ্রিকায় অধিকার বিস্তারে অগ্রণী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ফ্রান্স বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লুই ফিলিপের রাজত্বকালে (১৮৩০-১৮৪৮) ফ্রান্স আলজিরিয়া অধিকার করে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে টিউনিস ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপলি এবং সাইরেনাইকা ইটালীর হস্তগত হয়। এই সকল অঞ্চল ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে নাই ; তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব নীল নদের উপত্যকায়, আলজিরিয়ায়, কেপ (Cape of Good Hope) অঞ্চলে এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলে (মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা) সীমাবদ্ধ ছিল। আফ্রিকা তখন "অন্ধকার দেশ" (Dark Continent) রূপে গণ্য হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দুঃসাহসী পর্যটকগণের চেষ্টায় আফ্রিকার সমুদ্রোপকূল হইতে বহুদূরে অবস্থিত গভীর অরণ্য অঞ্চলে ইউরোপীয়দের প্রবেশ সম্ভব হয়। পর্যটকগণের মধ্যে লিভিংস্টোন (David Livingstone) এবং স্ট্যানলীর (Stanley) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"অন্ধকার দেশ" আবিষ্কার

বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড (Leopold) "অন্ধকার মহাদেশের" অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কারে উৎসাহ প্রদর্শন এবং অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ কঙ্গো নদীর উপত্যকা তাঁহার অধিকারভুক্ত হয় (১৮৭৯)। পরে ইহা কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য (Congo Free State) নামে পরিচিত হয়। ইটালী লোহিত সাগরের (Red Sea) তীরবর্তী ইরিট্রিয়া (Eritrea) আত্মসাৎ করে (১৮৮২)। জার্মানীও লুণ্ঠনকার্যে অগ্রসর হইয়া 'জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা' এবং 'জার্মান পূর্ব আফ্রিকা'র পত্তন করিল (১৮৮৪-১৮৮৫)।

১৮৮৪-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার অবস্থা পর্যালোচনার জন্য বিসমার্কের সভাপতিত্বে বার্লিনে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে এক চুক্তিপত্র প্রস্তুত হয় এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশ ইহাতে স্বাক্ষর করে। আফ্রিকার খণ্ডী-করণ সম্বন্ধে যাহাতে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করাই এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করিয়া আপোষ-মীমাংসা দ্বারা আফ্রিকার খণ্ডীকরণ সম্পূর্ণ করা অসম্ভব ছিল না, কারণ অতবড় মহাদেশে সকলের পক্ষেই রাজ্যবিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ইউরোপের শক্তিগুলি আফ্রিকা মহাদেশ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি

চুক্তিদ্বারা আফ্রিকার খণ্ডীকরণ

করিয়া লইল। ইহার মূলে ছিল নানাবিধ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ, ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার জন্য নূতন বাসস্থানের প্রয়োজন এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের আগ্রহ। শিল্পবিপ্লবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র আফ্রিকায় মাত্র তিনটি কৃষ্ণাঙ্গ-শাসিত স্বাধীন রাজ্য ছিল—আবিসিনিয়া, লাইবেরিয়া ও মরক্কো। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়া জয় করিতে যাইয়া পরাজিত হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কো ফ্রান্সের প্রভাবাধীন (Protectorate) হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড মরক্কোতে ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয়। অতঃপর জার্মানী মরক্কোতে ফ্রান্সের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার প্রয়াস পাইলে (১৯০৬-১৯১১) ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করে ; তখন জার্মানী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বিরত হয়। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আফ্রিকায় কেবলমাত্র দুইটি স্বাধীন রাজ্য (আবিসিনিয়া বা ইথিয়োপিয়া এবং লাইবেরিয়া) রহিল।

আফ্রিকায় ইউরোপীয় শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

আফ্রিকাকে খণ্ডীকৃত করিয়া ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জার্মানী—এই তিনটি শক্তি বিশেষ লাভবান হইয়াছিল। আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যের (সাহারা মরুভূমি সহ) আয়তন ছিল ৩,৮০৪,৯৭৪ বর্গ মাইল। মিশর ও সুদান বাদ দিলে আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ২,৭১৩,৯০০ বর্গ মাইল। জার্মানীর অধিকারে ছিল প্রায় ১,০০,০০০ বর্গ মাইল। বেলজিয়ম, ইটালী, পর্তুগাল এবং স্পেনও আফ্রিকার কোন কোন অংশে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকা ইউরোপীয় শক্তিগুলির রণাঙ্গনে পরিণত হয়।

২। চীন ও জাপান (১৮৪০-১৯১৪)

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের সহিত চীনের বাণিজ্য ঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষ্যে চীন দেশে উপস্থিত হয়। চীন সরকারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চীন দেশের সমুদ্রোপকূলে এই সকল ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য প্রসারিত হয়। উত্তর স্থলপথে রাশিয়া চীনের সহিত সন্ধিসূত্রে (১৬৮৯) বাণিজ্যের সুযোগ পায়। কিন্তু চীন দেশে তখন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। চীনের মাঞ্চু (Manchu) বংশীয় সম্রাট নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক

বলিয়া মনে করিতেন। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দুইবার (১৭৯৩, ১৮১৬) বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য চীন দেশে দূত প্রেরণ করে। কিন্তু চীন সরকার ইউরোপীয়দিগকে বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ দিতে অথবা কোন বিদেশীয় রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হয় নাই। চীন-সম্রাট ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জকে লিখিয়াছিলেন : "...আমাদের সকল জিনিসই আছে...আপনার দেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদির আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।"

পাশ্চাত্ত্যের প্রতি চীনের প্রতিকূলতা

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ (Charter Act of 1833) অনুসারে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীন দেশে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার হারাইল। তখন বহুসংখ্যক ইংরেজ কোম্পানী চীন দেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল। এই অবস্থায় চীন দেশের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যের প্রসার ঘটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু চীন সরকার নানা ভাবে ইংরেজ বণিকদিগের বাণিজ্যে বাধা দিয়া তাহাদের স্বার্থহানি করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর ছোটখাট বিরোধের পর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অহিফেন যুদ্ধ (Opium War) : তখন ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজরা প্রচুর পরিমাণে আফিম চীন দেশে রপ্তানি করিত। চীন সরকার প্রজাদের অহিফেন সেবন পছন্দ করিত না, কিন্তু নানাপ্রকার আইন প্রবর্তন করিয়াও অহিফেনসেবীদের সংখ্যা কমাইতে পারে নাই। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে অহিফেনের ক্রয়বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া সরকারী আদেশ প্রচারিত হইল, কিন্তু ইংরেজ বণিকদের সহিত ঘুষখোর চীনা কর্মচারীদের গুপ্ত সহযোগিতার ফলে ইহা কার্যকর হইল না। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন চীনা কর্মচারী কঠোরভাবে সরকারী নির্দেশ পালনের বন্দোবস্ত করিল। ইংরেজ বণিকদের আফিম বাজেয়াপ্ত করা হইল; তাহারা ভবিষ্যতে আফিমের ব্যবসায় করিবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দাবি করা হইল। উভয় পক্ষই উগ্র মনোভাব অবলম্বন করায় 'অহিফেন যুদ্ধ' (Opium War, ১৮৩৯-১৮৪২) আরম্ভ হইল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর জয় হইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাট নানকিঙের সন্ধি (Treaty of Nanking) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজ বণিকেরা ক্যাণ্টন, সাংহাই প্রভৃতি পাঁচটি প্রধান বন্দরে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইল; কার্যতঃ সমগ্র দক্ষিণ চীনে ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ ঘটিল। হংকং

যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধের ফল

ইংলণ্ডের শাসনাধীন হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীন ইংলণ্ডকে প্রচুর অর্থ দিল।

এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। সুবৃহৎ চীন সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। যদি এই যুদ্ধে চীন জয়লাভ করিত তবে খুব সম্ভবতঃ পাশ্চাত্ত্য বণিক আর 'সুদূর প্রাচ্যে' (Far East) প্রবেশ করিতে পারিত না। পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি ক্রমাগত বলপ্রয়োগ দ্বারা 'সুদূর প্রাচ্যে' অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করিতে লাগিল। পরাজিত চীন কয়েক বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স, আমেরিকা, নরওয়ে-সুইডেন ও বেলজিয়মকে বাণিজ্যসংক্রান্ত নানারকম সুযোগ ও অধিকার দিতে বাধ্য হইল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত চীনের যুদ্ধঃ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির ফলে ইউরোপীয় বণিকেরা যে সকল অধিকার পাইয়াছিল তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয় নাই। চীন সরকার নূতন অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল না; বরঞ্চ পূর্ব সন্ধির সর্ত পালন সম্বন্ধে নানারকম অসুবিধা দেখা দিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী পাদ্রীকে সন্ধির সর্ত লঙ্ঘন করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সেই বৎসরই বেআইনী ব্যবসায়ে লিপ্ত একখানি ইংরেজ জাহাজ আটক করা হয়। চীন সরকারের এই সকল কার্যের প্রতিবাদ স্বরূপ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সম্মিলিত ভাবে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (Second China War, ১৮৫৭-১৮৫৮)। এই সময়ে চীনদেশে এক প্রবল বিদ্রোহ (Taiping Rebellion, ১৮৫১-১৮৬৪) চলিতেছিল। চীন সরকারের পক্ষে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করা চীনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধের কারণ

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের পরাজয়ের পর পাকাপাকি সন্ধিস্থাপনের পূর্বেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে চীন টিয়েনসিনের সন্ধি (Tientsin Treaties) স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রচুর অর্থ পাইল। চীনের আরও এগারটি বন্দরে বিদেশীদের বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকৃত হইল। চীনের রাজধানী পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রদূত গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। ইউরোপ ও আমেরিকার নাগরিকেরা চীন দেশে বাসকালে স্ব স্ব দেশের আইনের অধীন থাকিবে, চীনের

যুদ্ধের ফল

আইন এবং চীনের কোন বিচারালয়ের অধিকার তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না (ex-territoriality) —এই অপমানজনক সর্তও চীন স্বীকার করিয়া লইল। চীন দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ দিতে চীন সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

চীন (১৮৬১-১৮৯৪)ঃ বিদেশীদের নিকট দ্বিতীয় বার পরাজয় এবং তাইপিং বিদ্রোহ চীনকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া ফেলিল। বিদ্রোহের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় দুই কোটি লোক প্রাণ হারাইয়াছিল এবং চীন সাম্রাজ্যের কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমনে ইউরোপীয়েরা চীন সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল, কারণ দুর্বল মাঞ্চু রাজবংশ চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের বাণিজ্যসংক্রান্ত নূতন অধিকার লাভের আশা ছিল।

তাইপিং বিদ্রোহ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পর পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি নানাভাবে চীনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র পাঁচটি দেশের (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, নরওয়ে-সুইডেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) সহিত চীনের সন্ধিসম্পর্ক ছিল। পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আরও এগারটি দেশের সহিত চীনের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সকল সন্ধির ফলে চীনের বাণিজ্য কার্যতঃ সমগ্র পাশ্চাত্ত্য দেশের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে চীনে বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন এক চুক্তি Chefoo Agreement) দ্বারা ইংলণ্ড চীনে কয়েকটি নূতন অধিকার লাভ করে। পূর্বে চীন দেশের যে সকল বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত করা হইয়াছিল সেগুলি বাদে আরও চারিটি বন্দরে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং ইয়াংসি (Yangtse) নদীতে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি যে কেবল চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করায়ত্ত করিতেছিল তাহা নহে, বিশাল চীন সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহারা সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, তরমুজ যেমন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয় চীন সাম্রাজ্যকেও তেমন ভাবে কাটা হইল ("cutting up the Chinese melon")। একমাত্র আফ্রিকার খণ্ডীকরণের (Partition of Africa) সহিত ইহার তুলনা করা যায়।

চীনের অঙ্গচ্ছেদ

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চীনের সহিত সন্ধিসূত্রে আমুর নদী পর্যন্ত এক

বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উত্তর-পূর্ব উপকূলে রাশিয়ার অধিকার প্রসারিত হইল এবং রাশিয়া তথায় ব্লাডিভোস্টক (Vladivostok, "Conqueror of the East") নামক প্রসিদ্ধ বন্দর নির্মাণ করিল। এইরূপে রাশিয়া কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রসর হইল; রুশ-জাপান যুদ্ধের বীজ বপন করা হইল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত বিরোধ করিয়া রাশিয়া সাখালিন (Sakhalin) দ্বীপ অধিকার করিল। ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্বে টংকিং ও আনাম অধিকার করিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপান লুচু দ্বীপপুঞ্জ (Loochoo Islands) আত্মসাৎ করিল। পরে জার্মানী ও ইটালী এই লুণ্ঠনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল।

জাপান (১৮৫৩-১৮৬৭): চীনের মত জাপানও দীর্ঘকাল পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কেবলমাত্র ওলন্দাজ ও চীনা ব্যতীত সকল বৈদেশিকের পক্ষে জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। জাপানীদের পক্ষেও বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। যাহাতে কোন জাপানী সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিদেশে যাইতে না পারে সেজন্য বড় জাহাজ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হইত না। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী নির্দেশ দেওয়া হইল যে বিদেশী জাহাজ জাপানের তীরভূমির দিকে অগ্রসর হইলেই তাহা কামান দাগিয়া ধ্বংস করিতে হইবে। দুইশত বৎসরকাল জাপান যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সীমা পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের রণতরী ও বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করিত। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের অপর কূলে অবস্থিত দেশগুলির সহিত সংযোগস্থাপন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ আমেরিকার রণতরীগুলি প্রশান্ত মহাসাগরে কোন কারণে বিপন্ন হইলে তাহাদের পক্ষে জাপানের বন্দরে আশ্রয় লাভ অত্যাবশ্যক ছিল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পেরী (Perry) নামক যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর একজন কর্মচারী (Commodore) চারিখানি যুদ্ধজাহাজ লইয়া টোকিও উপসাগরে উপস্থিত হইলেন এবং জাপানের বন্দরগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ রাখিবার দাবি জানাইলেন। পর বৎসর তিনি আবার আসিলেন; এবার তাঁহার সঙ্গে ছিল আটখানি যুদ্ধজাহাজ ও চার হাজার সৈন্য। জাপানীরা ভয় পাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিল।

আমেরিকার জাপানে প্রবেশ

জাপানের দুইটি বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ প্রবেশ করিতে পারিবে বলিয়া অনুমতি দেওয়া হইল (১৮৫৪)।

এতদিন পরে জাপানের দ্বার বৈদেশিকদের নিকট উন্মুক্ত হইল। কেবলমাত্র আমেরিকাই কি এই অধিকার ভোগ করিবে? ইউরোপের পরাক্রান্ত দেশগুলি জাপানে প্রবেশের সুযোগ চাহিল। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি আরও পনরটি বৈদেশিক শক্তির সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সকল সন্ধির ফলে জাপানের অবস্থাও চীনের মত হইল। বিদেশীরা কেবল যে বাণিজ্যের অধিকার পাইল তাহা নহে; তাহারা জাপানের আইন ও বিচার-ব্যবস্থার বাহিরে রহিল (ex-territoriality), জাপানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা পাইল। সমগ্র 'সুদূর প্রাচ্যে' একই পদ্ধতিতে পাশ্চাত্ত্য প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

জাপানের দ্বার উন্মোচনের ফল

জাপানে বিপ্লব (১৮৬৭)ঃ কিন্তু বিদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের ফল চীনে ও জাপানে একরূপ হইল না। চীন বিদেশীর প্রবল শক্তি রোধ করিতে না পারিয়া হতাশ হইল, প্রাচীন ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন চেষ্টা না করিয়া ক্রমশঃ দুর্বলতার গহ্বরে ডুবিতে লাগিল। আর জাপান প্রাচীন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীর অনুকরণে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিল, জাতীয় জীবনে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া বিদেশীকে প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন ও জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় প্রচণ্ড পার্থক্য দেখা দিল।

চীন ও জাপানের পার্থক্য

মধ্যযুগে জাপানের শাসন-ব্যবস্থা অতি বিচিত্র ছিল। চীন প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচ্য দেশের রাজার ন্যায় জাপানের সম্রাট (Mikado) স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন না; প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রজাদের অশেষ ভক্তিভাজন হইলেও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। তিনি কিয়োটো (Kyoto) নগরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করিতেন। রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন 'শোগান' (Shogun)। তিনি টোকিও (পূর্ব নাম Yeddo) নগরে বাস করিতেন এবং 'মিকাডো'র প্রতিভূরূপে শাসনসংক্রান্ত সমুদয় কার্য পরিচালনা করিতেন। জাপানে সামন্ত প্রথা (Feudalism) প্রচলিত ছিল। পরাক্রান্ত জমিদারগণ (Daimio) বেতনভোগী যোদ্ধাদের (Samurai) সাহায্যে নিজেদের জমিদারী রক্ষা ও

জাপানের শাসন-ব্যবস্থা

মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেন। এই জমিদারশ্রেণী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে (clans) বিভক্ত ছিল। একটি প্রধান গোষ্ঠীর (Tokugawa) নায়ক 'শোগানে'র পদ অধিকার করিতেন। এই পদ বংশানুক্রমিক ছিল। অন্যান্য গোষ্ঠীর ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'শোগান' স্বেচ্ছাচারী শাসক হইতে পারেন নাই। জাপানীরা সিণ্টো ধর্মের (Shintoism) অনুগামী ছিল। সেই ধর্মের প্রভাবে তাহাদের মনে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশাত্মবোধ প্রবল ছিল।

বিপ্লবের কারণ

বৈদেশিকগণ জাপানে প্রবেশ করিলে নানাবিধ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ আরম্ভ হইল। বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের সঞ্চিত সন্দেহ প্রকাশ পাইল। শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। 'শোগানের' বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলির দীর্ঘকালসঞ্চিত ঈর্ষা রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হইল। অনেকে মনে করিল যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাচীন সামন্ত প্রথার অবসান করিয়া ঐক্যবদ্ধ শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন করতঃ দেশকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। দেশে ক্রমবর্ধমান অশান্তি লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি প্রধান গোষ্ঠীর নায়ক 'শোগান'কে পদত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন। 'শোগান' এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া সম্রাটের নিকট নিজের সমুদয় ক্ষমতা সমর্পণ করিলেন (নভেম্বর, ১৮৬৭)। জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'মিকাডো'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দীর্ঘ সাত শতাব্দী পরে সামন্ত প্রথার অবসান হইল ; শাসন-ক্ষমতা সম্রাটের হাতে ফিরিয়া আসিল।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

অতঃপর নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তনের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানের সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিল। সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত হইল। জমিদারদিগকে সাময়িক বৃত্তি বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল। গোষ্ঠীপ্রথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। সমাজের শ্রেণীবিন্যাস অনেকটা সরল করা হইল। দেশে এক-কেন্দ্রিক, শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠাই সংস্কারকদের কাম্য ছিল।*

পুরাতন সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্তে জার্মানীর অনুকরণে বাধ্যতামূলক আইন

* ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত সম্রাটের এক নির্দেশে বলা হয় : "We are of the opinion that in a time of radical reform like the present, if we desire by its means to ....maintain equality with foreign nations......the government of the country must centre in a single authority......We now completely abolish the clans...with the object of......abolishing the disease of government proceeding from multiform centres".

দ্বারা সৈন্যবাহিনী গঠন (conscription) করা হইল। 'সামুরাই' শ্রেণীর সামরিক মর্যাদা ও অধিকার বিলুপ্ত হইল। নৌ-বাহিনী সংগঠনে ইংলণ্ডের অনুকরণ করা হইল। তখন ইউরোপে জার্মানীর সৈন্যদল এবং ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনী অপরাজেয় রূপে গণ্য হইত। তাই জাপান সামরিক সংস্কার প্রবর্তনে এই দুই দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য বহু বাতিঘর (lighthouse) এবং পোতাশ্রয় (dockyard) নির্মিত হইল। একটি জাপানী জাহাজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল।

সামরিক ব্যবস্থা

পরিবহন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইল। রেলপথ নির্মিত হইল, নূতন রাজপথ নির্মাণ করিয়া দেশের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করা হইল। শিল্পোন্নতি আরম্ভ হইল, বাণিজ্যের প্রসার ঘটিল। একটি জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition) মাধ্যমে কৃষিজীবী জনসাধারণের দৃষ্টি শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইল। 'শেয়ারের' (shares) বাজার (Stock Exchange) এবং বণিক সমিতি (Chamber of Commerce) প্রতিষ্ঠিত হইল। শিল্পবিপ্লবে ইংলণ্ডের অসামান্য উন্নতি দেখিয়া জাপান নবস্থাপিত কারখানাগুলিতে ইংলণ্ডের যন্ত্রপাতি ও রীতিনীতি প্রবর্তন করিল। কৃষির উন্নতির প্রতিও সংস্কারকগণের দৃষ্টি ছিল। নূতন ভূমি-কর প্রবর্তন করা হইল। জমির পরিমাণ (Survey) ও মূল্য নির্ধারণ করা হইল। শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইল।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

শিক্ষার উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি হয় না, ইহা জাপান বুঝিতে পারিয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। ইহার মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইল। দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকায় বিদেশ হইতে শিক্ষক আনীত হইল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত দেশবাসীর প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপনের জন্য বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্ধারিত হইল। দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ। পূর্বে বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ ছিল তাহা রহিত হইল, জাপানী প্রতিনিধিদল বিদেশে যাইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিল। ধর্ম সম্বন্ধে উদার নীতি প্রবর্তিত হইল। খ্রীষ্টধর্মবিরোধী আইনকানুন বাতিল করা হইল।

শিক্ষা ব্যবস্থা

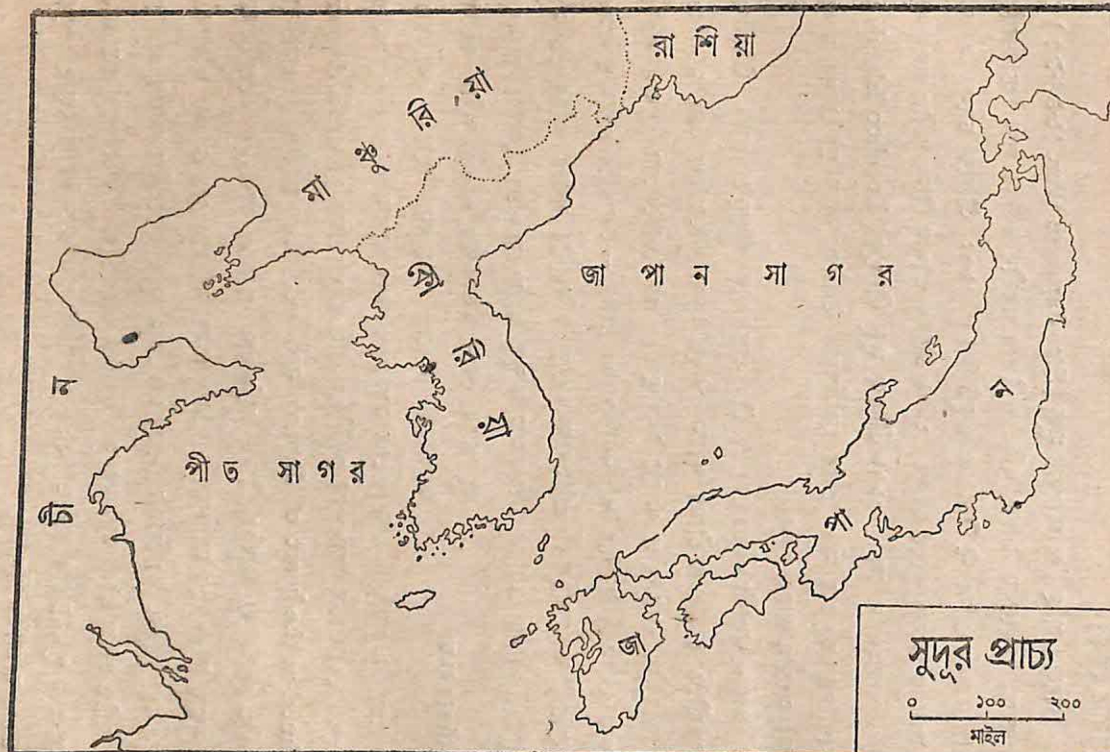
১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইল। প্রাশিয়ার সংবিধানের অনুকরণে ইহা রচিত হইয়াছিল। পূর্বপ্রচলিত আইনকানুনের আমূলসংস্কার করিয়া পাশ্চাত্ত্য ধরণে নূতন আইনের সংহিতা (code) প্রস্তুত করা হইল।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় কুড়ি বৎসরকাল জাপানে ইউরোপের অনুকরণ বন্যার মত বহিয়া গেল। প্রথম দিকে ইংরেজ হিতবাদিগণের (Utilitarians—যাঁহারা মনে করেন যে দেশের অধিকাংশ লোকের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই করা উচিত) ভাবধারা প্রবল হইয়াছিল। পরে ফরাসী গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসৃত হয় এবং রুসোর গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়। শেষ দিকে জার্মানীর জাতীয় ভাব (যাহা সামরিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল) জাপানে জনপ্রিয় হইয়া উঠে। জাপানের সমাজে ও রাষ্ট্রে সামরিক ভাবধারার যে প্রাধান্য বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহা আংশিকভাবে প্রাচীন সামন্ত প্রথার ফল সন্দেহ নাই, কিন্তু জার্মানীর প্রভাব সংক্রামিত না হইলে বোধহয় উহা এতটা প্রবল হইতে পারিত না।

ইউরোপের অনুকরণ

জাপানের পররাষ্ট্রনীতি ঃ বিপ্লবের প্রথম যুগে—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে—জাপানের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সহিত সন্ধির সর্তগুলি পরিবর্তন করা। এই সকল সন্ধি দ্বারা জাপানের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং জাপানের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া পড়িতেছিল। ইহা ছাড়া সন্ধির সর্তানুসারে বিদেশীরা এমন অনেক সুবিধা ভোগ করিত যাহা জাপানের জাতীয় মর্যাদার পক্ষে হানিকর ছিল। যেমন, বিদেশীরা নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রদূতের কর্তৃত্বাধীন থাকিত, জাপানের আইন ও বিচার-ব্যবস্থা তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল না (ex-territoriality)। এই ব্যবস্থা অবশ্য চীনেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু নবজাগ্রত জাপানী জাতি ইহা দীর্ঘকাল স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এক জাপানী প্রতিনিধিদল ইউরোপে গিয়া সন্ধির সর্ত পরিবর্তন সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের সহিত আলোচনা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। ইউরোপীয় দেশগুলি তাহাদের অধিকার ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। তখন জাপান বুঝিতে পারিল যে কেবলমাত্র শক্তিমান জাতিই নিজের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করিতে পারে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে দুর্বল জাতির স্থান নাই। চীন দুর্বলতার জন্যই শক্তিমান পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির অন্যায় অধিকার বিলোপের জন্য জাপানের ব্যর্থ প্রয়াস


রাশিয়া
মাঞ্চুরিয়া
জাপান সাগর
কোরিয়া
পীত সাগর
চীন
জাপান
সুদূর প্রাচ্য
০ ১০০ ২০০
মাইল

নাই। সুতরাং জাপান সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। জাপানের পররাষ্ট্রনীতিতে নূতন যুগের সূত্রপাত হইল।

চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধ (Sino-Japanese War, ১৮৯৪-৯৫): পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাপান দুর্বল প্রতিবেশী চীনের প্রতি দৃষ্টি দিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে চানের সহিত জাপানের বিরোধ আরম্ভ হইল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের অধীন ফরমোসা দ্বীপ আক্রমণ করিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লুচু দ্বীপপুঞ্জ (Loochoo Islands) জাপানের হস্তগত হইল। শেষে কোরিয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া দুই দেশের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কোরিয়া চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে কোরিয়ায় চীনের শাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল এবং নানাবিধ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। এই গোলযোগের সুযোগ লইয়া কোন কোন ইউরোপীয় শক্তি—বিশেষতঃ রাশিয়া—কোরিয়ায় প্রভাব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে রাশিয়া কোরিয়া নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ফেলিত। কোরিয়া রাশিয়া বা অপর কোন ইউরোপীয় শক্তির অধীন হইলে জাপানের বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতি এমন যে সেখান হইতে জলপথে জাপান আক্রমণ করা অতি সহজ। কোরিয়াকে 'জাপানের হৃৎপিণ্ডের প্রতি আঘাতোদ্যত ছুরিকা' (a dagger aimed at the heart of Japan) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোরিয়া স্বাধীন হইলে বা কার্যতঃ চীনের কর্তৃত্বাধীন থাকিলে জাপানের পক্ষে তেমন আশঙ্কার কারণ ছিল না, কারণ জাপান আক্রমণ করিবার মত নৌবল তাহাদের ছিল না। কিন্তু কোরিয়ায় রাশিয়ার মত কোন বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে জাপানের পক্ষে সত্যই ভয়ের কারণ ছিল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ তখন পৃথিবী গ্রাস করিতেছিল; কোরিয়া হইতে জাপানে ইহার বিস্তৃতি সম্পূর্ণ সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল।

কোরিয়ার সমস্যা

এই সকল কারণে কোরিয়া সম্বন্ধে জাপানের সতর্কতার অভাব ছিল না। জাপান কোরিয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া তথায় চীনের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সহিত জাপানের এই মর্মে এক

চুক্তি হইল যে এই দুইটি দেশের মধ্যে কেহ অপর পক্ষকে না জানাইয়া কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিবে না। দশ বৎসর পরে কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ ঘটিলে প্রথমে চীন, পরে জাপান তথায় সৈন্য প্রেরণ করিল।

চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ

কোরিয়ার সমস্যার আপোষ-মীমাংসা হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না, কিন্তু জাপান চীনকে পরাজিত করিয়া নিজের সামরিক শক্তি প্রমাণ করিতে উৎসুক হইল। চীনের ন্যায় বৃহৎ দেশের সহিত যুদ্ধে জাপানের শক্তির পরিচয় পাইলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি জাপানের সহিত সন্ধির সর্ত পরিবর্তনের দাবি মানিয়া লইবে বলিয়া জাপানীদের ধারণা হইয়াছিল।

চীন-জাপানের যুদ্ধ (১৮৯৪-১৮৯৫) মাত্র নয়মাস কাল স্থায়ী হইল ; জলে স্থলে চীন ভীষণভাবে পরাজিত হইল। জাপান যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ছিল ; চীনের বাহিনীতে ছিল শৃঙ্খলার অভাব এবং অসৎ ও লোভী সেনানায়কদের অকর্মণ্যতা। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া জাপানী সৈন্যদল চীনের রাজধানী পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন শিমনো-সেকিতে সন্ধি (Treaty of Shimonoseki—এপ্রিল, ১৮৯৫) স্থাপিত হইল।

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল

চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিল, ফরমোসা সহ কয়েকটি দ্বীপ এবং লিয়াও-টুঙ উপদ্বীপ (Liao-tung Peninsula) জাপানকে ছাড়িয়া দিল এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিল। চীনে পাশ্চাত্ত্য শক্তিরা বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল অধিকার ভোগ করিত জাপানও তাহা পাইল।

যুদ্ধের ফল সকল দিকেই জাপানের অনুকূল হইলেও জাপান ইহা সম্পূর্ণ ভাবে ভোগ করিতে পারিল না। জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য শক্তি তাহার অগ্রগতির পথে বাধা দিল। লিয়াও-টুঙ উপদ্বীপ (বিখ্যাত বন্দর পোর্ট আর্থার সহ) জাপানের হস্তগত হইলে মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বিপন্ন হইত। রাশিয়ার এক মন্ত্রী রাশিয়ার সম্রাটের নিকট লিখিয়াছিলেন, "জাপান এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি ('peaceful penetration") বন্ধ হইবে।" মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের প্রবেশ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানী সম্মিলিতভাবে জাপানকে জানাইল যে তাহাকে লিয়াও-টুঙ উপদ্বীপ অধিকার করিতে দেওয়া হইবে না (Three-Power Intervention, ১৮৯৫)। ত্রিশক্তির প্রতিবাদ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া জাপান উক্ত উপদ্বীপ এবং

পোর্ট আর্থার বন্দর চীনকে ফিরাইয়া দিল। এইরূপে শিমনোসেকির সন্ধির সর্তাবলীর আংশিক পরিবর্তন ঘটিল। রাশিয়া এই ব্যাপারে নায়কত্ব গ্রহণ করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানে প্রবল শত্রুভাবের সৃষ্টি হইল। ইহা চীন-জাপান যুদ্ধের প্রধান পরোক্ষ ফল। রুশ-জাপান যুদ্ধে এই শত্রুভাবের পরিণতি ঘটিল।

যুদ্ধের পরোক্ষ ফল

যুদ্ধের আর কয়েকটি পরোক্ষ ফলও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চীনকে পরাজিত করিবার জন্য জাপান যে শক্তির পরিচয় দিয়াছিল তাহার ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলি জাপানের সহিত সন্ধির সর্তগুলি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইল। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক স্থাপন সম্বন্ধে জাপান সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল; চীনের এই স্বাধীনতা ছিল না। পাশ্চাত্ত্য দেশের নাগরিকগণ জাপানে বাসকালে জাপানী আইন ও বিচার-ব্যবস্থার অধীন হইল, কিন্তু এই বিষয়ে চীন সরকারের অধিকার তখনও পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি স্বীকার করে নাই। বিজয়ী জাপান আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন মর্যাদা লাভ করিল। পরাজিত চীন পূর্ববৎ পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির কাছে অবনত রহিল। কোরিয়া নামেমাত্র স্বাধীন রহিল, কিন্তু চীনের আধিপত্য বিলোপের ফলে কোরিয়ায় জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কৃত হইল।

জাপানের সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সন্ধির সর্ত পরিবর্তন

চীনের দুর্দশা (১৮৯৫-১৯০০): জাপানের হস্তে নিদারুণ পরাজয়ের ফলে বিশাল চীন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সমগ্র পৃথিবীর নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। তখন চীনের শাসকশ্রেণী ও জনসাধারণ ক্ষোভের বশবর্তী হইয়া বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিল; এইরূপ ক্ষোভ ও বিদ্বেষ যে দেশের অবস্থার উন্নতি না ঘটাইয়া বরঞ্চ অবনতি ঘটাইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। আর এক দিকে সংস্কারক দলের অভ্যুদয় হইল। এই দল বুঝিতে পারিল যে শাসনকার্যে ও সামরিক ব্যবস্থায় আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার প্রবর্তন করিলে চীন শক্তিশালী হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। জাপান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির অনুকরণ করিয়া শক্তিশালী হইয়াছে; চীনকেও সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে, প্রাচীন প্রথার প্রতি যুক্তিহীন শ্রদ্ধা চীনকে আরও নূতন বিপদের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনে এই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল।

চীনে প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ

শেষে নবীন দলের জয় হইল, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব প্রাচীন চীনের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন চীন সৃষ্টির সূচনা করিল।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি চীনের দুর্বলতার নূতন পরিচয় পাইয়া নিত্য নূতন দাবি জানাইতে লাগিল। জাপানকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য চীন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। উত্তমর্ণেরা কিছুদিন পরে স্ব স্ব রাজ্যসীমা প্রসার, রেলওয়ে নির্মাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে চীনের নিকট হইতে নূতন অধিকার আদায় করিয়া লয়। ফলে দক্ষিণ চীনে ফ্রান্স ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। এই দুইটি দেশের মধ্যে তখন ইউরোপে মৈত্রী স্থাপিত হইতেছিল, আর ইহাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জার্মানী। চীনে ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া জার্মানী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের একটি ভূখণ্ড অধিকার করিল এবং রেলওয়ে নির্মাণের সুযোগ পাইল। তখন ইংলণ্ড এবং ইটালীও চীনে স্ব স্ব অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিল। দুর্বল চীনে কে কোন্ বন্দর অধিকার করিবে, কে কোন্ প্রদেশে রেলওয়ে নির্মাণ করিবে, কে বাণিজ্য শুল্কের কতখানি অংশ পাইবে তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।

চীনে ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রভাব বিস্তার

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীনের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিলেও চীনে রাজ্য বিস্তারের বা রেলওয়ে নির্মাণের চেষ্টা করে নাই। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিগুলি যখন নিজেদের মধ্যে চীন সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া লইবার উদ্যোগ করিল তখন যুক্তরাষ্ট্র চীনের দিকে নূতনভাবে দৃষ্টিপাত করিল। 'সুদূর প্রাচ্যে' রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না (অবশ্য ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সহিত যুদ্ধের ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন হইয়াছিল) ; কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিবর্গ চীনে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া পরে চীনের সহিত আমেরিকার বাণিজ্যে বাধা দিতে পারে,এইরূপ সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং চীনে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যগত স্বার্থ স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিল যে চীনে সকল দেশের সমানভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার থাকিবে। এই নীতি ("Open Door" policy) ইউরোপীয় শক্তিবর্গ মানিয়া লইল। সকলের সমান অধিকার স্বীকৃতির ফলে চীনে বিভিন্ন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা খানিকটা কমিয়া গেল, কিন্তু চীন সরকারের দুর্বলতার

চীন সম্বন্ধে আমেরিকার নীতি

ফলে চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা হইল না।

বিদেশী শক্তিগুলির দীর্ঘকালব্যাপী লুণ্ঠনের ফলে চীনে যে ক্ষোভ ও আক্রোশ সঞ্চিত হইতেছিল তাহা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহে (Boxer Rebellion) পরিণত হইল। বিদেশীরা ছিল এই বিদ্রোহের লক্ষ্য, কারণ চীনের জনসাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে বিদেশীরাই তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। সংস্কারপন্থী দল অবশ্য দেশের দুর্বলতা ও দুর্দশার জন্য মাঞ্চু রাজবংশের কুশাসনকেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করিত। মাঞ্চু রাজবংশও বিদেশী ছিল, সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চুরিয়া হইতে আসিয়া চীন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। সংস্কারপন্থী দলের প্রচারকার্যের ফলে মাঞ্চু বংশের শাসন সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে বিদ্বেষের ভাব জাগিতেছিল।

'বক্সার' বিদ্রোহ

রাজবংশের জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের ভার লইলেন সম্রাজ্ঞী সে সি (Tse Hsi)। তিনি বলপ্রয়োগ দ্বারা শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া স্বয়ং পাশ্চাত্ত্য-বিরোধী ও সংস্কার-বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে জনসাধারণের মনে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েকটি গুপ্ত সমিতি এই বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন জোগাইতে লাগিল। সম্রাজ্ঞী মনে করিয়াছিলেন যে দেশবাসীর আক্রোশ বিদেশীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারিলে রাজবংশের জনপ্রিয়তা ফিরিয়া আসিবে।

প্রথমে এখানে-সেখানে খ্রীষ্টান পাদ্রী ও বিদেশী বণিকেরা নির্যাতিত ও নিহত হইতে লাগিল ; শেষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুন ও জুলাই মাসে পিকিং ও তিয়েনসিন (Tientsin) শহরে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চলিল। বহু বিদেশী এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী চীনা নিহত হইল। পিকিঙে বৈদেশিক দূতাবাসগুলি আক্রান্ত হইল ; জার্মানীর দূত এবং জাপানী দূতাবাসের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিহত হইলেন। শেষে ইউরোপ হইতে এক আন্তর্জাতিক বাহিনী চীনে পৌছিয়া শান্তি স্থাপন করিল। সম্রাজ্ঞী পিকিং হইতে পলায়ন করিলেন।

বিদেশীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা শেষ পর্যন্ত চীনের ক্ষতি করিল। চীন সরকার বিদেশী শক্তিগুলিকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইল। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশী সৈন্যদল মোতায়েন করা হইল। হয়তো এই সুযোগে ইউরোপীয় শক্তিগুলি আফ্রিকার মত চীনকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া নিজেদের মধ্যে

'বক্সার' বিদ্রোহের ফল

ভাগাভাগি করিয়া লইত, চীন যে নামমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল তাহাও বিলুপ্ত হইত। কিন্তু প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, পরে ইংলণ্ড ও জার্মানী চীনের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিল। ফলে চীন অপমান এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াই 'বক্সার' বিদ্রোহের দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (Russo-Japanese War, ১৯০৪-১৯০৫) : চীন-জাপান যুদ্ধের (১৮৯৪-১৮৯৫) পরে রাশিয়া ও জাপান 'সুদূর প্রাচ্যে' পরস্পরের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শিমনোসেকির সন্ধির পর প্রধানতঃ রাশিয়ার প্রতিবাদের ফলে লিয়াও-টুঙ উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার বন্দর জাপান চীনকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চীনের নিকট হইতে পোর্ট আর্থার বন্দর হস্তগত করে। রাশিয়ার রেলপথ (Trans-Siberian Railway) মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ব্লাডিভোস্টক এবং পোর্ট আর্থার পর্যন্ত প্রসারিত হইল। চীন সম্রাটের দরবারে অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তি অপেক্ষা রাশিয়ার মর্যাদা ও সমাদর বেশী ছিল। 'বক্সার' বিদ্রোহের পর রাশিয়া সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক প্রভুত্ব (military protectorate) স্থাপনের জন্য চীনের সহিত আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিল। অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির প্রতিবাদে এই প্রস্তাব স্থগিত রাখা হইল, কিন্তু মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিবার জন্য রাশিয়ার ব্যগ্রতা আর গোপন রহিল না।

রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের চেষ্টা

'সুদূর প্রাচ্যে' ক্রমবর্ধমান অধিকার কেবলমাত্র জাপানের আশঙ্কার কারণ হয় নাই, এশিয়ায় রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ড ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই রাশিয়ার প্রভাব সীমাবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও জাপান ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল (Anglo-Japanese Alliance)। এই সন্ধি কিছু কিছু পরিবর্তন সহ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রী স্থাপনের ফলে জাপানের শক্তি ও মর্যাদা বাড়িল। ইতিপূর্বে ইংলণ্ড এশিয়ার কোন দেশের সহিত রাজনৈতিক মর্যাদার সমতার ভিত্তিতে (on a footing of equality) মৈত্রী স্থাপন করে নাই ; প্রাচ্যদেশে জাপানই সর্বপ্রথম একটি বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তির নিকট এই মর্যাদা লাভ করিল।

জাপানের সহিত ইংলণ্ডের মিত্রতা

রাশিয়া ইতিপূর্বেই মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিল। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীতে শঙ্কিত হইয়া রাশিয়া এই সৈন্যবাহিনী ধীরে ধীরে সরাইয়া লইতে

স্বীকৃত হইলেও নানা অজুহাতে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হইল না, এবং কোরিয়াতেও রাশিয়ার সৈন্যদল প্রবেশ করিল। প্রকৃতপক্ষে মাঞ্চুরিয়া রাশিয়ার সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হইয়া দাঁড়াইল এবং কোরিয়াতে রাশিয়ার প্রভাব বাড়িতে লাগিল। মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়া রাশিয়ার হস্তগত হইলে জাপানের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আত্মশক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী জাপান এই বিপদের মূলোৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। আলাপ আলোচনা দ্বারা মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪)।

রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধে জাপানের জয় হইল—জলে ও স্থলে রাশিয়ার বিরাট বাহিনী জাপানীদের কাছে দাঁড়াইতে পারিল না। মুকডেনের যুদ্ধে ১৪০ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে রাশিয়ার বাহিনী বিধ্বস্ত হইল। সুসীমার নৌযুদ্ধে (naval battle of Tsushima) সেনাপতি টোগো (Togo) রাশিয়ার নৌ-বাহিনী ধ্বংস করিলেন (১৯০৫)। একশত বৎসর পূর্বে ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসন যে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন একমাত্র তাহারই সহিত টোগোর এই সাফল্যের তুলনা করা যায়।

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (Treaty of Portsmouth : আগস্ট, ১৯০৫) দ্বারা যুদ্ধের অবসান হইল। লিয়াও-টুঙ উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার বন্দর জাপানের হস্তগত হইল। পোর্ট আর্থারের সংলগ্ন রাশিয়ার রেলপথের খানিকটা জাপানের কর্তৃত্বাধীন হইল। রাশিয়া সমগ্র মাঞ্চুরিয়া ও সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ ত্যাগ করিল এবং কোরিয়ায় জাপানের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইল। মাঞ্চুরিয়া নামে চীনের অধীনে রহিল, কিন্তু দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের প্রভাব প্রবল হইল।

রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল

রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া জাপান 'সুদূর প্রাচ্যের' শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিগণিত হইল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে—বিশেষতঃ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে—তাহার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জাপানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া অধিকার করিল। চীনের মূল ভূখণ্ডে অধিকার বিস্তারের জন্য জাপান ইউরোপীয় শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। চীন বিপ্লব এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানের পক্ষে চীনে প্রবেশের পথ সুগম করিল। জাপান পূর্ণোদ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করিল। পরাজিত রাশিয়ার দুর্বলতা

রুশ-জাপান যুদ্ধের পরোক্ষ ফল

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটিল। ইংলণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করিয়া রাশিয়া তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল (১৯০৭)। বলকান অঞ্চলে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় রাশিয়ার পরোক্ষ ক্ষতি হইল।

চীনে বিপ্লব, ১৯১১ (The Chinese Revolution of 1911) : দীর্ঘকাল যাবৎ চীনের মাঞ্চু রাজবংশ ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী সে সির (Tse Hsi) মৃত্যুর পর এই জরাগ্রস্ত, বিদেশী রাজবংশের পতন নিশ্চিত হইয়া পড়িল। 'বক্সার' বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর তিনি শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিয়া রাজবংশ রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ শাসন-সংস্কারের দাবি তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের কোন যোগ্য নায়ক না থাকায় মাঞ্চু বংশ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না।

বিপ্লবের নায়ক

বিপ্লবীদের নায়ক ছিলেন সান ইয়াৎ সেন (Sun Yat Sen)। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবের পথ গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ এবং আমেরিকান মিশনারীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহাদের প্রভাবে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সহিত পরিচিত হন। সরকারী নির্যাতনের ভয়ে তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে থাকিয়া বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করেন। চীনের শিক্ষিত সমাজে এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। চীনা ভাষায় এবং ইংরেজীতে তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন।

মাঞ্চু বংশের পতন
সাধারণতন্ত্র গঠন

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে বিপ্লব আরম্ভ হইল। পর বৎসর মাঞ্চু সম্রাট পদত্যাগ করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯১২)। ইতিমধ্যে সান ইয়াৎ সেনের নায়কত্বে চীনে সাধারণতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনি প্রথম রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় এই উচ্চপদ ত্যাগ করেন এবং য়ুয়ান শি-কাই (Yuan Shi-Kai) নামে মাঞ্চু রাজবংশের একজন প্রভাবশালী সেনাপতিকে রাষ্ট্রপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। সান ইয়াৎ সেনের এই কার্য মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইলেও ইহা চীনের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নাই, কারণ য়ুয়ান শি-কাই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানাপ্রকারে চীনের অনিষ্ট করিয়াছিলেন এবং সাধারণতন্ত্রের

য়ুয়ান শি-কাই

অবসান করিয়া পুনরায় রাজতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য এবং জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি বিপ্লবী চীনকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। এই বিরাট আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানের পূর্বেই চীন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িল।

নবম অধ্যায়

নূতন মহাদেশ

স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন: পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ইংলণ্ড তেরটি উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া প্যারিসের সন্ধিতে স্বাক্ষর করে। যে বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (United States of America) নামে পরিচিত তাহা বৈধভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

যুদ্ধাবসানে সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিয়া সেনাপতি ওয়াশিংটন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দেশে অর্থনৈতিক গোলযোগ এবং আংশিক অরাজকতা দেখা দিল; নানা বিষয়ে বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে স্বার্থসংঘর্ষ ও মতবিরোধ আরম্ভ হইল। তেরটি উপনিবেশের উপর কোন কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় প্রত্যেকটি উপনিবেশই স্বাধীনভাবে কাজ করিতে লাগিল। ফিলাডেলফিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ছিল বটে, কিন্তু ইহার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উপনিবেশগুলি যে সঙ্ঘ (Confederation) গঠন করে তাহার কর আদায় করিবার ক্ষমতাও ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবে স্বাধীন উপনিবেশগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা

নূতন সংবিধান: এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া শহরে এক সম্মেলনে (Convention) উপস্থিত হইয়া একটি নূতন সংবিধান (Constitution) রচনা করেন। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ওয়াশিংটন; সভ্যদের মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin), ম্যাডিসন (Madison), আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন (Alexander Hamilton) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সংবিধান প্রস্তুত

হইলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন উপনিবেশ ইহা গ্রহণ করিল (১৭৮৮-১৭৮৯)। এতদিন তেরটি উপনিবেশ প্রকৃত প্রস্তাবে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইল। কয়েকটি সংশোধন (Amendment) সহ এই সংবিধান এখনও যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

ওয়াশিংটন (১৭৮৯-১৭৯৭) ঃ নূতন সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন ওয়াশিংটন। তিনি পর পর দুইবার নির্বাচিত হইয়া মোট আট বৎসরকাল এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ নৌ-বহর পতাকা নামাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং নেপোলিয়ন তাঁহার সম্মানার্থ একটি স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন।

রাষ্ট্রনায়কত্ব গ্রহণ (এপ্রিল, ১৭৮৯) করিয়া ওয়াশিংটন বহু কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তখন যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল। ইহার আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। রাজকোষে অর্থ ছিল না। সৈন্য-সামন্ত ছিল না। স্থায়ী রাজধানী ছিল না। রাজ্য পরিচালনার সমুদয় ব্যবস্থা নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল।

এই কঠিন কার্যে ওয়াশিংটনের প্রধান সহায় ছিলেন দুইজন ঃ নবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী (Secretary of the Treasury) আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী (Secretary of State) টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson)। ইহাদের উভয়েরই যোগ্যতা, দূরদর্শিতা এবং স্বদেশপ্রেম ছিল ; কিন্তু উভয়ের মতবাদে মৌলিক পার্থক্য ছিল, এবং কার্যক্ষেত্রে সহযোগী হইলেও দুইজনের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঈর্ষা ছিল। নূতন রাষ্ট্রের গঠনকার্যে দুইজনেরই যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল।

হ্যামিল্টন ও জেফারসন

হ্যামিল্টন নবগঠিত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের (Federal Executive) এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার (Congress) ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চাহিতেন। জেফারসন কেন্দ্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিয়া রাষ্ট্রগুলিকে (States) শক্তিশালী করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। গণতন্ত্রে হ্যামিল্টন অপেক্ষা জেফারসনের অনেক বেশী বিশ্বাস ছিল। দুইজনের মতবাদ ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের পার্থক্যকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিল। হ্যামিল্টনের সমর্থকগণ Federalist নামে

পরিচিত হইল, জেফারসনের অনুগামিগণ Democrat রূপে খ্যাত হইল। Federalist দলের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু Democrat দল পরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মত ও আদর্শ অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছিল।

ওয়াশিংটনের শাসনকালে হ্যামিল্টন আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধ (Revolutionary War) চলিতেছিল। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রতি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল। জেফারসন বলিয়াছিলেন, "স্বাধীনতা-তরুকে সময় সময় দেশসেবকগণের এবং অত্যাচারীদের রক্তে সিঞ্চিত করিতে হয়।" ("The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.") আমেরিকা যাহাতে ইংলণ্ডের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বিপ্লবের সমর্থন করে এজন্য ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু ওয়াশিংটন ইউরোপের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা নীতি অক্ষুণ্ণ ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি

ওয়াশিংটন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইতে অসম্মত হইলেন। তখন জন্ আডাম্‌স্ (John Adams) দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি (১৭৯৭-১৮০১) নির্বাচিত হইলেন। তিনি Federalist দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত আমেরিকার যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল।

'ভার্জিনিয়া বংশ' (The Virginian Dnasty), ১৮০১-১৮২৫ : আডাম্‌সের পরে তৃতীয় রাষ্ট্রপতি হইলেন জেফারসন (১৮০১-১৮০৯)। তিনি এবং তাঁহার পরবর্তী দুইজন রাষ্ট্রপতি—জেম্‌স্ ম্যাডিসন (James Madison, ১৮০৯-১৮১৭) এবং জেমস্ মন্‌রো (James Monroe, ১৮১৭—১৮২৫)—ভার্জিনিয়া (Virginia) রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। এই জন্য এই যুগকে 'ভার্জিনিয়া বংশের শাসনকাল' বলা যায়।

জেফারসনের নির্বাচনের ফলে Dem ocrat দল ক্ষমতা অধিকার করিল, হ্যামিল্টনের মৃত্যু এবং অন্যান্য কারণে Federalist দল লুপ্তপ্রায় হইল। কিন্তু ঘটনাচক্রে জেফারসন অর্থনীতি ও সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হ্যামিল্টনের মত

অনেকাংশে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং Federalist দল ছিন্নভিন্ন হইলেও ইহার মতবাদ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিল।

ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ (১৮১২-১৮১৪) : ম্যাডিসনের শাসনকালের প্রধান ঘটনা ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মূল কারণ পরোক্ষভাবে ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট। নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বিনষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড নৌবলের সাহায্যে ফ্রান্সকে দুর্বল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মত নিরপেক্ষ (neutral) দেশগুলির সামুদ্রিক বাণিজ্য নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রণতরী আমেরিকার উপকূলে উপস্থিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করিত। সমুদ্রবক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজের পথরোধ করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য আটক করা হইত। ইউরোপের কোন বন্দরই যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এই সকল অসুবিধার সহিত পরে আর একটি নূতন অসুবিধা যোগ হইল। অনেক সময় ইংরেজ নাবিকেরা বেআইনীভাবে ইংলণ্ডের জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজে চাকুরী লইত। ইংলণ্ডের যুদ্ধ জাহাজ সুযোগ পাইলেই যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ আটক করিয়া এই সকল দলত্যাগী (deserter) ইংরেজ নাবিকের সন্ধান করিত এবং সন্ধান পাইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিত। জেফারসন ও ম্যাডিসন কয়েক বৎসর এই উপদ্রব বন্ধ করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিলেন। শেষে হেনরী ক্লে (Henry Clay), জন ক্যাল্‌হুন (John C. Calhoun) প্রভৃতি গরমপন্থী রাজনৈতিক নেতার চাপে ম্যাডিসন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

কারণ

এই যুদ্ধ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা বিজয়ের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ক্যানাডা বিজয়ের প্রবল বাসনা এই সময়ে যুদ্ধ ঘোষণার একটি প্রধান কারণ। কিন্তু ইংলণ্ড ক্যানাডাকে সামরিক সাহায্য দিতে না পারিলেও ক্যানাডাবাসীরা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

একদল ইংরেজ সৈন্য যুক্তরাষ্ট্রের নূতন রাজধানী ওয়াশিংটন শহর অধিকার করিয়া রাষ্ট্রপতির বাসগৃহ ভস্মীভূত করিল। সমুদ্রবক্ষে দুই দেশের রণতরী কিছুকাল যুদ্ধ চালাইল। যখন শান্তি স্থাপিত হইল (Peace of Ghent, ১৮১৪)

তখন যুদ্ধের মূল কারণগুলি সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না ; তবে নেপোলিয়নের সহিত সংগ্রামের অবসান হইলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি দূর হইল, দলত্যাগী নাবিক সম্বন্ধেও গোলযোগের কারণ রহিল না। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হইল। যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে নূতন জাতীয়ভাবের উন্মেষ হইল, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ জাতীয় ঐক্যের এক নূতন সূত্র রচনা করিল। এই জন্য এই যুদ্ধকে স্বাধীনতার দ্বিতীয় সংগ্রাম ("Second War of Independence") বলা যায়।

ফল

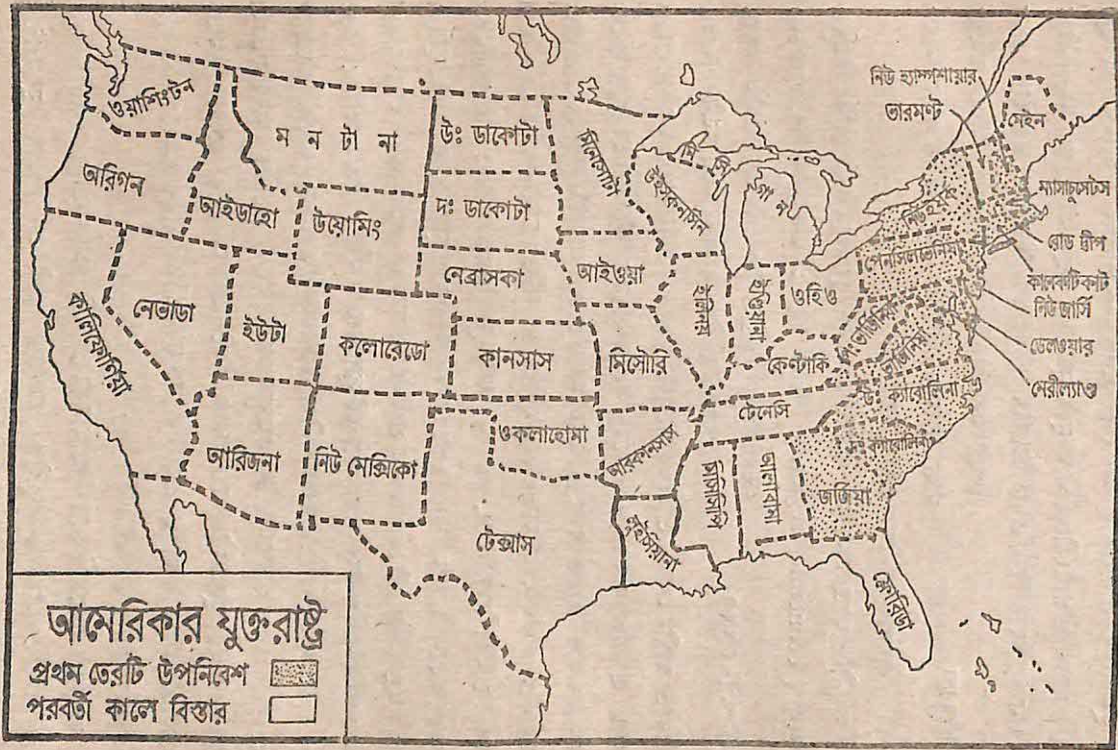
যুক্তরাষ্ট্রের প্রসার : ইংরেজ আমলেই তেরটি উপনিবেশের মধ্যে কয়েকটি পশ্চিমদিকে সুবৃহৎ ভূখণ্ড অধিকার করিয়া তথায় বসতি স্থাপনের বন্দোবস্ত করিতেছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই উপনিবেশগুলি নবাধিকৃত ভূখণ্ডে স্ব স্ব দাবি পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের উপর ইহার কর্তৃত্বভার অর্পণ করে। কংগ্রেস এই ভূখণ্ডের শাসনের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা করিল এবং ভবিষ্যতে এখানে রাষ্ট্র (State—অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনের অধিকারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র) গঠনের পথ উন্মুক্ত রাখিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই অঞ্চলে পাঁচটি রাষ্ট্র গঠিত হইল।

পশ্চিমে প্রসার

ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আরও অনেকগুলি রাষ্ট্র যোগ দিয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসন নেপোলিয়নের নিকট হইতে লুইসিয়ানা (Louisiana) ক্রয় করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সহিত সন্ধিসূত্রে পূর্ব ফ্লোরিডা (East Florida) যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হয়। মেক্সিকোর অন্তর্গত টেক্সাস (Texas) প্রদেশ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোর অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর পরে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর মেক্সিকোর সহিত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং যুদ্ধশেষে টেক্সাস হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ভূখণ্ডে পরে তিনটি রাষ্ট্র (New Mexico, Arizona, California) গঠিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা (Alaska) ক্রয় করা হয়।

বিভিন্ন উপায়ে রাজ্যখণ্ড অধিকার

গৃহযুদ্ধের (Civil War) সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ৩৩—বর্তমানে ৫০। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসার দৈবকর্তৃক নির্দিষ্ট ("Manifest Destiny") বলিয়াই আমেরিকাবাসীরা মনে করিত। আটলান্টিক মহাসাগর


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
প্রথম তেরটি উপনিবেশ
পরবর্তী কালে বিস্তার
ওয়াশিংটন
মনটানা
উঃ ডাকোটা
অরিগন
আইডাহো
উয়োমিং
দঃ ডাকোটা
নেব্রাসকা
আইওয়া
নেভাডা
ইউটা
কলোরেডো
কানসাস
মিসৌরি
ওহিও
কেন্টাকি
টেনেসি
ওকলাহোমা
আরিজনা
নিউ মেক্সিকো
টেক্সাস
জর্জিয়া
নিউ হ্যাম্পশায়ার
ভারমণ্ট
মেইন
ম্যাসাচুসেটস
রোড দ্বীপ
কানেকটিকাট
নিউ জার্সি
ডেলাওয়ার
মেরীল্যাণ্ড
উঃ ক্যারোলিনা

হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর।

প্রসারের ফল

যুক্তরাষ্ট্রের সীমারেখার প্রসারের ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিল, ভাগ্যান্বেষীদের পক্ষে নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইল। ক্যালিফোর্নিয়ার স্বর্ণখনি আবিষ্কার ইহার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই নবপ্রসারিত বিস্তীর্ণ দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য বহু রাজপথ নির্মিত হইল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিল।

তিনটি আর্থিক অঞ্চল

অর্থনীতিক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র তিনটি বিভিন্ন আর্থিক অঞ্চলে (economic region) বিভক্ত হইল: উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে শিল্পের উন্নতি হইল, কলকারখানা স্থাপিত হইল, নিগ্রো ক্রীতদাসদের পরিবর্তে স্বাধীন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের প্রয়োজন হইল। এই অঞ্চলে কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদি দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে বিক্রয় হইত। ইউরোপ হইতে কলকারখানায় প্রস্তুত যে সকল দ্রব্য আমেরিকায় আমদানি করা হইত তাহাও উত্তরাঞ্চলের বণিকদের হাত দিয়া দক্ষিণে ও পশ্চিমে চালান হইত। পশ্চিম অঞ্চল কৃষিজীবীদের দেশ, এখানে যে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য থাকিত তাহা প্রধানতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে চালান করা হইত। দক্ষিণ অঞ্চলে তূলা উৎপন্ন হইত, তূলার চাষের জন্য নিগ্রো ক্রীতদাসদিগকে শ্রমিকরূপে ব্যবহার করা হইত। ইউরোপের কলকারখানায় বস্ত্র উৎপাদনের জন্য এই তূলা রপ্তানি করা হইত, বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যাইত তাহা দক্ষিণের ধনীরা ব্যবহার করিত পশ্চিম হইতে খাদ্যদ্রব্য এবং উত্তর হইতে কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহের জন্য। আর্থিক অবস্থার এই মৌলিক পার্থক্য যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করিত। দাসত্ব প্রথা বিলোপের প্রশ্নটিও আর্থিক অবস্থার পার্থক্যের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিল।

দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা: রাষ্ট্রপতি মনরোর সময়ে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় ও পর্তুগীজ প্রজাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে নূতন মহাদেশে স্পেন ও পর্তুগাল বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ড স্পেনের অধিকারভুক্ত ছিল, কেবলমাত্র ব্রাজিল ছিল পর্তুগালের অধীন। ইউরোপে স্পেন ও পর্তুগাল দুর্বল হইয়া পড়িলেও নূতন মহাদেশে তাহাদের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপে নেপোলিয়নের রাজ্য জয়ের ফলে আমেরিকায় স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের বিরাট পরিবর্তন আরম্ভ হইল।

দক্ষিণ আমেরিকায় পরিবর্তনের কারণ

এই পরিবর্তনের (১৮২০-১৮৩০) মূল কারণ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, উচ্চ শ্রেণীর স্পেনীয় ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে অনেকেই ইউরোপে যাতায়াত উপলক্ষ্যে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়াছিল। উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভের দৃষ্টান্তও তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছিল। মাতৃভূমির অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভের বাসনা তাহাদের মনে প্রবল হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, স্পেনীয় শাসন ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর লোকের অনেক অভিযোগ ছিল। এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে পুরোহিত শ্রেণী তাহাদিগকে সজাগ করিয়া রাখিত। সুতরাং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবি সমাজের নিম্নস্তরেও দেখা দিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধের (Revolutionary War) পূর্বে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল না, স্পেনীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র স্পেনের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিত। কিন্তু বিপ্লবের যুদ্ধ এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধ স্পেনীয় সরকারের এই স্বার্থপর নীতির বিলোপ সাধন করিয়াছিল ; ইংলণ্ডের নৌবল দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিয়া স্পেনীয় ঔপনিবেশিকগণ লাভবান হইতেছিল। স্পেনের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হইলে তাহারা এই লাভজনক বাণিজ্যের সুযোগ হারাইবে, স্পেন আবার পুরাতন নীতি প্রবর্তন করিবে। সুতরাং ঔপনিবেশিকগণের বাণিজ্যসংক্রান্ত স্বার্থরক্ষার জন্য স্পেনের আধিপত্য বিলোপের প্রয়োজন ছিল।

স্পেনের বুর্বোঁ রাজবংশের দুর্বলতা এবং নেপোলিয়নের উচ্চাভিলাষ স্পেনের ঔপনিবেশিক প্রজাদের সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দিল। নেপোলিয়ন স্পেন অধিকার করিয়া বুর্বোঁ রাজা ফার্দিনান্দের পরিবর্তে স্বীয় ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (১৮০৮)। স্পেনের জনসাধারণ এই

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিল (Peninsular War)। তখন জোসেফের পক্ষে আমেরিকায় সাম্রাজ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইল না। সমগ্র স্পেনীয় আমেরিকায় বিদ্রোহের বন্যা বহিয়া গেল।

ভেনিজুয়েলায় (Venezuela) বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন ফ্রান্সিস্কো মিরান্দা (Francisco Miranda)। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মেক্সিকোতে (New Spain) মিগুয়েল হিদাল্‌গো (Miguel Hidalgo) নামক এক ক্যাথলিক পাদ্রী কৃষকগণকে বিপ্লবের পথে টানিয়া আনিলেন। চিলিতে বিদ্রোহের নায়ক হইলেন বার্নার্ডো ও'হিগিন্‌স্ (Bernardo O'Higgins) নামক জনৈক অভিজ্ঞ যোদ্ধা। মিরান্দার সহযোগী হইলেন সাইমন বলিভার (Simon Bolivar)। তিনি ছাত্র অবস্থায় স্পেনে বাসকালে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র স্পেনীয় আমেরিকা মুক্ত করিবার শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সকল জননায়ক প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। স্পেনীয় শাসনের সমর্থক প্রতিক্রিয়াশীল দল বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইল। হিদাল্‌গো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, মিরান্দা কারাগারে প্রাণ দিলেন। ও'হিগিন্‌স্ এবং বলিভার পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

দক্ষিণ আমেরিকায় বিদ্রোহ

কিন্তু নানাবিধ বাধা-বিপত্তি এবং অত্যাচার সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতাকামী দলের জয় হইল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যান মার্টিনের (San Martin) নায়কত্বে আর্জেন্টিনা স্বাধীন হইল। তিনি স্পেনে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া "উপদ্বীপের যুদ্ধে" ফরাসীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ও'হিগিন্‌সের সহায়তায় তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে চিলি এবং ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে পেরু স্বাধীন করিলেন। প্যারাগুয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে (১৮১১) স্বাধীন হইয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বলিভারের নেতৃত্বে ভেনিজুয়েলা স্বাধীনতা লাভ করিল। মেক্সিকো ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হইল এবং দুই বৎসর রাজতন্ত্রী শাসন চলিবার পর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। গুয়াতেমালা প্রথমে স্বাধীন মেক্সিকোর অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হইয়া গেল।

বিদ্রোহের সাফল্য

স্বাধীনতা লাভের পর স্পেনীয় সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইল। এই আন্দোলনের নায়ক হইলেন বলিভার।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নূতন গ্রানাডা (New Granada), পানামা, ভেনিজুয়েলা এবং একুয়েডর সম্মিলিত করিয়া কলম্বিয়া রাষ্ট্র গঠন করিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষ প্রবল হইয়াছিল এবং দূরদৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছিল। ফলে বলিভারের নীতি ব্যর্থ হইল। তাঁহার মৃত্যুর (১৮৩০) পূর্বেই কলম্বিয়া তিনটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল। আজ পর্যন্ত তাঁহার স্বপ্ন সফল হয় নাই, দক্ষিণ আমেরিকায় ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু স্পেনীয় আমেরিকার ইতিহাসে তাঁহার নাম অমর হইয়া রহিয়াছে।

ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা

পর্তুগালের অধীন ব্রাজিলেও স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হইয়াছিল। নেপোলিয়ন পর্তুগাল আক্রমণ করিলে (১৮০৭) পর্তুগালের রাজা ষষ্ঠ জন দেশত্যাগ করিয়া ব্রাজিলে উপস্থিত হন এবং তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। স্পেনীয় সাম্রাজ্যের বিপ্লব যখন ব্রাজিলে সংক্রামিত হইল তখন তিনি বাণিজ্য ও শাসনকার্য সম্বন্ধে উদার নীতি অবলম্বন করিয়া নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র পেড্রোকে (Dom Pedro) ব্রাজিলে রাখিয়া পর্তুগালে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রাজলে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহীরা পেড্রোর সমর্থন পাইয়া তাঁহাকে ব্রাজিলের সিংহাসনে স্থাপন করিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজা ব্রাজিলের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। ব্রাজিল একটি স্বাধীন সাম্রাজ্যরূপে পরিগণিত হইল।

ব্রাজিল

মনরোর নীতি (Monroe Doctrine) : স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ নেপোলিয়নের পতনের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল পরে স্পেনে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইল; মেটারনিকের ইঙ্গিতে ফরাসী বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করিল (১৮২৩)। কিন্তু স্পেনীয় আমেরিকায় বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিয়া ফার্দিনান্দ বিফল হইলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকা যে নীতি অবলম্বন করিল তাহাই দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার কারণ হইল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন জর্জ ক্যানিং (George Canning)। তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রিটিশ বণিকদিগের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নেপোলিয়নের সহিত স্পেনের যুদ্ধের ফলে স্পেনের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে স্পেনের পুরাতন নীতি অচল হইয়া

ইংলণ্ডের নীতি

গিয়াছিল। এই সুযোগে ব্রিটিশ রণতরী দ্বারা সুরক্ষিত ব্রিটিশ বণিকেরা দক্ষিণ আমেরিকায় লাভজনক বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হইলে এই লাভজনক বাণিজ্য তাহাদের হস্তচ্যুত হইবে, ইহা নিশ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিতে উৎসুক ছিল। এই জন্য ক্যানিং দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং স্পেন যাহাতে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে জয় করিতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেন। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী আটলান্টিক মহাসাগরে অপ্রতিহত শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই নৌ-বাহিনীর দৃষ্টি এড়াইয়া বা ইহাকে উপেক্ষা করিয়া স্পেনীয় সৈন্যদল বিদ্রোহ দমনের জন্য দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতে পারিত না। সুতরাং অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমর্থন সত্ত্বেও স্পেন বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে জয় করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিল না। সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য আমেরিকায় স্পেনীয় সাম্রাজ্যের বিলোপের কারণ হইল।

দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষায় ক্যানিং-এর সহযোগী ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মনরো। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কয়েকটি নূতন নীতি ঘোষণা করিলেন: (১) যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় শক্তিবর্গের যুদ্ধে অথবা তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। (২) নূতন মহাদেশের যে সকল অংশে ইউরোপীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত আছে (যেমন,—ক্যানাডায় ইংরেজ অধিকার এবং গিনিতে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ অধিকার) সেখানেও যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিবে না। (৩) কিন্তু নূতন মহাদেশের যে সকল অংশে কোন ইউরোপীয় শক্তির অধিকার বিলুপ্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সকল অংশে ইউরোপীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইলে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতাচরণ রূপে গণ্য হইবে—অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিবে।*

মনরো নীতির মর্ম

* "In the wars of the European powers, in matters relating to themselves we have never taken any part, nor does it comport with our policy so to do ... ... We should consider any attempt on their (অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়ার উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইয়াছে) part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety. With the existing colonies and dependencies of any European power we have not interfered and shall not interfere. But with the

আমেরিকার ইতিহাসে মনরোর এই ঘোষণাটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকার নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করা—অস্ট্রিয়া প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে স্পেন কর্তৃক সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনে বাধা দেওয়া। কিন্তু ইংলণ্ডের সমর্থন এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সহযোগিতা ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সফল হইত না। তখন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বল ও নৌবল সামান্যই ছিল; স্পেনীয় বাহিনীকে আটলান্টিক মহাসাগরে বাধা দেওয়া বা দক্ষিণ আমেরিকায় পরাজিত করা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হইত না।

কিন্তু মনরোর ঘোষণার পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। প্রথমতঃ, এই ঘোষণা দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল, নূতন মহাদেশে গণতন্ত্রের অভিভাবক ও রক্ষাকর্তা হইয়া দাঁড়াইল। যদি কোন ইউরোপীয় শক্তি ভবিষ্যতে দক্ষিণ আমেরিকায় রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করে তবে যুক্তরাষ্ট্রকে সেই চেষ্টায় বাধা দিতে হইবে। এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র নূতন মর্যাদা ও প্রভাবের অধিকারী হইল। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলি পরাক্রান্ত প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব মানিয়া লইল। কালক্রমে সমগ্র নূতন মহাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব (suzerainty) পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইল। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় শক্তিবর্গের যুদ্ধে বা তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিল। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত—এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল। ইউরোপের গোলযোগ হইতে দূরে থাকিয়া যুক্তরাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতেও যুক্তরাষ্ট্র মনরোর নীতি বিস্মৃত হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বিরোধ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিবার নীতি (policy of isolation) পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিল। মনরোর ঘোষণা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির একটি মৌলিক ভিত্তি।

মনরোর ঘোষণার ফল

Governments who have declared their independence and maintained it, and whose independence we have on great consideration and on just principles acknowledged, we could not view any interposition for the purpose of oppressing them or controlling in any other manner their destiny by any European power in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States."

মনরোর পরবর্তী রাষ্ট্রপতিগণ (১৮২৫-১৮৬১) ঃ মনরোর বিদায়গ্রহণ হইতে গৃহযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত ৩৬ বৎসরে দশজন রাষ্ট্রপতি* যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক এবং আপোষ মীমাংসার চেষ্টা এই যুগের ইতিহাসে প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই চেষ্টা সফল না হওয়ায় গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িল।

রাষ্ট্রপতি জ্যাক্সনের আমলে (১৮২৯-১৮৩৭) আমেরিকার রাজনৈতিক জীবনে দুইটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। প্রথমতঃ, তিনি স্বয়ং চরমপন্থী (radical) গণতন্ত্রবাদী ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে আভিজাত্যের প্রভাব কমিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি পুরাতন সরকারী কর্মচারীদিগকে বরখাস্ত করিয়া শূন্য পদে নিজের দলভুক্ত লোক নিযুক্ত করেন। ইহার নাম spoils system বা লুণ্ঠন নীতি—অর্থাৎ যে দল নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিবে সেই দলের লোকেরাই ছোট-বড় সকল রকম সরকারী চাকুরী পাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে যোগ্যতার সমাদর হয় না, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাজের সকল স্তরে প্রসারিত হয়। তথাপি এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল।

জ্যাক্সন

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বাড়িতেছিল, দেশে আর্থিক সম্পদ সঞ্চিত হইতেছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি হইতেছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'আমেরিকার বিশ্বকোষ' (*Encyclopaedia Americana*) প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক এমার্সন (Emerson, ১৮০৩-১৮৮২), ওয়াশিংটন আরভিং (Washington Irving, ১৭৮৩-১৮৫৯), এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe, ১৮০৯-১৮৪৯), কবি লংফেলো (Longfellow, ১৮০৭-১৮৮২) প্রভৃতি এই যুগে আমেরিকার নিজস্ব ইংরেজী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কয়েকজন ঐতিহাসিক (Bancroft, Motley, Prescott) আমেরিকা ও ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সুপ্রীম কোর্টের (Supreme Court) প্রধান বিচারপতি মার্শ্যাল (John

যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ উন্নতি

* John Quincy Adams (1825-1829), Andrew Jackson (1829-1837), Van Buren (1841), Harrison (1841), Tyer (1841-1845), Polk (1845-1849), Taylor (1849-1850), Fillmore (1850-1853), Pierce (1853-1857), Buchanan (1857-1861). বুকাননের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের সময়ে (১৮৬১-১৮৬৫) গৃহযুদ্ধ ঘটে।

Marshall) আমেরিকার সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গভীর আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবিদ ছিলেন।

দাসত্ব প্রথা (Slavery) : আমেরিকার উপনিবেশগুলি যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন একমাত্র ম্যাসাচুসেট্‌স ব্যতীত অন্য বারটি উপনিবেশে দাসত্ব প্রথা (অর্থাৎ নিগ্রো ক্রীতদাসদের ক্রয়বিক্রয়) প্রচলিত ছিল। ইহার দুইশত বৎসর পূর্বে আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় নিগ্রো আমদানি প্রথা চালু হইয়াছিল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে আইন দ্বারা যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্বত্র আফ্রিকা হইতে নিগ্রো আমদানি বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বে যে সকল নিগ্রো আমদানি করা হইয়াছিল তাহাদের বংশধরগণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং আইনের দৃষ্টিতে তাহারা অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দাসরূপে গণ্য হইত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরাঞ্চলে ম্যাসাচুসেট্‌সে নিগ্রোরা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ১, আর দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ ক্যারোলিনায় শতকরা ৫৫ ভাগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিগ্রোরা কোন কোন রাষ্ট্রে দাসরূপে গণ্য হইত, কোন কোন রাষ্ট্রে দাসরূপে গণ্য হইত না। সাধারণতঃ উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে তাহারা স্বাধীনতা পাইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে তাহাদের দাসত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। যাহারা দাসত্ব প্রথা পছন্দ করিত না তাহারা আশা করিত যে ইহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে। দক্ষিণাঞ্চলে তুলার চাষের প্রসার হওয়ায় এই আশা ব্যর্থ হইল। নিগ্রো ক্রীতদাসদিগকে তুলার আবাদে (cotton plantations) শ্রমিকরূপে ব্যবহার করিয়া দক্ষিণের ধনী ব্যক্তিরা প্রচুর লাভ করিত। তাহারা দাসত্ব প্রথা তুলিয়া দিয়া আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না।

দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে পার্থক্য

উত্তরাঞ্চলের ধনীদের এই সমস্যা ছিল না, তাহারা কলকারখানায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের পরিবর্তে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক ব্যবহার করিত। তূলার আবাদে কঠোর কায়িক শ্রম আবশ্যক হইত, নিগ্রোদের কাছে তাহা পাওয়া যাইত। কল-কারখানায় বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োজন হইত, শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরাই সেখানে ভাল কাজ করিতে পারিত। সুতরাং উত্তরাঞ্চলে দাসত্ব প্রথা বিলোপের প্রশ্নের সহিত কোন জটিল আর্থিক প্রশ্ন জড়িত ছিল না।

দক্ষিণাঞ্চলের তূলার আবাদের মালিকেরা যে সর্বদাই ক্রীতদাসদের উপর

নিষ্ঠুর নির্যাতন করিত তাহা নহে। 'টম কাকার কুটির' (Uncle Tom's Cabin, Harriet Beecher Stowe রচিত) নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসে দাসত্ব প্রথার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা স্থানবিশেষে ও কালবিশেষে সত্য হইলেও সাধারণভাবে সত্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মালিকেরা দাসদাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিত। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসের বংশধর মানুষ রূপে গণ্য ছিল না, সুতরাং মানুষের কোন অধিকারই তাহারা দাবি করিতে পারিত না। তাহাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বিন্দুমাত্র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ছিল না, তাহাদের স্বোপার্জিত অর্থে কোন অধিকার ছিল না। দাসকে আঘাত করিলে—এমন কি হত্যা করিলে—প্রভু আইনতঃ দণ্ডনীয় হইত না। প্রকৃত পক্ষে দাসদাসীরা প্রভুর তৈজসপত্রের (chattel) সামিল ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াও তাহারা নাগরিক (citizen) রূপে গণ্য হইত না। তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার অধিকার ছিল না, বাইবেল পড়িবার চেষ্টা করিলেও তাহারা দণ্ডনীয় হইত।

দাসগণের অবস্থা

এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার স্বপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলে যুক্তির অভাব হয় নাই। কেহ কেহ বলিত, প্রকৃতির এবং ঈশ্বরের নির্দেশ এই যে নিম্নশ্রেণীর মানুষ উচ্চশ্রেণীর মানুষের অধীন থাকিবে ("it is the order of nature and of God that beings of superior faculties and knowledge, and therefore of superior power, should control and dispose of those who are inferior.")। দাসত্ব প্রথা খ্রীষ্টধর্মবিরোধী—এই যুক্তির উত্তরে বলা হইত যে ত্রাণকর্তা যীশু কখনও প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। সুসভ্য গ্রীক ও রোমক জাতি দাসত্ব প্রথা স্বীকার করিত, এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত করা হইত। উত্তরাঞ্চলে দাসত্ব প্রথার বিরোধীরা (Abolitionists) এইরূপ কুতর্কের প্রত্যুত্তর দিত। আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) বলিয়াছিলেন: "দাসত্ব প্রথা যদি অন্যায় না হয় তবে কিছুই অন্যায় নয়।" ("If slavery is not wrong, then nothing is wrong.") দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা মনে করিত যে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা আর্থিক ক্ষেত্রে দাস-শ্রমের উপর নির্ভরশীল নয় বলিয়াই তাহারা দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে উদার মনোভাব দেখাইতে পারে।

দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে আপোষের চেষ্টা: দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে উত্তরাঞ্চল ও

দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে এই বিরোধ দূর করিবার জন্য দীর্ঘকাল নানাভাবে চেষ্টা করা হইয়াছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চলে দাসত্ব প্রথার বিস্তার নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে লুইসিয়ানা এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশৌরী রাষ্ট্ররূপে গৃহীত হইলে তথায় দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ম্যাসাচুসেট্‌সের একটি অংশ (Maine) পৃথক রাষ্ট্ররূপে গণ্য হইল এবং তথায় দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ হইল। ফলে উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্রের সংখ্যা সমান রহিল, দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভারসাম্য (balance) বিনষ্ট হইল না। এই ব্যবস্থা (Missouri Compromise, ১৮২০) ত্রিশ বৎসর বলবৎ রহিল।

মেক্সিকো হইতে অধিকৃত বিশাল ভূখণ্ডে দাসত্ব প্রথার বিস্তার সম্বন্ধে আবার উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হইল (Clay Compromise) যে ক্যালিফোর্নিয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে, কিন্তু মেক্সিকো হইতে অধিকৃত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য রাষ্ট্রে স্থানীয় জনগণের ইচ্ছা অনুসারে দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ বা অনুমোদিত হইবে। এই নীতি অনুসারে দুইটি রাষ্ট্র (Kansas ও Nebraska) সম্বন্ধে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন প্রবর্তিত হইল। স্থানীয় জনগণের উপর এই গুরুতর প্রশ্ন সমাধানের ভার অর্পণ করিয়া সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এক নূতন নীতি (principle of "squatter sovereignty") প্রবর্তন করা হইল। এতদিন পর্যন্ত নূতন রাষ্ট্র গ্রহণ করিবার সময় কেন্দ্র (Centre) স্থির করিয়া দিত যে তথায় দাসত্ব প্রথা থাকিবে কি থাকিবে না। এই নূতন নীতি অনুসারে কেন্দ্রের সেই অধিকার বিলুপ্ত হইল, নবগৃহীত প্রতিটি রাষ্ট্র দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার পাইল। জাতীয় ঐক্যের দিক হইতে এই নূতন নীতি সুফলপ্রদ হয় নাই।

গৃহযুদ্ধের সূচনা ঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেড স্কট (Dred Scott) নামক এক ক্রীতদাসের মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টে সিদ্ধান্ত করিল যে যুক্তরাষ্ট্রের কোন অংশে দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় আইনসভার নাই। দাস প্রভুর সম্পত্তি মাত্র; সংবিধান অনুসারে আইন দ্বারা কাহারও সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া যায় না—সুতরাং আইন দ্বারা ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া সংবিধান-বিরোধী। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যে সকল রাষ্ট্র দাসত্ব প্রথা রহিত করিয়াছিল

দাসত্ব সম্বন্ধে সংবিধানের ব্যাখ্যা

সেই সকল রাষ্ট্রেও উহা আইনসঙ্গত হইয়া দাঁড়াইল, যেখানে দাসত্ব প্রথা ছিল সেখানে উহা রহিত করিবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইল। দীর্ঘকালের আলাপ আলোচনা, আপোষ মীমাংসা একেবারে ব্যর্থ হইল। ক্রমে ক্রমে সকল রাষ্ট্রেই দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হইবে, উত্তরাঞ্চলের এই আশা ব্যর্থ হইল। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা পাকাপাকিভাবে থাকিবে আশঙ্কা করিয়া দাসত্ব প্রথার বিরোধীরা তৎপর হইয়া উঠিল।

দাসত্ব-বিরোধী দলের শক্তিবৃদ্ধি

ইতিমধ্যে দাসত্ব প্রথার প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলে Republican Party নামে এক নূতন রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছিল (১৮৫৪)। এই দলের অন্যতম মুখপাত্র আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের খানিকটা দাসত্বের পক্ষে এবং খানিকটা বিপক্ষে থাকিতে পারে না ("the Union could not permanently endure half slave, half free.")। নূতন দলের কার্যকলাপে দক্ষিণাঞ্চলের সন্দেহ হইল যে দাসত্ব-বিরোধী রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত হইয়া সংবিধান সংশোধন করিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র দাসত্ব প্রথা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিবে। কেন্দ্রীয় আইনসভার (Congress) উভয় কক্ষে (Senate, House of Representatives) দাসত্ব-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে Republican দলের পক্ষ হইতে লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। কেন্দ্রীয় শাসন দাসত্ব-বিরোধী দলের হস্তগত হইল। তখন দক্ষিণাঞ্চলের আশঙ্কা হইল যে এই দল সংবিধান সংশোধন করিয়া দাসত্ব প্রথা বিলোপ করিবে।

দক্ষিণে নূতন রাষ্ট্র গঠন

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি দাসত্ব প্রথা রক্ষার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া কেন্দ্রের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া নূতন রাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প করিল। তাহাদের মুখপাত্রগণ বলিল যে সংবিধান বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তিপত্র (compact) মাত্র; কোন রাষ্ট্র চিরকাল চুক্তির সর্ত মানিতে বাধ্য নহে, যে কোন রাষ্ট্র যে কোন সময় নিজের স্বার্থ বা সম্মান রক্ষার জন্য চুক্তি বাতিল করিয়া স্বাধীন হইতে পারে। এই যুক্তি আইনতঃ বিচারসহ কিনা তাহা বলা কঠিন। তবে উত্তর ও দক্ষিণের বিরোধ তখন এমন স্তরে পৌছিয়াছিল যে আইনের সাহায্যে তাহার সমাধান করা আর সম্ভব ছিল না। ১৮৬০-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের এগারটি রাষ্ট্র (South Carolina, Alabama, Florida, Mississippi, Louisiana,

Texas, Georgia, Virginia, Tennessee, North Carolina, Arkansas) যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ (secession) করিয়া এক নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Confederacy) গঠন করিল। ইহার জন্য নূতন সংবিধান প্রস্তুত হইল। জেফারসন ডেভিস (Jefferson Davis) রাষ্ট্রপতি হইলেন। বাকী বাইশটি রাজ্য (ইহার মধ্যে চারিটি দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ করে নাই) কেন্দ্রের আনুগত্য রক্ষা করিয়া রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে বিদ্রোহী রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল (১৮৬১)

আব্রাহাম লিঙ্কন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিগণের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে আব্রাহাম লিঙ্কন চরিত্রবলে, কর্তব্যনিষ্ঠায়, স্বদেশপ্রেমে এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি একটি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তারূপে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। তাঁহার মতে গণতন্ত্র অর্থ "জনগণের জন্য জনগণকর্তৃক জনগণের শাসন" ("government of the people, by the people and for the people")। এই উচ্চ আদর্শ তাঁহার রাজনৈতিক কর্মে রূপায়িত হইয়াছিল।

গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক দরিদ্রের কাষ্ঠনির্মিত কুটিরে (log cabin) লিঙ্কনের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাসের সুযোগ পান নাই; সর্বসাকুল্যে মাত্র বৎসরখানেক তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল ; বহু পরিশ্রমে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি এই আকাঙ্ক্ষার আংশিক পূরণ করিতেন। যৌবনে তাঁহাকে কিছুকাল শ্রমজীবী এবং দোকানদারের কাজ করিতে হয়। পরে তিনি আইন ব্যবসায় গ্রহণ করেন এবং রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইলিনয় (Illinois) রাষ্ট্র হইতে সিনেটের (Senate) সভ্যপদপ্রার্থী হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিখ্যাত বক্তা স্টিফেন ডগলাস (Stephen Douglas)। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিঙ্কন জয়লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু নির্বাচন উপলক্ষ্যে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়াছিল। ফলে লিঙ্কন দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Republican দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হন, কিন্তু তাঁহার কার্যকাল আরম্ভ হইতে না

রাজনীতি ক্ষেত্রে লিঙ্কন

হইতেই এক আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করে (১৮৬৫)। তিনি মাত্র চারি বৎসর দেড় মাসকাল রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

লিঙ্কন ও গৃহযুদ্ধ

লিঙ্কনের শাসনকালের প্রধান ঘটনা গৃহযুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা থাকিবে কিনা—ইহাই ছিল যুদ্ধের মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে লিঙ্কনের সুনির্দিষ্ট মত ছিল—তিনি দাসত্ব প্রথা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি দাসত্ব প্রথা অন্যায় না হয়, তবে কিছুই অন্যায় নয়" ("If slavery is not wrong then nothing is wrong")। কিন্তু তিনি জোর করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে দাসত্ব প্রথা বিলোপ করিতে চাহেন নাই। তিনি মনে করিতেন যে দাসত্ব প্রথা একদিন বিলুপ্ত হইবে—যুক্তরাষ্ট্রে এক অংশে দাসত্ব প্রথা থাকিবে, অপর অংশে থাকিবে না, এই অবস্থা চিরকাল চলিতে পারে না ("the Union could not permanently endure half slave, half free")। তবে দাসত্ব প্রথা বিলোপের জন্য দক্ষিণাঞ্চলের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বিপন্ন করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। দেশের ঐক্য রক্ষাই তিনি প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই (গৃহ-) যুদ্ধে আমার প্রধান উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করা, দাসত্ব প্রথা রক্ষা করা বা বিলোপ করা নয়। যদি একটিমাত্র দাসকেও স্বাধীনতা না দিয়া ঐক্য রক্ষা করা যাইত তবে আমি তাহা করিতাম। যদি প্রত্যেকটি দাসকে স্বাধীনতা দিয়া ঐক্য রক্ষা করা যাইত তবে আমি তাহাও করিতাম। আর যদি দাসগণের একাংশকে স্বাধীনতা দিয়া অপর অংশকে স্বাধীনতা না দিলে ঐক্য রক্ষা হইত তবে তাহাই আমি করিতাম।"

লিঙ্কন দাসত্ব-বিরোধী Republican দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের আশঙ্কা হইয়াছিল যে তাঁহার শাসনকালে দাসত্ব প্রথা বিলোপ করা হইবে। এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়াই দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি নূতন রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Confederacy) গঠন করিয়াছিল। তাহারাই দেশের ঐক্য বিনষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিল। দেশের ঐক্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর লিঙ্কন তাহাদের দাবি মানিয়া লইতে পারেন নাই। ঐক্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদিগকে শত্রুরূপে গণ্য করিয়া তাহাদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের কথা কখনও চিন্তা করেন নাই। ভ্রান্ত স্বদেশবাসীদিগকে যুদ্ধাবসানে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার নীতি।

লিঙ্কন দাসত্ব প্রথার বিলোপ অপেক্ষা দেশের ঐক্য রক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন, তাই তিনি গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র দাসত্ব প্রথা বিলোপ করেন নাই। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহীদিগকে দুর্বল করিবার জন্য তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করিলেন যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিন হইতে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলির অধিবাসী দাসগণকে স্বাধীনরূপে গণ্য করা হইবে। এই ঘোষণার ফলে কার্যতঃ দক্ষিণাঞ্চলে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হইল, রাষ্ট্রসঙ্ঘও (Confederacy) বাধ্য হইয়া নিগ্রোদিগকে স্বাধীনতা দিয়া সৈন্যদলে ভর্তি করিতে লাগিল। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জনমত লিঙ্কনের উদারতা সমর্থন করিল।

দাসত্ব প্রথার বিলোপ

গৃহযুদ্ধ (Civil War, ১৮৬১-১৮৬৫)ঃ গৃহযুদ্ধ মোটামুটি চারি বৎসর চলিয়াছিল। বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলি জনসংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় দুর্বল ছিল। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা ধরিলে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের (Confederacy) জনসংখ্যার প্রায় চারিগুণ ছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নৌবাহিনী ছিল না, বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যাও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কম ছিল। দেশের শিল্পসম্পদ উত্তরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে দক্ষিণ-বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল, কারণ মিসিসিপি নদীর মোহানা অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীন হইলে পশ্চিমাঞ্চলের নানাপ্রকার অসুবিধা হইত।

উত্তর ও দক্ষিণের শক্তির তুলনা

এই সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করিয়াছিল। ইহার সেনানায়কগণ দক্ষতায় ও কর্তব্যনিষ্ঠায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন লী (Lee) এবং জ্যাক্সন ('Stonewall' Jackson)। রাষ্ট্রপতিরূপে জেফারসন ডেভিস বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। বরং শান্তিপ্রিয় লিঙ্কন রণনীতি নির্ধারণে এবং শাসনকার্যে অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে তুলার চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল এবং ইংলণ্ডে গমের চাহিদা বাড়িয়াছিল। ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে দক্ষিণাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত এবং পশ্চিমাঞ্চল (যেখানে প্রচুর গম উৎপন্ন হইত) লাভবান হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণভাবে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি খানিকটা সহানুভূতি ছিল, কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে দাসত্ব প্রথার সমর্থনে যুদ্ধে যোগদান করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরাজিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেনাপতি লী বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতি গ্র্যাণ্টের (Grant) নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন ; চারি বৎসর সংগ্রামের পর আবার আমেরিকায় ঐক্য স্থাপিত হইল। ইহার পাঁচদিন পরে ঐক্য-প্রতিষ্ঠাতা লিঙ্কন আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

গৃহযুদ্ধের ফল

পরাজয়ের ফলে দক্ষিণাঞ্চলে সুদূরপ্রসারী আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটিল। দাসত্ব প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। দাস-শ্রমের উপর নির্ভরশীল তুলার আবাদগুলি ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া পড়িল। কৃষির পরিবর্তে আসিল শিল্প ; কিছুকালের মধ্যেই দক্ষিণাঞ্চল একটি সমৃদ্ধিশালী শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইল। সমাজের গঠনে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফল সংক্রামিত হইল। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোদের সম্বন্ধে নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দিল।

যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস (১৮৬৫-১৯১৪) : যুদ্ধাবসানে দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যাগুলির সমাধান কিভাবে করিতে হইবে তাহা লিঙ্কন মৃত্যুর পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি পরাজিত শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না ; বরঞ্চ দক্ষিণাঞ্চলের উপর বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া যুদ্ধের ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন।* তাঁহার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি এণ্ড্রু জনসনও (Andrew Johnson) এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তিনি ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। উত্তরে Republican দল পরাজিত শত্রুকে দুর্বল করিয়া রাখিতে চাহিল, দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গরা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোদিগকে আইনের সাহায্যে এবং বেআইনীভাবে নির্যাতন করিতে লাগিল। জনসনের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি গ্র্যাণ্ট (যিনি গৃহযুদ্ধের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি ছিলেন) Republican দলের নির্দেশে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি প্রতিহিংসা নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। দীর্ঘকাল দক্ষিণাঞ্চলে নানাবিধ অবিচার ও অত্যাচার চলিল।

নিগ্রোদের অবস্থা

স্বাধীন নিগ্রোরা অর্থনীতিক্ষেত্রে দুর্দশাগ্রস্ত হইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ফলে তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইল না। নানা অজুহাতে অধিকাংশ নিগ্রোকে ভোটদানের অধিকার

* "With malice toward none ; with charity for all ; with firmness to see the right, as God gives to us to see right, let us strive on to finish the work weare in ; to bind up the nation's wounds........."

হইতে বঞ্চিত করা হইল। লিঙ্কনের উদার নীতি পরিত্যাগ করার ফলে সংগঠনের (Reconstruction) যুগ প্রতিহিংসার যুগে পরিণত হইল।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে ১২ জন রাষ্ট্রপতি* শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন থিয়োডোর রুজভেল্ট (১৯০১-১৯০৯)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে একজন প্রধান নায়ক ছিলেন।

গৃহযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাষ্ট্রে অসামান্য আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির যুগ আরম্ভ হইল এবং এই শ্রীবৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইল। জনসংখ্যা বাড়িতে লাগিল, রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রসার হইল, নূতন কলকারখানা স্থাপনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গেল। দেশে কোটিপতি শ্রেণীর (millionaires) উদ্ভব হইল, অর্থশালী ব্যক্তিরা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিল।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি (১৮৬৫-১৯১৩) : গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িল এবং ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য করিল।

গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণাঞ্চল ইংলণ্ড হইতে কয়েকখানি জাহাজ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে ইংলণ্ডের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে। ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন (Gladstone) যুক্তরাষ্ট্রকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়া আপোষ-মীমাংসা করেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড এবং ভেনিজুয়েলার মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হইলে যুক্তরাষ্ট্র তাহার মীমাংসা করিয়া দেয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে যুদ্ধে (Spanish-American War) পরাজিত করে। ফলে কিউবা (Cuba) দ্বীপ স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রিত রাষ্ট্রে (Protectorate) পরিণত হয় এবং স্পেনের শাসনাধীন পোর্টো রিকো

স্পেনের সহিত যুদ্ধ

* Johnson (1865-1869), Grant (1869-1877), Hayes (1877-1881), Garfield (1881), Arthur (1881-1885), Cleveland (1885-1889, 1893-1897), Harrison (1889-1893), McKinley (1897-1901), Theodore Roosevelt (1901-1909), Taft (1909-1913)। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি হন উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson); তাঁহার সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে এবং যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে যোগদান করে।

(Porto Rico), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং গুয়াম দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়েই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের অনুরোধক্রমে যুক্তরাষ্ট্র তথায় স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। এইরূপে রাজ্য বিস্তারের ফলে আমেরিকার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার আমেরিকা মহাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তাহা এই মহাদেশের সীমার বাহিরে প্রসারিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র মনরোর ঘোষণা অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিত—কোন ইউরোপীয় শক্তিকে নূতন মহাদেশে অধিকার বিস্তার করিতে দিত না (এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো ও ভেনিজুয়েলার ব্যাপারে যথাক্রমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল), নিজেও ইউরোপের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিত না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এই নীতির আংশিক পরিবর্তন ঘটিল। রুশ-জাপান যুদ্ধে (Russo-Japanese War, ১৯০৪-১৯০৫) রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেল্ট মধ্যস্থতা করিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কো সম্বন্ধে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য এক বৈঠক (Algeciras Conference) বসিয়াছিল। এই বিবাদের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের কোন যোগাযোগ না থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। মনরোর ঘোষণা অনুযায়ী এই সকল গোলযোগ হইতে দূরে থাকাই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সঙ্গত ছিল। কিন্তু আত্মশক্তিতে আস্থাবান যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃই বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহার পরিণতি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণা।

মনরো নীতির ব্যতিক্রম

উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির উপরে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব স্থাপিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতার ফলেই সমগ্র নূতন মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে একটি 'বিশাল আমেরিকার বৈঠক' (Pan-American Conference) আহূত হইয়াছিল। এখানেই পরোক্ষভাবে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি স্বীকৃত হয়। এই স্বীকৃতি কোন সন্ধিপত্রে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শক্তি উপেক্ষা করিবার মত সাহস দক্ষিণ আমেরিকার কোন রাষ্ট্রের ছিল না। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব লিখিয়াছিলেন ঃ "এখন যুক্তরাষ্ট্র কার্যতঃ

দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব

এই মহাদেশের সার্বভৌম শক্তি এবং এই রাষ্ট্র যে কোন বিষয়ে যে নির্দেশ দিবে তাহাই আইন রূপে গণ্য হইবে।"*

পানামা খাল (Panama Canal) খনন সম্বন্ধে এই দম্ভপূর্ণ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইল। আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ সাধিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বল বৃদ্ধি পাইবে এবং বাণিজ্য প্রসারিত হইবে মনে করিয়া কলম্বিয়ার মধ্য দিয়া এই খাল খনন করিবার পরিকল্পনা করা হইল, কিন্তু কলম্বিয়া এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে সম্মত হইল না। তখন রাষ্ট্রপতি থিয়োডোর রুজভেল্টের ইঙ্গিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর সহায়তায় কলম্বিয়ার এক অংশ বিদ্রোহী হইয়া 'পানামা' নাম গ্রহণ করতঃ স্বাধীন হইল। এই নূতন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিয়া যুক্তরাষ্ট্র খাল খননের ব্যবস্থা করিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে খালটি সম্পূর্ণ হইল। কলম্বিয়ার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ ব্যবহারে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিতে ভয়ের সৃষ্টি হইল ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা প্রবল হইল। কিন্তু মহাশক্তিশালী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাধ্য তাহাদের ছিল না। অদ্যাপি দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে এবং পররাষ্ট্রনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

যুক্তরাষ্ট্র ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে মনরো নীতি পরিত্যাগ করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে জয়ী করিতে যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে। যুদ্ধাবসানে শান্তির সর্ত নির্ধারণের জন্য প্যারিসে যে বৈঠক বসে (Paris Peace Conference) তাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President) উইলসন প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট (Senate) সন্ধির সর্ত অনুমোদন করিতে অস্বীকার করে এবং যুক্তরাষ্ট্র নবপ্রতিষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ গ্রহণ না করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির গণ্ডগোল হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। ইহা "বিচ্ছিন্নতার নীতি" (policy of isolation) নামে পরিচিত।

ওয়াশিংটন বৈঠক (Washington Conference, ১৯২১-২২) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্র 'সুদূর প্রাচ্য' সম্বন্ধে

*"To-day the United States is practically sovereign on this continent, and its fiat is law upon the subjects to which it confines its interposition......"

উদাসীন থাকিতে পারে নাই। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে 'সুদূর প্রাচ্যে' জাপান সর্বাপেক্ষা শক্তিমান দেশরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জাপান।

যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত ইংলণ্ডের যে সন্ধি হইয়াছিল (Anglo-Japanese Alliance) তাহা ছিল জাপানের শক্তির একটি প্রধান উৎস। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের নৌ-বল যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল দুইটি : (১) প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং 'সুদূর প্রাচ্যে' আন্তর্জাতিক সমস্যা ; (২) ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে নৌ-বলের ভারসাম্য (balance of naval power) রক্ষা। এই পাঁচটি রাষ্ট্র ব্যতীত চীন, নেদারল্যাণ্ডস্, পর্তুগাল এবং বেলজিয়মের প্রতিনিধিগণ এই বৈঠকে যোগদান করেন। এই বৈঠকে আলোচনার ফলে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-জাপানী সন্ধি বাতিল করা হইল, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের নৌশক্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা রহিল। যুদ্ধ জাহাজ সম্বন্ধে প্রধান দেশগুলির মধ্যে নিম্নরূপ অনুপাত নির্ধারিত হইল : ইংলণ্ড ৫, যুক্তরাষ্ট্র ৫, জাপান ৩, ফ্রান্স ও ইটালী ১·৬৭। এই ব্যবস্থা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে বলিয়া স্থির হইল। ইহার ফলে প্রধান দেশগুলির মধ্যে নৌবলবৃদ্ধির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাময়িকভাবে বন্ধ হইল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হইল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহার পরিণতি ঘটিল।

ওয়াশিংটন বৈঠকে পৃথক একটি সন্ধি দ্বারা চীনের স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কিন্তু দশ বৎসর পরে জাপান এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া চীনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ ও অধিকার করিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণ করিল। পরে এই সংগ্রাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিশিয়া গেল।

দশম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণঃ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অন্তর্গত বোস্‌নিয়া প্রদেশের রাজধানী সেরাজেভো (Serajevo) শহরে হ্যাপ্‌সবুর্গ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ (Francis Ferdinand, পুত্রহীন সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফের ভ্রাতুষ্পুত্র) তাঁহার পত্নী সহ বিপ্লবী আততায়িগণ কর্তৃক নিহত হন। অস্ট্রিয়ার সন্দেহ হইল যে সার্ভিয়ার সহযোগিতায়—অন্ততঃ জ্ঞাতসারে—এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে এবং একটি প্রবল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে।

সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড

পূর্বেই বলা হইয়াছে, তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বোস্‌নিয়া এবং হার্জিগোভিনা প্রদেশ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসের ব্যবস্থা অনুসারে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীতে বিপ্লবের ("Young Turk" Revolution) সুযোগ লইয়া অস্ট্রিয়া এই দুইটি প্রদেশকে তুর্কী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করে। ইহাতে সার্ভিয়ায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হইল। স্বাধীনতা লাভের পর সার্ভিয়া আশা করিয়াছিল যে বোস্‌নিয়া ও হার্জিগোভিনা কালক্রমে দুর্বল তুর্কীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া সার্ভিয়ার সহিত যোগ দিবে, কারণ এই দুইটি প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত সার্ভিয়ার অধিবাসীদের জাতিগত ও ভাষাগত ঐক্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে বোস্‌নিয়া ও হার্জিগোভিনা অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে সার্ভিয়ার জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ হইত না। এইজন্য সার্ভিয়ার বিপ্লবীরা এই দুইটি প্রদেশ অস্ট্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল এবং খুব সম্ভবতঃ সার্ভিয়ার সরকারের সহিত তাহাদের গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। তাই আর্কডিউকের হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে দায়ী করিল এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইল। আর্কডিউকের হত্যাকাণ্ডের ঠিক একমাস পরে (২৮ জুলাই, ১৯১৪) অস্ট্রিয়া সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

অস্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার মধ্যে শত্রুতা

অস্ট্রিয়ার সার্ভিয়া-বিরোধী নীতি জার্মানীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। জার্মানী অস্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী চুক্তিতে (Triple Alliance) আবদ্ধ ছিল। দুর্বল অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রনীতি প্রকৃতপক্ষে প্রবল জার্মানী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত।

প্রথম দিকে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর ধারণা ছিল যে সার্ভিয়ার সহিত যুদ্ধ একটি স্থানীয় যুদ্ধ (localized war) মাত্র এবং ইহাতে অস্ট্রিয়ার জয় অনিবার্য। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে কোন গোলযোগের সূত্রপাত হইলেই ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইত। ১৯১২-১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে দুইটি যুদ্ধ (First and Second Balkan Wars) ঘটিয়াছিল। বহু পূর্বে বিসমার্ক বলিয়াছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপেই আরম্ভ হইবে। তাই অস্ট্রিয়া কর্তৃক সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে সমগ্র ইউরোপ সচকিত হইয়া উঠিল।

অস্ট্রিয়ার সহিত জার্মানীর সহযোগিতা

রাশিয়া সার্ভিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিল। সার্ভিয়ার পতন ঘটাইয়া অস্ট্রিয়া ও জার্মানী দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে অপ্রতিহত প্রভাব স্থাপন করিবে, ইহা রাশিয়া সহ্য করিতে পারিত না। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। বার্লিন কংগ্রেসে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া রাশিয়ার বন্ধুত্ব হারাইয়াছিলেন। বিসমার্কের পদত্যাগের (১৮৯০) পর জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের নীতির ফলে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সুতরাং জার্মানী কর্তৃক সমর্থিত অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্ভিয়ার পক্ষ অবলম্বন করা রাশিয়ার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

রাশিয়ার স্বার্থ

অতঃপর অস্ট্রিয়ার সহিত সার্ভিয়ার যুদ্ধ আর স্থানীয় যুদ্ধ রূপে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা রহিল না। জার্মানী রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল (যথাক্রমে ১ ও ৩ আগস্ট, ১৯১৪)। কয়েক বৎসর পূর্বে ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল ; উভয় দেশই ছিল জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব (Foreign Secretary) স্যার এডওয়ার্ড গ্রে (Sir Edward Grey) কিছুদিন আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। শেষে ইংলণ্ডও জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৪ আগস্ট, ১৯১৪)।

ফ্রান্স ইংলণ্ড ;

ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের মৈত্রী (Triple Entente) থাকিলেও কোন সামরিক চুক্তি ছিল না; সুতরাং জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়াকে

সাহায্য করিতে ইংলণ্ড বাধ্য ছিল না। জার্মানী লুক্সেমবার্গ ও বেলজিয়ম আক্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ভয়ের সঞ্চার করিল। বহু পূর্বে একটি আন্তর্জাতিক সন্ধি দ্বারা বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা (permanent neutrality) স্বীকৃত হইয়াছিল। জার্মানী সামরিক কারণে—সহজে ফ্রান্স জয় করিবার জন্য—সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া বেলজিয়ম আক্রমণ করে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে জার্মানীর এই কার্য অসঙ্গত হইয়াছিল। ইংলণ্ড এই বেআইনী কার্যের প্রতিবাদ করে। তাহা ছাড়া বেলজিয়ম কর্তৃক অধিকৃত হইলে ইংলণ্ডের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং ফ্রান্স ও রাশিয়াকে সাহায্য করিবার দায়িত্ব থাকুক বা না-ই থাকুক, বেলজিয়ম জার্মানী দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ডের পক্ষে জার্মানীকে বাধা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়ম আক্রমণের ফল

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতেই জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের সূত্রপাত হয়। ইহার জন্য জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের নীতি অনেকাংশে দায়ী। বিসমার্ক ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় উইলিয়ম নানা বিষয়ে ইংলণ্ডের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইলেন। বুয়র যুদ্ধে বুয়রদের সাফল্য কামনা করিয়া তিনি ইংলণ্ডে সন্দেহের সৃষ্টি করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্মানী তুর্কীতে প্রভাব বিস্তার করে এবং বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করে। জার্মানীর এই নীতি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের স্বার্থের বিরোধী ছিল। তৃতীয়তঃ, জার্মানী সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের সুপ্রতিষ্ঠিত আধিপত্য বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নূতন রণতরী নির্মাণ করিয়া নৌ-বহর প্রসারিত করিতে আরম্ভ করে। স্থলযুদ্ধে জার্মান বাহিনী ইউরোপে শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। জলযুদ্ধের জন্য অনুরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে জার্মানী পৃথিবীতে অজেয় হইত। সুতরাং ইংলণ্ডের পক্ষে জার্মানীকে সমুদ্রবক্ষে শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। চতুর্থতঃ, শিল্পবিপ্লবের ফলে জার্মানীর উৎপাদন-ক্ষমতা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল এবং বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে জার্মানী ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল কারণে ইংলণ্ড ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে

জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রাশিয়ার সহিত মৈত্রী (Entente) স্থাপন করে। মরক্কোর আধিপত্য সম্বন্ধে ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ড দৃঢ়ভাবে ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল (১৯০৬, ১৯১১)।

পরস্পরবিরোধী শক্তিসঙ্ঘ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে দুইটি শক্তিসঙ্ঘ পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিল : একদিকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ত্রিশক্তি (Triple Alliance), অর্থাৎ জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালী ; অপর দিকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ত্রিশক্তি (Triple Entente), অর্থাৎ ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া। অস্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার বিরোধ উপলক্ষ্য করিয়া এই সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। কিন্তু ইহার পূর্বেই ত্রিশক্তির সন্ধিতে (Triple Alliance) ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার সহিত স্বার্থসংঘর্ষের ফলে ইটালী প্রথমে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল, পরে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিল (১৯১৫)। ত্রিশক্তির মৈত্রী প্রথমে অক্ষুণ্ণ রহিল, পরে রাশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হইলে রাশিয়া মিত্রদিগকে ত্যাগ করিয়া জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করিল (১৯১৮)।

উভয় পক্ষের শক্তির তুলনা

যুদ্ধের গতি (১৯১৪) : যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রপক্ষে (Allied Powers) ছিল ইউরোপে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া, সার্ভিয়া ও বেলজিয়ম এবং এশিয়ায় জাপান, আর জার্মানীর পক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী—পরে (নভেম্বর, ১৯১৪) তুর্কী। ভৌগোলিক অবস্থান, সৈন্যদের শিক্ষা, রেলওয়ে ব্যবস্থা প্রভৃতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে জার্মানীর শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। তবে জার্মানীকে একসঙ্গে তিন সীমান্তে (রাশিয়া, ফ্রান্স, সার্ভিয়া) যুদ্ধ করিতে হইত এবং মিত্র হিসাবে অস্ট্রিয়া দুর্বল ছিল। মিত্রপক্ষে সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল, ইংলণ্ডের অপরাজেয় নৌবল ছিল ; কিন্তু এতগুলি দেশের সামরিক ব্যবস্থার যোগাযোগ রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। রাশিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হইতে ভৌগোলিক হিসাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় সামরিক দিক হইতে মিত্রপক্ষের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল।

পশ্চিম সীমান্তে (Western Front) জার্মান বাহিনী প্রথমেই বেলজিয়মের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিল এবং প্যারিসের কাছাকাছি উপস্থিত হইল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস হইতে বোর্দো (Bordeaux) শহরে সরাইয়া নেওয়া হইল। কিন্তু ফরাসী বাহিনী মার্ন

নদীর যুদ্ধে (Battle of the Marne) জার্মানদের গতিরোধ করিল, তাহারা প্যারিস অধিকার করিতে পারিল না। অতঃপর জার্মান বাহিনী আবার বেলজিয়মের মধ্য দিয়া ইংলণ্ডের বিপরীত দিকে সমুদ্রতীর অধিকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারিল না।

পূর্ব সীমান্তে (Eastern Front) রাশিয়ার সৈন্যদল জার্মানী আক্রমণ করিয়া জার্মান সেনানায়ক হিণ্ডেনবার্গ (Hindenburg) কর্তৃক পরাজিত হইল (Battle of Tannenberg), কিন্তু অস্ট্রিয়া (রাশিয়ার অধীন) পোল্যাণ্ড এবং সার্ভিয়া আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল।

সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল, জার্মান নৌবহর (German High Seas Fleet) সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। জাপান মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ও চীনে জার্মানীর অধিকৃত স্থানগুলি দখল করিয়া লইল।

তুর্কী জার্মানীর পক্ষে যোগদান করায় মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বিপদের সম্ভাবনা ঘটিল এবং রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হইল।

যুদ্ধের গতি (১৯১৫)ঃ পশ্চিম সীমান্তে মিত্রপক্ষ বারবার চেষ্টা করিয়াও জার্মানদিগকে হটাইতে পারিল না; জার্মান বাহিনী এদিকে শক্ত দেয়ালের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া পূর্ব সীমান্তে রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিল। ("Hold the solid wall in the west and let the French and British dash themselves against it ; strike down Russia in the east.") জার্মানদের আক্রমণে পোল্যাণ্ড এবং বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী কয়েকটি প্রদেশ রাশিয়ার হস্তচ্যুত হইল। সমরক্ষেত্রে এই পরাজয়ের ফল রাশিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিল, 'জার' (Czar)-তন্ত্রের দুর্বলতা রাশিয়ার জনগণের নিকট সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইল।

রাশিয়ার পরাজয়

রাশিয়ার এই শোচনীয় পরাজয়ের একটি প্রধান কারণ ছিল অস্ত্রশস্ত্রের অভাব। অস্ত্র সম্বন্ধে রাশিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপর অনেকখানি নির্ভর করিত, কিন্তু এই দুই দেশ হইতে রাশিয়ায় অস্ত্র প্রেরণের কোন সোজা ও নিরাপদ পথ ছিল না। জার্মানী বাল্টিক সাগরের পথ এবং তুর্কী কৃষ্ণ সাগরের পথ বন্ধ করিয়াছিল। সুতরাং দার্দানেলিস (Dardanelles) প্রণালী অতিক্রম করিয়া রাশিয়ায় যাতায়াতের

এক নূতন পথ খুলিবার প্রয়োজন হইল। তাই মিত্রশক্তি দার্দানেলিস অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করিল। কিন্তু এই অভিযানের (Dardanelles Campaign) ফল আশানুরূপ হইল না; প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া মিত্রবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল।

বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষে যোগদান করিল। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় সমগ্র সার্ভিয়া এবং মন্টিনিগ্রো জার্মানী ও বুলগেরিয়ার সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত হইল। তুর্কীর সহিত স্থলপথে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হইল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে মেসোপোটেমিয়া আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে এবং পারস্যের তৈল-খনিতে ব্রিটিশ-প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখাই এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৫-১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মেসোপোটেমিয়া আক্রমণের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইলে মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির দুর্বলতা প্রকাশিত হইল।

সমুদ্রবক্ষে জার্মানী ডুবো জাহাজ (submarine) ব্যবহার করিয়া মিত্র-পক্ষের—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের—অনেক জাহাজ বিনষ্ট করিল এবং বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি করিল।

মোটের উপর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূল হয় নাই। তবে ইউরোপের বাহিরে—আফ্রিকায় ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে—মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিতেছিল। ইহা ছাড়া ইটালী মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে নূতন অসুবিধার সৃষ্টি করিল।

যুদ্ধের গতি (১৯১৬) ঃ ফ্রান্সে ভার্দুন (Verdun) এবং সোম নদী (the Somme) অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সহিত জার্মান বাহিনীর কয়েকমাস-ব্যাপী প্রবল যুদ্ধ হইল। প্রচুর সৈন্যক্ষয় সত্ত্বেও কোন পক্ষই বিশেষ লাভবান হইতে পারিল না। জার্মানীতে খাদ্যাভাব দেখা দিল, কারণ সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের অপ্রতিহত প্রাধান্য থাকায় জার্মানী বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে পারিত না। জার্মান নৌবহর (German High Seas Fleet) উত্তর সাগরে ইংরেজ নৌবহরের সহিত প্রত্যক্ষ যুদ্ধে (Battle of Jutland) জয়ী হইতে পারিল না।

পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিল। রাশিয়ার জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া রুমানিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিল, কিন্তু

অল্পদিনের মধ্যেই জার্মান বাহিনী সমগ্র রুমানিয়া অধিকার করিল। ইটালী অস্ট্রিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। পর্তুগাল মিত্রপক্ষে যোগ দিল।

যুদ্ধের গতি (১৯১৭) ঃ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। জার্মানীতে ১৫ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষকে সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। তাহাতেও জয়লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া ডুবো জাহাজের অসঙ্কুচিত ব্যবহার ("unrestricted submarine warfare") দ্বারা ইংলণ্ডের নৌবল ও বাণিজ্য বিধ্বস্ত করিবার আয়োজন হইল। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে যে সকল জাতি স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত না (যেমন, পোল, জেক, শ্লোভাক ইত্যাদি) তাহারা যুদ্ধের চাপে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় মিত্রপক্ষে নূতন আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু রাশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হইল এবং রাশিয়া মিত্রপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করিল (Treaty of Brest-Litovsk : মার্চ, ১৯১৮)।

রাশিয়ায় বিপ্লব

পশ্চিম সীমান্তে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াও জার্মানদিগকে ফ্রান্স হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিল না। ইটালী জার্মান বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইয়াও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। মধ্যপ্রাচ্যে—মেসোপোটেমিয়ায় এবং প্যালেস্টাইনে—ইংরেজদের জয় হইল।

যুদ্ধের গতি (১৯১৮) ঃ রাশিয়া এবং রুমানিয়া জার্মানীর সহিত পৃথক সন্ধি করায় পূর্ব সীমান্তে জার্মানীর দায়িত্ব রহিল না। তখন জার্মান সেনাপতি লুডেনডর্ফ (Ludendorff) যুদ্ধ জয়ের শেষ চেষ্টা করিলেন ঃ জার্মান বাহিনীর আক্রমণাত্মক অগ্রগতি (offensive) পশ্চিম সীমান্তে কেন্দ্রীভূত হইল। মিত্রপক্ষও পাল্টা আক্রমণ চালাইল। ইটালীতে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে হাপ্‌সবুর্গ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বুলগেরিয়া ও তুর্কী পরাজিত হইয়া মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল (৪ নভেম্বর)। জার্মান নৌবহরে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল; দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে বিপ্লব দেখা দিল। সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিরুপায় জার্মানী বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিল (১১ নভেম্বর, ১৯১৮)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রঃ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে উড্রো উইল্‌সন (Woodrow Wilson) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হন। তিনি আট বৎসরকাল (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে (জুলাই, ১৯১৪) যুক্তরাষ্ট্রের জনমত উইলসনের নিরপেক্ষতা নীতি সমর্থন করিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক্ষেত্রে মন্‌রো নীতির (Monroe Doctrine) প্রভাব তখনও প্রবল ছিল। সুদূর ইউরোপীয় দেশগুলির কলহের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত নাই, ইহাই প্রচলিত ধারণা ছিল।

যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পরেই দেখা গেল যে এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে, বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশ অপর একটি মহাদেশ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ না দিলেও যুদ্ধের ফলে আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছিল, কারণ ইংলণ্ডের নৌবহর আটলান্টিক মহাসাগরে কড়া পাহারা দিয়া জার্মানীর সহিত আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ফলে ইংলণ্ডের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের কিছুদিন বাদপ্রতিবাদ চলিল, কিন্তু ইহা প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইল না। মিত্রপক্ষের নিকট মাল বেচিয়া আমেরিকার বণিকেরা প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। যুদ্ধের প্রথম আড়াই বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্য প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা

জার্মানীর সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বন্ধ হইবার ফলে জার্মানীতে খাদ্যাভাব ও অন্যান্য নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দিল। নৌবলে ইংলণ্ডের সমকক্ষ না হওয়ায় জার্মানী ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রতিকার খুঁজিয়া পাইল না। তখন ডুবো জাহাজ (submarine) দ্বারা ইংলণ্ডের জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া জার্মানীর যুদ্ধনীতির অঙ্গরূপে গৃহীত হইল। ইহাতে যে কেবল ইংলণ্ডের ক্ষতি হইল তাহা নহে, যুক্তরাষ্ট্রেরও ক্ষতি হইতে লাগিল। ইংরেজের জাহাজ ডুবিলে অনেক সময় আমেরিকার যাত্রীদের প্রাণ যাইত। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'লুসিটেনিয়া' (*'Lusitania'*) নামক ইংরেজদের একখানি জাহাজ জার্মানী ডুবাইয়া দেয়; ইহাতে কয়েকশত আমেরিকান যাত্রী ছিল। সময় সময় জার্মানীর ডুবো জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজও ডুবাইয়া দিত। এই সকল ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত স্বভাবতঃই জার্মানীর বিরুদ্ধে যাইত। উইল্‌সন

জার্মানীর নিকট বারবার প্রতিবাদ জানাইয়াও কোন ফল পাইলেন না। বরঞ্চ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ঘোষণা করিল যে অতঃপর ডুবো জাহাজের অসঙ্কুচিত ব্যবহার ("unrestricted submarine warfare") করা হইবে। ইতিমধ্যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে জার্মানী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। তখন উইল্‌সন নিরপেক্ষতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (এপ্রিল, ১৯১৭)। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিয়াছিলেন: "পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরীক্ষিত ভিত্তির উপরে পৃথিবীর শান্তি স্থাপন করিতে হইবে।"*

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান

আদর্শবাদী উইল্‌সন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন গণতন্ত্রের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিবার জন্য। তিনি যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যজয় বা অর্থসংগ্রহ করিতে চাহেন নাই।† কিন্তু আমেরিকার ধনীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই যুদ্ধে যোগদান সমর্থন করিয়াছিল। তাহারা মিত্রপক্ষের জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে চাহিল, কারণ মিত্রপক্ষ পরাজিত হইলে ইউরোপে তাহাদের লগ্নী টাকা ফেরৎ পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না। জনসাধারণ যুদ্ধকে গ্রহণ করিল জার্মানীর ডুবো জাহাজ ব্যবহারের প্রতিবাদ রূপে—যখন জার্মানীর এই অত্যাচার বন্ধ হইবে তখনই যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের গোলযোগ হইতে দূরে সরিয়া আসিবে, ইহাই তাহাদের ধারণা ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য (war aims) সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মতৈক্য ছিল না। ফলে যুদ্ধাবসানে এক প্রবল রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

যুদ্ধ ঘোষণা করা মাত্র মিত্রপক্ষকে যথেষ্ট পরিমাণে সামরিক সাহায্য প্রদান করা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হইল না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল যুদ্ধের শেষদিকে—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে—ইউরোপের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কামান এবং এরোপ্লেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজগুলি প্রথম হইতেই আটলান্টিক মহাসাগরে জার্মানীর

* "The world must be made safe for democracy. Its peace must be planted upon the tested foundations of political liberty."

† "We desire no conquest and no dominion. We seek no indemnities for ourselves and no material compensation for the sacrifices we shall make."

ডুবো জাহাজ ধ্বংস করিতেছিল। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র নূতন বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণ করিয়া জার্মানরা পূর্বে ডুবো জাহাজ দ্বারা ইংলণ্ডের যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহা আংশিকভাবে পূরণ করিয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান পরোক্ষভাবে মিত্রপক্ষকে জয়লাভে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এতবড় শক্তিশালী মিত্র লাভ করিয়া ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নূতন আশার সঞ্চার হইল। রাশিয়া বিপ্লবের ফলে যুদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মিত্রপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা তাহা পূরণ হইল। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। গ্রীস, চীন ও শ্যাম জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এইরূপে প্রায় সমগ্র পৃথিবী জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ফলে মিত্রপক্ষের সাহস ও শক্তি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর অর্থসম্পদ যুদ্ধজয়ে নিয়োজিত হইল, মিত্রপক্ষের অর্থাভাব রহিল না। এদিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া ক্রমশঃ সমরক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান না করিলেও হয়তো শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিত, কিন্তু জার্মানীকে বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা যাইত কিনা সন্দেহ।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদানের ফল

প্যারিস বৈঠক (Conference of Paris): পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জার্মানী বিনা সর্তে মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ সন্ধির সর্তসমূহ আলোচনার জন্য প্যারিসে সমবেত হন (১৯১৯)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিসহ মোট বত্রিশটি জাতির প্রতিনিধি প্যারিস বৈঠকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রাশিয়ার এবং জার্মানী প্রভৃতি পরাজিত দেশগুলির কোন প্রতিনিধি আহ্বান করা হয় নাই। পাঁচটি দেশের (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান) দশজন প্রতিনিধি দ্বারা একটি সমিতি (Council of Ten) গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈঠকের কর্ণধার ছিলেন চারিজন ("Big Four"): ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেসোঁ (Clemenceau), ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ (Lloyd George), যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইল্সন এবং ইটালীর প্রধান মন্ত্রী অর্লেণ্ডো (Orlando)। বৈঠকের সভাপতি ছিলেন ক্লেমেসোঁ। প্যারিস বৈঠকের সহিত ভিয়েনা বৈঠকের (১৮১৫) অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল।

শান্তি বৈঠকের চারি কর্ণধার

সন্ধির সর্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বিজয়ী শক্তিবর্গের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য প্রকাশিত হইল। যুদ্ধের উদ্দেশ্য (War aims) সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে পূর্বে কখনও সুস্পষ্ট আলোচনা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং যুদ্ধাবসানে তাহাদের মধ্যে মতের ও স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধ চলিবার সময় কোন কোন দেশ গুপ্ত সন্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যতে রাজ্যখণ্ড আদান-প্রদান করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল (যেমন, কনস্ট্যান্টিনোপল রাশিয়াকে দেওয়া হইবে বলিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল)। সন্ধি স্থাপনকালে এই সকল চুক্তি পালন সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দিল। চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে—বিশেষতঃ ফ্রান্সে—জনমত জার্মানীর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের দাবি করিতেছিল। "জার্মান সম্রাটকে ফাঁসি দাও" ("Hang the Kaiser!")—জনসাধারণের এই ধ্বনি রাজনৈতিক নেতৃগণকে খানিকটা প্রভাবিত করিয়াছিল। জার্মানী যাহাতে ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে না পারে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে ক্লেমেসোঁ কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। লয়েড জর্জও এই বিষয়ে তাঁহার মত অনেকটা সমর্থন করিতেন।

ন্যায়সঙ্গত সন্ধি স্থাপনের পথে বাধা

কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন স্বার্থসিদ্ধির ও প্রতিহিংসা গ্রহণের চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা চাই আইনের রাজত্ব—এই রাজত্ব শাসিত জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানবজাতির সংগঠিত মত দ্বারা সমর্থিত হইবে"।* আদর্শবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত এই নীতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বেই সন্ধির সর্ত সম্বন্ধে চৌদ্দটি প্রস্তাব ("Fourteen Points") উপস্থিত করিয়াছিলেন (জানুয়ারী, ১৯১৮)। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের যে সকল অংশ (আলশাস-লোরেন সহ) জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে সেগুলি মুক্ত করিতে হইবে; ইটালীর সীমা জাতীয়তার নীতি ("Lines of nationality") অনুসারে পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে; অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অন্তর্গত

উইলসনের নীতি

* "What we seek is a reign of law, based upon the consent of the governed and sustained by the organised opinion of mankind."

জাতিগুলিকে স্বাতন্ত্র্য ("autonomous development") লাভের সুযোগ দিতে হইবে ; (রাশিয়া, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বিভক্ত) পোল্যাণ্ডকে ঐক্য ও স্বাধীনতা দিতে হইবে; সকল রাষ্ট্র সমুদ্রপথে জাহাজ চালাইবার স্বাধীনতা পাইবে; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি জাতিসঙ্ঘ ("a general association of nations") সংগঠন করিতে হইবে ; ইত্যাদি। এই সকল প্রস্তাব জার্মানী এবং মিত্রপক্ষ গ্রহণ করিলেও শেষ পর্যন্ত সন্ধিতে সকলগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে উইলসনের আদর্শবাদ অপেক্ষা ক্লেমেসোঁ এবং লয়েড জর্জের স্বার্থপরতা-প্রণোদিত বাস্তব বুদ্ধি প্যারিস বৈঠকে অনেক বেশী কার্যকর হইয়াছিল।

ভার্সাই সন্ধি : জার্মানী : জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপনের সর্তগুলি ভার্সাই সন্ধিতে (Treaty of Versailles : ২৮ জুন, ১৯১৯) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। আলশাস-লোরেন জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের সহিত যুক্ত করা হইল। জার্মানীর অন্তর্গত প্রাশিয়ার কোন কোন অংশ বেলজিয়ম এবং নবগঠিত পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়া পাইল। বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত মেমেল (Memel) ও ডান্জিগ (Danzig) বন্দর জার্মানীর হস্তচ্যুত হইল। সমৃদ্ধ সার (Saar) অঞ্চল ১৫ বৎসরের জন্য অর্থনৈতিক দিক হইতে কার্যতঃ ফ্রান্সের কর্তৃত্বাধীন হইল। আফ্রিকায়, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এবং চীনে জার্মানীর যে সকল উপনিবেশ ও রাজ্যখণ্ড ছিল সেইগুলি জার্মানীর হস্তচ্যুত হইয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়ম ও জাপানের মধ্যে ভাগাভাগি হইল।

জার্মানীর ক্ষতি

জার্মানী যে কেবলমাত্র কতকগুলি রাজ্যখণ্ড ও উপনিবেশ হারাইল তাহা নহে। ভবিষ্যতে যাহাতে জার্মানী আবার শক্তিশালী হইয়া ইউরোপের শান্তি বিপন্ন করিতে না পারে সেজন্য তাহার সামরিক ও আর্থিক ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইল। জার্মান সৈন্যবাহিনীতে এক লক্ষের বেশী সৈন্য ও কর্মচারী থাকিবে না। জার্মানী সৈন্য সংগ্রহের জন্য বাধ্যতামূলক আইন (conscription) প্রবর্তন করিতে পারিবে না। রাইন নদীর পূর্ব তীরে ত্রিশ মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ডে কোন সমরায়োজন হইতে পারিবে না। জার্মানীর রণপোতসমূহ (German High Seas Fleet) ইংলণ্ডকে সমর্পণ করিতে হইবে। জার্মানীর অধিকাংশ বাণিজ্য জাহাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে। জার্মানীর অন্তর্গত হেলিগোল্যাণ্ড দ্বীপের দুর্গাদি (যাহা নৌযুদ্ধের জন্য প্রয়োজন

জার্মানীর শক্তিহ্রাস

হইত) ধ্বংস করা হইবে। জার্মানীর অন্তর্গত কিয়েল খালে (Kiel Canal) সকল জাতির জাহাজের প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হইবে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও ইটালীকে জার্মানী প্রচুর কয়লা দিবে। ইহা ছাড়া জার্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ (reparations) বাবদ মিত্রপক্ষকে প্রচুর অর্থ দিবে। এই ঋণ পরিশোধের জামিনস্বরূপ রাইন নদীর বাম তীর ১৫ বৎসর মিত্রপক্ষের অধিকারে থাকিবে।

ভার্সাই সন্ধিতে ঘোষণা করা হইল যে জার্মানীই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী (war guilt clause)। নিরুপায় জার্মানীকে এই ঘোষণা মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইল। ইহাতে জার্মান জাতির আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। ঐতিহাসিক বিচারে যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব জার্মানীর উপরে আরোপ করা অসঙ্গত।

ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা

যে সকল কারণে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত জার্মানীর প্রতি সুবিচার করিতে পারে নাই তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভার্সাইর সন্ধি যে বলপূর্বক জার্মানীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ("dictated peace") তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই জার্মান জাতি এই সন্ধির কঠোর সর্তগুলিকে মনেপ্রাণে মানিয়া লইতে পারে নাই। পরাজিত দেশকে সকল ক্ষেত্রেই স্বার্থহানি ও অবমাননা স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু জার্মানীর ন্যায় সুসভ্য ও শক্তিমান দেশকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করিয়া রাখিবার চেষ্টা কখনও সফল হয় না। এখানেই ক্লেমেসোঁ এবং লয়েড জর্জ রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। নিজ নিজ দেশের সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহারা জার্মানীকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে পঙ্গু করিতে চাহিয়াছিলেন, অন্যায়ভাবে জার্মান জাতির উপর যুদ্ধের সমগ্র দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়াছিলেন। জার্মানীর উপর যে ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হইয়াছিল তাহা অর্থনীতির দিক হইতে সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল। জার্মানীর মৌলিক স্বার্থ ও মর্যাদায় আঘাত দিয়া ভার্সাইর সন্ধি যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। এই সন্ধির অমর্যাদাসূচক সর্তগুলিকে বাতিল করিয়া জার্মানীকে ইউরোপের শীর্ষদেশে স্থাপন করাই ছিল হিটলারের নীতির লক্ষ্য। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাইর সন্ধিতেই নিহিত ছিল।

অন্যান্য পরাজিত শক্তির সহিত সন্ধি ঃ সেণ্ট জার্মেইন সন্ধি (Treaty of St. Germain ঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) এবং ট্রিয়ানন সন্ধি (Treaty of

the Trianon : ৪ জুন, ১৯২০) দ্বারা অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হইল। প্রথম সন্ধি দ্বারা ভিয়েনা শহর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র জার্মানভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া অস্ট্রিয়া নামক নূতন সাধারণতন্ত্র গঠিত হইল। যাহাতে জার্মান জাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা করা হইল যে জাতিসঙ্ঘের সম্মতি ব্যতীত অস্ট্রিয়া জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হইতে পারিবে না। নবগঠিত যুগোশ্লাভিয়া (Yugoslavia) রাজ্য অস্ট্রিয়া হইতে পাইল বোস্‌নিয়া-হার্জিগোভিনা ও অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূল (Dalmatian coast), নবগঠিত পোল্যাণ্ড পাইল গ্যালিসিয়া (Galicia), রুমানিয়া পাইল বুকোভিনা (the Bukovina)। অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ দুইটির সহিত আরও কয়েকটি অঞ্চল সংযুক্ত করিয়া জেকো-শ্লোভাকিয়া (Czecho-Slovakia) নামক নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইল। ট্রিয়ানন সন্ধি দ্বারা হাঙ্গেরীকে অস্ট্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। হাঙ্গেরী হইতে কয়েকটি প্রদেশ রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও জেকো-শ্লোভাকিয়াকে দেওয়া হইল। হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশের অধিকার পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার ন্যায় হাঙ্গেরী ও জেকো-শ্লোভাকিয়া সাধারণতন্ত্রে (Republic) পরিণত হইল। অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীর সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া এই দেশ দুইটিকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইল। হ্যাপস্‌বুর্গ সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া যে সকল রাষ্ট্র স্থাপন করা হইল তাহাদিগকে 'উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র' (Succession States) বলা হয়।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী

নিউলীর সন্ধি (Treaty of Neuilly: ২৭ নভেম্বর, ১৯১৯) দ্বারা বুলগেরিয়ার কিয়দংশ গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হইল এবং বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা কমাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

বুলগেরিয়া

সেভ্রেসের সন্ধি (Treaty of Sevres : ১০ আগস্ট, ১৯২০) দ্বারা তুর্কী সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হয় তাহা কার্যে পরিণত করা যায় নাই। পরে লুসানের সন্ধি (Treaty of Lausanne : ৯ জুলাই, ১৯২৩) দ্বারা তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মেসোপোটেমিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইল এবং মিশরের উপর তুর্কীর নামমাত্র প্রভুত্বের (suzerainty) অবসান হইল। ইউরোপে কনস্ট্যান্টিনোপল শহর তুর্কীর অধীন রহিল। কার্যতঃ তুর্কী ইউরোপ হইতে নির্বাসিত হইয়া পশ্চিম এশিয়ার একটি শক্তিরূপে পরিগণিত হইল।

তুর্কী

'সুদূর প্রাচ্য' (১৯১৪-১৯১৯) : ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জাপান মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিছুদিনের মধ্যেই চীনের অন্তর্গত শান্টুঙ্ (Shantung) এবং চীনে অবস্থিত জার্মানীর অধিকৃত কয়েকটি স্থান জাপানীরা অধিকার করে। অতঃপর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জাপান চীনের নিকট একুশটি দাবি (Twenty-one Demands) দাখিল করে এবং চীন এই সকল দাবি পূরণ না করিলে যুদ্ধ হইবে বলিয়া হুমকি দেয়। তখন চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন য়ুয়ান শি-কাই। তাঁহার সহিত জাপানের গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। তিনি একুশটি দাবির অধিকাংশই মানিয়া লইলেন। ফলে শান্টুঙ জাপানীদের অধিকারে রহিল, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় তাহাদের প্রভাব দৃঢ়ীভূত হইল, চীনের অর্থনীতিক্ষেত্রে তাহাদের আংশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ইউরোপে যুদ্ধে বিব্রত থাকায় পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি চীনে জাপানের ক্ষমতা বিস্তার বন্ধ করিতে পারিল না। দেশের স্বার্থের বিনিময়ে য়ুয়ান শি-কাই জাপানীদের সমর্থন ক্রয় করিলেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৯১৬); সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্থাপিত তথাকথিত সাম্রাজ্যের অবসান হইল এবং সাধারণতন্ত্র পুনর্জীবিত হইল।

জাপান ও চীন

চীনের বিপদ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। প্যারিস বৈঠকে (১৯১৯) চীন জাপানের নিকট হইতে শান্টুঙ প্রদেশ ফিরিয়া পাইবার দাবি জানাইল, কিন্তু জাপানের বিরোধিতায় কোন পাশ্চাত্ত্য শক্তি চীনের এই যুক্তি-সম্মত দাবি সমর্থন করিল না। অন্যান্য বিষয়েও চীনের কোন দাবি প্যারিস বৈঠকে অনুমোদিত হইল না। প্রশান্ত মহাসাগরে জার্মানীর অধীন দ্বীপগুলি জাপানের হস্তগত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে 'সুদূর প্রাচ্যে' জাপান সর্বাপেক্ষা শক্তিমান দেশরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

প্যারিস বৈঠক

একাদশ অধ্যায়

জাতিসঙ্ঘ (League of Nations)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপ দুইটি সশস্ত্র শিবিরে (Armed Camp) বিভক্ত হইয়াছিল, চতুর্দিকে সমরায়োজন চলিতেছিল। যুদ্ধের আশঙ্কায় মানুষের মনে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতেছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগ শহরে (The Hague) দুইটি আন্তর্জাতিক শান্তি বৈঠকের (The Hague Peace Conferences) অধিবেশন হয়। স্থায়ীভাবে একটি জাতিসঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব ইউরোপ এবং আমেরিকার বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচিত হইতে থাকে। কিন্তু এই আলোচনা ফলপ্রসূ হইবার পূর্বেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেকে মনে করিলেন, স্থায়ী জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটিতে পারিত না। এই যুদ্ধের অবসানে যাহাতে পৃথিবীর দেশগুলি শান্তির জন্য সংগঠিত হইতে পারে সেজন্য অনেকেই উৎসুক হইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রচারক হইলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President of the United States) উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)। যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি চৌদ্দটি সর্ত (Fourteen Points) প্রচার করেন। ইহার মধ্যে একটি সর্ত ছিল যে ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমা রক্ষার জন্য একটি জাতিসঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে।*

জাতিসঙ্ঘ গঠন

রণক্লান্ত পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের আশায় বিভিন্ন দেশে এই প্রস্তাব সমর্থিত হইল। প্যারিস বৈঠকে আলাপ আলোচনার পর ভার্সাই সন্ধিতে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) স্থাপনের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইল। যে দলিলে জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য এবং গঠনপদ্ধতি বিবৃত হইল তাহা Covenant নামে পরিচিত ; ইহা ভার্সাই সন্ধি-পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

---

* "A general association of nations should be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small States alike."

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য :—Covenant-এর প্রস্তাবনায় জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে জাতিসঙ্ঘে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে চায়। সুতরাং (১) তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না; (২) জাতিসমূহের মধ্যে প্রকাশ্য, ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক সম্বন্ধ বজায় রাখিবে; (৩) আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কাজ করিবে; (৪) সকল সন্ধির সর্ত মানিয়া চলিবে।*

প্রস্তাবনা

এই প্রস্তাবনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য Covenant-এ কয়েকটি বিশিষ্ট বিধান ছিল। এই বিধানগুলি জাতিসঙ্ঘের সভ্যদের উপর নানাবিধ দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিল।

(১) যুদ্ধ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিধান ছিল যে সভ্যেরা পরস্পরের রাজ্যসীমা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানিয়া চলিবে এবং বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে উহা রক্ষা করিবে ("to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence" of one another)—অর্থাৎ কোন সভ্য অপর কোন সভ্যের রাজ্য অধিকার বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন করিবে না, এবং যদি কোন বহিরাগত শক্তি দ্বারা উহা বিপন্ন হয় তবে বিপন্ন সভ্যকে সাহায্য করিবে। সভ্যদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা জাতিসঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির (Council) নিকট সালিশী বা অনুসন্ধানের জন্য পেশ করিতে হইবে এবং এই সমিতি কোন নির্দেশ দিলে তাহা পালন করিতে হইবে। Covenant-এর বিধান উপেক্ষা করিয়া

জাতিসঙ্ঘের কার্যাবলী

* "The High Contracting Parties,
in order to promote international co-operation and to achieve international peace and security
by the acceptance of obligations not to resort to war,
by the prescription of open, just and honourable relations between nations,
by the firm establishment of understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments,
and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another,
Agree to this Covenant of the League of Nations."

কোন সভ্য অপর কোন সভ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে জাতিসঙ্ঘের সকল সভ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত সাধারণ শত্রু রূপে গণ্য করা হইবে ("*ipso facto* be deemed to have committed an act of war against all members of the League")। এইরূপ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘের সকল সভ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Sanctions) প্রয়োগ করিবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক হইতে পারে (যেমন, অপরাধী সভ্যের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করা—"severance of all trade or financial relations"), সামরিকও হইতে পারে (use of "effective military, naval, or air force")।

(২) কেবলমাত্র যুদ্ধ নিবারণের এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত রাষ্ট্রকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিলেই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা যায় না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা এবং সখ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হয়। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সভা (Assembly) এবং কার্যকরী সমিতির (Council) মাধ্যমে এই আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেই প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনা দ্বারা সর্বপ্রকার বিরোধ এবং মতভেদের সামঞ্জস্য করা যাইত। গুপ্ত সন্ধি (secret treaties) আন্তর্জাতিক সন্দেহ এবং ঈর্ষা বৃদ্ধি করে, যুদ্ধ টানিয়া আনে। এইজন্য Covenant-এ বিধান ছিল যে সকল সন্ধি-পত্র জাতিসঙ্ঘের দপ্তরে (Secretariat) পেশ করিতে হইবে যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশ সকল সন্ধি-পত্রের মর্ম জানিতে পারে। পুরাতন সন্ধি-পত্রগুলি প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন বা বাতিল করিতে হইবে। অস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ে, শান্তিরক্ষার জন্য অস্ত্রের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক ("the maintenance of peace requires the reduction of national armaments to the lowest point consistent with national safety")। তাই অস্ত্রোৎপাদন সীমাবদ্ধ (Disarmament) করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

(৩) ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিপত্রগুলির কোন কোন সর্ত কার্যে পরিণত করিবার ভার জাতিসঙ্ঘ গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন, ইস্ট প্রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে গণভোট গ্রহণ, ড্যানজিগ নগরীর (Free City of Danzig) এবং সার (Saar) অঞ্চলের শাসন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা (Protection of minority rights), Mandate

সমূহের* শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান, ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের সহিত বহু আন্তর্জাতিক সমস্যা জড়িত ছিল।

(৪) রাজনৈতিক সমস্যা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারের দায়িত্ব জাতিসঙ্ঘ গ্রহণ করিয়াছিল। দাস ব্যবসায় বন্ধ করা, আফিম প্রভৃতি অনিষ্টকর দ্রব্যের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করা, ব্যাধির প্রসার বন্ধ করা, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা প্রভৃতি জাতিসঙ্ঘের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। শ্রমিক মঙ্গল সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি (Labour Convention) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হইয়াছিল।

জাতিসঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সংস্থা : জাতিসঙ্ঘের কার্য নির্বাহের জন্য একটি সাধারণ সভা (Assembly) এবং একটি কার্যকরী সমিতি (Council) ছিল। সাধারণ সভায় প্রত্যেক সভ্যরাষ্ট্র তিনজন প্রতিনিধি পাঠাইত। প্রতি বৎসর একবার সুইজার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা শহরে ইহার অধিবেশন বসিত। বৃহত্তর শক্তিগুলি (Great Powers) কার্যকরী সমিতির স্থায়ী সভ্য ছিল ; ছোট ছোট দেশগুলি ভাগে ভাগে কার্যকরী সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। প্রথমে স্থায়ী সভ্য ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান ; পরে জার্মানী ও রাশিয়াকে স্থায়ী সভ্যপদ দেওয়া হয়। বৎসরে তিনবার কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হইত। আন্তর্জাতিক বিরোধের বিচার বা আইনগত মীমাংসার জন্য একটি স্থায়ী আদালত (Permanent Court of International Justice) ছিল। হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগ (The Hague) শহরে এই আদালত বসিত। জাতিসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক শ্রম পরিষদ (International Labour Office) বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিত।

জাতিসঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা : ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহার সভ্য-সংখ্যা ছিল ৪২, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬২। রাষ্ট্রপতি উইলসন জাতিসঙ্ঘের প্রধান স্থাপনকর্তা হইলেও যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সভ্য হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ইহার কারণ। উইলসনের বিরোধী Republican দল (তিনি Democrat দলভুক্ত ছিলেন) নির্বাচনে জয়লাভ

* এশিয়া এবং আফ্রিকায় তুর্কী ও জার্মানীর শাসনাধীন কতকগুলি দেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কতকগুলি সর্তাধীনে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি বিজয়ী রাষ্ট্রের শাসনাধীনে স্থাপন করা হয়। তাহাদিগকে Mandates বা Mandated Territories বলা হইত (যেমন, সিরিয়া, ইরাক, প্যালেস্টাইন, জার্মান আফ্রিকা, জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ)।

করিয়া তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা করে। মনরোর ঘোষণা (Monroe Doctrine) দ্বারা প্রভাবিত এই দল ইউরোপের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করিত না। ভার্সাই সন্ধি অনুমোদন করা হইলে যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতে ইউরোপের গোলযোগে জড়াইয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট (Senate) ঐ সন্ধি অনুমোদন করিল না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিল না। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জাতিসঙ্ঘ প্রথম হইতেই দুর্বল হইয়া পড়িল।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জাতিসঙ্ঘে যোগ দিল। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ও জার্মানী এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল। তখন বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া সভ্য রহিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার অপরাধে জাতিসঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘের সভ্য ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতিসঙ্ঘের অপমৃত্যু ঘটিল। যুদ্ধাবসানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) গঠিত হইল (১৯৪৫)।

জাতিসঙ্ঘ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বভাবতঃই বহু আন্তর্জাতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথম দিকে সমস্যাগুলির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং জাতিসঙ্ঘের প্রয়াসে কয়েকটি ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাধান হইয়াছিল। ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেনের মধ্যে অ্যালাণ্ড দ্বীপ (Aaland Islands) সংক্রান্ত বিরোধ, পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর মধ্যে সাইলেশিয়া (Upper Silesia) সংক্রান্ত বিরোধ, গ্রীস এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধ, দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বিয়া এবং পেরুর মধ্যে একটি শহরের অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ, ইংলণ্ড এবং তুর্কীর মধ্যে মোসালের তৈলখনি সংক্রান্ত বিরোধ প্রভৃতি জাতিসঙ্ঘের চেষ্টায় শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটিয়া যায়। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে কোন বৃহৎ শক্তির স্বার্থ বিপন্ন হইত সেখানে জাতিসঙ্ঘের প্রভাব প্রায়ই দুর্বল দেশকে রক্ষা করিতে পারিত না। ফ্রান্সের সমর্থনে বলীয়ান হইয়া পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়ার অন্তর্গত ভিল্না শহর (Vilna) দখল করে। ইটালী সামরিক বলের প্রয়োগে গ্রীসের অধীন কর্ফু (Corfu) দ্বীপ অধিকার করে। এই সকল ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘ Covenant অনুসারে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে নাই।

জাতিসঙ্ঘের সাফল্য

বৃহৎ শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে জাতিসঙ্ঘের অক্ষমতা বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। এশিয়ায় জাপান এবং ইউরোপে জার্মানী ও ইটালী আক্রমণাত্মক (aggressive) নীতি গ্রহণ করিল, Covenant-এর সর্তগুলি তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংযত করিতে পারিল না। জাতিসঙ্ঘ তাহাদের কার্যাবলী অনুমোদন না করায় তাহারা জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ ত্যাগ করিল, জাতিসঙ্ঘ Covenant-এর সর্ত অনুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (Sanctions) প্রয়োগ করিতে পারিল না।

জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া গ্রাস (১৯৩১) উপলক্ষ্যে জাতিসঙ্ঘের এই দুর্বলতা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। চীন জাপানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল, জাতিসঙ্ঘ একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করিল। কমিশনের রিপোর্ট জাপানের অনুকূল না হওয়ায় জাপান জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করিল। জাতিসঙ্ঘ জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল না, দুর্বল চীনের অভিযোগের কোন প্রতিকার হইল না।

(১) জাপান

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালী আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া (বা ইথিওপিয়া) আক্রমণ ও অধিকার করিল। আবিসিনিয়া জাতিসঙ্ঘে অভিযোগ উপস্থিত করিলে জাতিসঙ্ঘ অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (economic sanctions) প্রয়োগের নির্দেশ দিল, কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলির শৈথিল্যে এই নির্দেশ কার্যকর হইল না। দুর্বল আবিসিনিয়া স্বাধীনতা হারাইল ; ইটালী জাপানের ন্যায় জাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল।

(২) ইটালী

হিটলার জার্মানীতে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই (১৯৩৩) জার্মানী অস্ত্রোৎপাদন সীমাবদ্ধ (Disarmament) করিবার প্রয়াসের প্রতিবাদে জাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল। ভার্সাই সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানী অস্ত্রসজ্জা করিতে লাগিল। ক্রমে হিটলার অস্ট্রিয়া এবং জেকো-শ্লোভাকিয়া গ্রাস করিলেন (১৯৩৮-৩৯) এবং পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করিলেন (১৯৩৯)। কোন ক্ষেত্রেই জাতিসঙ্ঘ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই।

(৩) জার্মানী

১৯৩৬-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের গৃহযুদ্ধ (civil war) ইউরোপের একটি প্রধান

আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হইয়াছিল। ইটালী, জার্মানী এবং রাশিয়া পরোক্ষভাবে ইহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। কিন্তু জাতিসঙ্ঘ এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই।

(৪) স্পেন

১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার আক্রমণ হইতে দুর্বল ফিনল্যাণ্ডকে রক্ষা করা জাতিসঙ্ঘের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, কিন্তু রাশিয়াকে জাতিসঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল।

(৫) ফিনল্যাণ্ড

বারংবার ব্যর্থতার ফলে জাতিসঙ্ঘের দুর্বলতা পৃথিবীর নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, ইহা যে শান্তিরক্ষা করিতে পারিবে এমন আশা আর রহিল না। কার্যতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই জাতিসঙ্ঘের বিলোপ ঘটিয়াছিল।

জাতিসঙ্ঘ যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছিল তাহা নহে। অস্ত্রোৎপাদন সীমাবদ্ধ করিবার জন্য জাতিসঙ্ঘের দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়াস সফল হয় নাই। জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক নিযুক্ত একটি সমিতি (Disarmament Conference) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াও বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিতে পারে নাই।

জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণঃ জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ তিনটি। প্রথমতঃ, জাতিসঙ্ঘ কখনও পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার অর্জন করে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। এই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ গ্রহণ না করায় জাতিসঙ্ঘ প্রথম হইতেই দুর্বল ছিল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী ও জাপান জাতিসঙ্ঘের সভ্য ছিল না। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শক্তিকে বাহিরে রাখিয়া কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কোন শক্তিমান রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিরোধ করিতে হইলে কেবলমাত্র প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়, অর্থনৈতিক ও সামরিক শাস্তির (economic and military sanctions) পাকাপাকি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইদিক হইতে জাতিসঙ্ঘের Covenant-এ ত্রুটি ছিল। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের (United Nations) সনদে (Charter) এই ত্রুটি খানিকটা সংশোধন করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে হইলে জাতিসঙ্ঘকে বৃহৎ শক্তিগুলির মুখাপেক্ষী হইতে হইত। জাতিসঙ্ঘের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল না, অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ চালাইবার শক্তিও তাহার ছিল না। বৃহৎ শক্তিগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য অনুরুদ্ধ হইলে ন্যায়ের মর্যাদা অপেক্ষা নিজ নিজ স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিত। ইটালী-আবিসিনিয়া সংঘর্ষে ইহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা এবং অকালমৃত্যুর ইহাই মুখ্য কারণ।

জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতিসঙ্ঘ যে ভাবের প্রতীক তাহা লুপ্ত হয় নাই। একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের আশা পরিত্যক্ত হয় নাই। বরঞ্চ জাতিসঙ্ঘের ত্রুটিগুলি যথাসম্ভব দূর করিয়া একটি নূতন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ইহারই পরিণতি। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে জাতিসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ইতিহাসে একটি নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

সমাজতন্ত্রবাদ ঃ অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প বিপ্লবের ফলে একটি ক্রমবর্ধমান শিল্পজগৎ গড়িয়া উঠিতেছিল, শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তৎকালপ্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতি সাধারণতঃ কলকারখানার মালিকদের স্বার্থের অনুকূল ছিল, সুতরাং শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের প্রতি রাষ্ট্র তেমন মনোযোগ দিত না। ফলে শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন (Trade Union Movement) শক্তিশালী হইয়া উঠিল। রাষ্ট্র অষ্টাদশ শতাব্দীর নিরপেক্ষতা নীতি (Laissez faire) পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ

শিল্পক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল, মালিকের অধিকার সঙ্কুচিত এবং শ্রমিকের অধিকার প্রসারিত হইতে লাগিল। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের কার্য মন্থরগতিতে অগ্রসর হইত ; একদল চিন্তাশীল লোক ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া মালিক-শ্রমিক সম্বন্ধের মৌলিক সমস্যাটি নূতনভাবে আলোচনা করিতে লাগিল। এইরূপ আলোচনার ফলে সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) উৎপত্তি ও বিকাশ হইল।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ আছে। সমাজতন্ত্রবাদীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রবাদিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen)। এই যুগে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রবাদিগণের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ফুরিয়ার (Fourier), সেণ্ট সাইমন (Saint-Simon) এবং প্রোধোন (Proudhon)। ইহাদের মধ্যে কেহই স্থায়ী রাজনৈতিক দল গঠন করিতে পারেন নাই, তবে ইহাদের চিন্তাধারা বিভিন্ন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ও শ্রমিক সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদের সহিত জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) মতবাদের মিশ্রণে সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন রূপ বিকশিত হইল। ইহার নাম সাম্যবাদ (Communism) এবং ইহার প্রবর্তক কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ

কার্ল মার্ক্স : মার্ক্স জাতিতে ছিলেন জার্মান ইহুদী ; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতামাতা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তিনি জন্মসূত্রে খ্রীষ্টান ছিলেন। বন (Bonn) ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কালে তিনি হেগেলের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যৌবনে জার্মানীতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক রূপে সরকারবিরোধী মতবাদ প্রচার করিবার অপরাধে তিনি প্রাশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হন। জার্মানী পরিত্যাগ করিয়া তিনি কিছুকাল প্যারিসে বাস করেন। সেখানেই তাঁহার ভবিষ্যতের সহকর্মী এঙ্গেলস্ (Frederick Engels)-এর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এঙ্গেলস্‌ও জাতিতে জার্মান ছিলেন ; ব্যবসায়সূত্রে কিছুকাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া তিনি ইংরেজ সমাজতন্ত্রবাদিগণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মার্ক্স বেশীদিন প্যারিসে বাস করিতে পারেন নাই। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস হইতে নির্বাসিত হইয়া তিনি এঙ্গেলস্‌কে সঙ্গে লইয়া বেলজিয়মের অন্তর্গত ব্রাসেল্‌সে

মার্ক্সের জীবনী

গমন করেন। ক্রমশঃ সমাজতন্ত্রবাদী রূপে সমগ্র ইউরোপে তাঁহার নাম সুপরিচিত হইয়া পড়ে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্মান সমাজতন্ত্রবাদিগণের অনুরোধে 'সাম্যবাদের ইস্তাহার' (*Communist Manifesto*) নামক পুস্তিকা রচনা করেন। সমাজতন্ত্রবাদের নূতন রূপ (অর্থাৎ সাম্যবাদ) এই পুস্তিকায় সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর তিনি লণ্ডনে যাইয়া তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মূলধন' (*Capital*) রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পরে—যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ এক নূতন মতবাদ প্রবর্তন করিল এবং এই মতবাদকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী দল (Communist Party) গঠিত হইল। মানব সমাজ বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীতে (economic classes) বিভক্ত এবং এই শ্রেণীগুলির মধ্যে সংঘাতের (class war) মধ্য দিয়াই শ্রমিক শাসন (rule of the proletariat) প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই মার্ক্স-প্রবর্তিত সাম্যবাদের মূল কথা।

সাম্যবাদী দল

মার্ক্স-প্রবর্তিত সাম্যবাদ কোন ভৌগোলিক বা জাতিগত সীমারেখা স্বীকার করে না, ইহা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মতবাদ। 'শ্রমিকদের কোন দেশ নাই' ("The working men have no country"), তাহারা সকল দেশেই বঞ্চিত ও নির্যাতিত; সুতরাং তাহারা দেশ ও জাতিনির্বিশেষে সম্মিলিত হইয়া শ্রেণীসংগ্রাম (class war) চালাইবে। এই নীতি কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে মার্ক্স ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ ("International Working Men's Association") স্থাপন করেন (ইহা "First International" নামে পরিচিত হইয়াছিল)। এই সঙ্ঘে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ যোগদান করে এবং মার্ক্স স্বয়ং ইহার নিয়মকানুন ও কর্মসূচী রচনা করেন। কিন্তু মার্ক্সের সহিত নৈরাজ্যবাদী (Anarchist) বাকুনিনের (Bakunin) মতভেদের ফলে উক্ত সঙ্ঘ দুর্বল হইয়া পড়ে। মার্ক্সের মৃত্যুর পর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (Second International) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে এই সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সাম্যবাদিগণ তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ ("Third International") স্থাপন করে। সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী বিপ্লব (world revolution) সংঘটন ইহার উদ্দেশ্য

সাম্যবাদী দলের কর্মপদ্ধতি

ছিল। ইউরোপের মধ্যে রাশিয়া দেশেই সাম্যবাদ সর্বপ্রথম সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

রুশ বিপ্লবের কারণঃ 'জার' (Czar)-শাসিত রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রুশ বিপ্লবের মূল কারণ। তিনশত বৎসর কাল (১৬১১-১৯১৭) রাশিয়া রোমানভ (Romanov)-বংশীয় সম্রাটগণের (Czar বা Tsar) শাসনাধীন ছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশে পার্লামেণ্টীয় (Parliamentary) বা গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইলেও রাশিয়ায় 'জার'-তন্ত্রের পতন-কাল পর্যন্ত সম্রাটেরা স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন। সম্রাটকে বলা হইত সমগ্র রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী অধিপতি (Autocrat of All the Russias)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'পবিত্র' (Holy) রাশিয়াতে এই বন্যার জল প্রবেশ করিতে পারে নাই। জনসাধারণকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের উল্লেখযোগ্য কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই; তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয় নাই। সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে (১৮৫৫-১৮৮১) স্থানীয় শাসনকার্য (local government) সম্বন্ধে স্থানীয় প্রতিনিধি-সভাগুলিকে (*Zemstvo*, Land Councils) কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়া জাতীয় প্রতিনিধি-সভা (*Duma*) স্থাপন করিয়া পার্লামেণ্টীয় শাসনের সূত্রপাত করিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে এই নূতন ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করে নাই। বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত মন্ত্রীরা 'জারের' নির্দেশে সরকারী কর্মচারিগণের (bureaucracy) সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন, জনগণের নিকট তাঁহাদের কোন দায়িত্ব ছিল না। আইন প্রণয়ন সম্বন্ধেও সম্রাটের ইচ্ছাই প্রবল ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের ও সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ প্রভাব ছিল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হইত। শিক্ষাক্ষেত্রে আলোচনার ও চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না।

সম্রাটের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভাব ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাশিয়ায় ভূমিদাস্ প্রথা (serfdom) প্রচলিত ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৫৫-১৮৮১) এই প্রথা তুলিয়া দিয়া কৃষকদিগকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং জমির মালিকানা-স্বত্ব প্রদান করেন। ইহাতে কৃষক শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার খানিকটা উন্নতি হইলেও তাহাদের বহু অভাব

জনগণের আর্থিক দুরবস্থা

অভিযোগ ছিল। ইউরোপের প্রগতিশীল দেশগুলির তুলনায় কৃষিপ্রধান রাশিয়া অর্থনীতিক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল, সুতরাং জনসাধারণের দারিদ্র্যও বেশী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়। শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা সহানুভূতিহীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

রাশিয়ায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব একটি আকস্মিক ঘটনা নহে, ইহা দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিপ্লব আন্দোলনের পরিণতি মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ায় বিপ্লবী ভাবধারা নানা খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল।

বিপ্লবীদের মধ্যে অনৈক্য

মার্ক্সপন্থী সাম্যবাদিগণ, বাকুনিনপন্থী নৈরাজ্যবাদিগণ (Anarchists), হত্যা ও ধ্বংসকার্যে বিশ্বাসী নিহিলিস্টগণ (Nihilists), নরমপন্থী সংস্কারকগণ বিভিন্ন আদর্শ ও কর্মসূচীর অনুসরণ করিত। তাহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, 'জার'-তন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি বিধ্বস্ত করিবার উপযোগী শক্তিও তাহারা সঞ্চয় করিতে পারে নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৫৫-১৮৮১) শাসনক্ষেত্রে ও সমাজ-ব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। এজন্য তাঁহাকে 'মুক্তিদাতা সম্রাট' (Czar Liberator) বলা হইত। কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁহার প্রবর্তিত সংস্কারে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। ফলে পরবর্তী সম্রাট তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকালে (১৮৮১-১৮৯৪) সংস্কারের স্রোত রুদ্ধ হয় এবং 'জার'-তন্ত্র বিপ্লবিগণকে নির্যাতন দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭) প্রথমে

বিপ্লবের পূর্বাভাষ

স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে 'জার'-তন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়িলে তাঁহাকে প্রাচীন নীতি খানিকটা পরিবর্তন করিতে হয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় একটি ছোটখাট বিপ্লব সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় নিকোলাস সংস্কারপন্থীদের দাবি অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু দেশের নানাস্থানে

দ্বিতীয় নিকোলাসের নীতি

দাঙ্গাহাঙ্গামা হইল এবং সম্রাটের পিতৃব্য নিহত হইলেন। তখন সম্রাট জাতীয় প্রতিনিধি-সভা (*Duma*) আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পরপর দুইটি জাতীয় প্রতিনিধি-সভার অধিবেশন হইল, কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে দলগত বিরোধের ফলে ইহারা কোন গঠনমূলক কার্য করিতে বা 'জার'-তন্ত্রের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিতে পারিল না। ক্রমে

প্রতিক্রিয়াশীল দলের দ্বারা সমর্থিত সরকার পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিল। তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় প্রতিনিধি-সভা সম্রাটের স্বেচ্ছাচার মানিয়া লইল। সাময়িকভাবে বিপ্লবের অগ্নি নির্বাপিত হইল।

বিপ্লবের আগুনে নূতন ইন্ধন জোগাইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ট্যানেনবার্গের যুদ্ধে (Battle of Tannenberg) জার্মান সেনাপতি হিণ্ডেন্‌বার্গ (Hindenburg) রাশিয়ার বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। পরবৎসর রাশিয়া পুনঃপুনঃ পরাজিত হয় এবং পোল্যাণ্ড, ও বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী প্রদেশগুলি রাশিয়ার হস্তচ্যুত হয়। পরাজয় ও রাজ্যহানির ফলে রাশিয়ার শাসনযন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল, সম্রাটের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হইতে লাগিল। বিপ্লবীরা 'জার'-তন্ত্রের এই দুর্দিনে নূতন উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সৈন্যদল প্রথমে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করিলেও শেষে হিণ্ডেনবার্গের অধীন জার্মান বাহিনী ইহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়

সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস ফরাসীরাজ ষোড়শ লুইর মত দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন ; দেশের সঙ্কটকালে দৃঢ়হস্তে শাসনতরী পরিচালনা করিবার মত শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিল না। রাস্‌পুটিন (Rasputin) নামক এক দুশ্চরিত্র, স্বার্থপর সন্ন্যাসীর (monk) পরামর্শে তিনি অনেক গুরুতর কাজ করিতেন। যখন দেশে অরাজকতার পূর্বাভাষ দেখা গেল, খাদ্যাভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইল, বারংবার পরাজয়ে সৈন্যদলের মনোবল ভাঙ্গিয়া গেল, তখনও তিনি মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না।

সম্রাটের দুর্বলতা

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রমিকদের ধর্মঘট উপলক্ষ্য করিয়া বিপ্লব আরম্ভ হইল। সৈন্যেরা ধর্মঘট দমন না করিয়া বরং শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। জাতীয় প্রতিনিধি-সভা একটি অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) প্রতিষ্ঠা করিল। সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করিলেন ; স্বেচ্ছাচারী 'জার'-তন্ত্র বিলুপ্ত হইল (মার্চ ১৯১৭)।

বিপ্লবের সূত্রপাত

সাম্যবাদী দলের জয়ঃ নবস্থাপিত অস্থায়ী সরকার উদারনৈতিক ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের (Parliamentary

Democracy) পক্ষপাতী ছিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া এই সরকার যে সকল শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করিল তাহাতে বিপ্লবীরা সন্তুষ্ট হইল না। সমাজতন্ত্রবাদের ঢেউ উদারনীতির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিল।* দেশের বিভিন্ন অংশে শ্রমিক ও সৈন্যদের সঙ্ঘ (Soviet) গঠিত হইল। সৈন্যদলে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইল; অস্থায়ী সরকার হইতে উদারনৈতিক সংস্কারপন্থীদিগকে সরাইয়া দিয়া তাহাদের স্থানে সমাজতন্ত্রবাদীদিগকে স্থাপন করা হইল (মে, ১৯১৭)। জার্মানদের বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণ ব্যর্থ হইল। রাশিয়ার দুর্দশায় উৎসাহিত হইয়া পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।

উদারনৈতিক শাসনের ব্যর্থতা

সমাজতন্ত্রবাদীরা ক্ষমতা অধিকার করিলেও তাহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। একদল ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গঠনের পক্ষপাতী ছিল। ইহাদিগকে Mensheviks বলা হইত। ইহাদের নেতা কেরেন্‌স্কি (Kerensky) অস্থায়ী সরকারের নায়ক ছিলেন। অপর দল (Bolsheviks) ছিল চরমপন্থী। এই দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে হিংসামূলক পদ্ধতিতে শ্রেণী-সংগ্রাম (class war) দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র ছিল। এই দলের নেতা ছিলেন লেনিন (Lenin) এবং ট্রট্‌স্কি (Trotsky)। দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চরমপন্থীদের জয় হইল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটিল। কেরেন্‌স্কি ও তাঁহার সমর্থকগণ অস্থায়ী সরকার হইতে বিতাড়িত হইলেন; বলশেভিক নেতা লেনিন ও ট্রট্‌স্কি রাশিয়ার শাসনভার কাড়িয়া লইলেন। রাশিয়ায় সাম্যবাদী দলের (Communist Party) শাসন আরম্ভ হইল।

সাম্যবাদী দলের জয়

বিপ্লবের নেতৃগণ: লেনিনের প্রকৃত নাম ছিল ভ্লাডিমির ইলিয়িচ উলিয়ানোভ (Vladimir Ilyich Ulyanov)। যৌবনে ছাত্র অবস্থায় তিনি মার্ক্সের মতবাদ গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল রাশিয়ায় বিপ্লব আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে তিনি সুইজার্ল্যাণ্ডে ছিলেন এবং সেখান হইতে জার্মানীর গোপন সহায়তার সুযোগে যুদ্ধবিরোধী পুস্তকাদি রাশিয়ায় প্রেরণ করিতেন। লেনিন যুদ্ধবিরোধী ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে

* "Socialism began to break in upon feeble liberal defences."

রাশিয়ার পরাজয় না ঘটিলে 'জার'-তন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপরে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। রাশিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর জার্মানীর সাহায্যে লেনিন সুইজার্ল্যাণ্ড হইতে রাশিয়ায় উপস্থিত হন (এপ্রিল, ১৯১৭)। লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা রাশিয়াকে যুদ্ধ হইতে সরাইয়া লইবে, ইহাই ছিল জার্মানীর আশা। এই আশা ব্যর্থ হয় নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লেনিন ডিসেম্বর মাসে জার্মানীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিলেন; কয়েকমাস পরে (মার্চ, ১৯১৮) রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে স্থায়ী সন্ধি (Treaty of Brest-Litovsk) স্বাক্ষরিত হয়। লেনিন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার প্রকৃত শাসক ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে রাশিয়ায় বিপ্লবী সমাজ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। তাঁহার চরিত্রে আদর্শবাদের সহিত বাস্তববোধের সম্মিলন ঘটিয়াছিল।

রাশিয়ায় সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় লেনিনের প্রধান সহযোগী ছিলেন ট্রট্স্কি। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল লেভি ব্রনস্টাইন (Levi Bronstein)। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন। প্রথমে তিনি লেনিন-বিরোধী Menshevik দলভুক্ত ছিলেন।

ট্রট্স্কি

বিপ্লব আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরে তিনি ক্যানাডা হইতে রাশিয়ায় আগমন করেন এবং প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা বলে লেনিনের প্রধান সহকর্মী রূপে গণ্য হন। তিনি নবস্থাপিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব (Foreign Commissar) ছিলেন এবং লালফৌজ (Red Army) সংগঠন করিয়াছিলেন।

লেনিনের অপর সহযোগী ছিলেন স্ট্যালিন (Stalin)। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল জোসেফ ভিসারিওনোভিচ ঝুগস্‌ভিলি (Joseph Vissarionovich Dzhugashvili)। লেনিন এবং ট্রট্স্কি দীর্ঘকাল রাশিয়ার বাহিরে থাকিয়া বিপ্লব প্রচেষ্টা পরিচালনা করেন, কিন্তু স্ট্যালিন নানাপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াও দেশত্যাগ করেন নাই—তিনি রাশিয়ার অভ্যন্তরে লেনিনের মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বিপ্লব আরম্ভ হইলে তিনি লেনিনের সহিত যোগদান করেন।

লেনিনের শাসনঃ আভ্যন্তরীণ নীতিঃ লেনিনের ছয়বৎসর ব্যাপী শাসনকালের প্রথম দিকে বিপ্লবীরা 'জার'-তন্ত্রের সহিত সংযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভূতপূর্ব সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। অভিজাত শ্রেণী, পুঁজিবাদী

শ্রেণী (Capitalists) এবং সরকারী কর্মচারী শ্রেণীর অসংখ্য ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়; অনেকে দেশান্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে বিপ্লববিরোধী শক্তিসমূহের বিলোপ করিয়া বিপ্লবকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাই এই সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল। বিনা অত্যাচারে ও বিনা রক্তপাতে রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৩,০০০ লোকের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল বলিয়া সরকারী বিবৃতিতে স্বীকার করা হইয়াছে।

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ অনেকাংশে এই নিষ্ঠুর নীতিকে লেনিনের পক্ষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছিল। সন্ধি স্থাপনের পরেও জার্মানী নানাপ্রকারে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। মধ্য ইউরোপে যাহাতে সাম্যবাদ প্রসারলাভ না করে এবং রাশিয়ার ঘটনাবলী যাহাতে পরোক্ষভাবে জার্মানীর সামরিক বলের ক্ষতি না করে সেদিকে জার্মানীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জাপান এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার যুদ্ধ পরিত্যাগে অসন্তুষ্ট হইল, কারণ ইহাতে পরোক্ষভাবে জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহা ছাড়া সাম্যবাদী সরকার রাশিয়ার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করায় এবং পৃথিবীব্যাপী সামাজিক বিপ্লবের আদর্শ ঘোষণা করায় মিত্রশক্তিবর্গের স্বার্থহানি ঘটিয়াছিল। তাহারা জার্মানীর সহিত রাশিয়ার সন্ধির (Treaty of Brest-Litovsk) সর্তগুলি মানিয়া লইল না, 'জার'-তন্ত্রের স্থানে নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী-শাসনও তাহারা স্বীকার করিল না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ (economic blockade) প্রয়োগ করা হইল। উত্তরে মুর্মানস্ক (Murmansk) বন্দরে, পূর্বে ব্লাডিভোস্টক (Vladivostok) বন্দরে এবং দক্ষিণে ওডেসা (Odessa) বন্দরে মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী অবতরণ করিল। একদল জেক (Czech) সৈন্য সাইবেরিয়ায় প্রবেশ করিল। পূর্বদিক হইতে জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণ করিল। ব্রিটিশ বাহিনী আর্কেঞ্জেল (Archangel) অধিকার করিল।

মিত্রশক্তিবর্গের আনুকূল্যে 'জার'-তন্ত্রের আমলের কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ নবস্থাপিত সাম্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেন। সাম্যবাদী সরকারের 'লাল ফৌজের' (Red Army) বিরুদ্ধে দাঁড়াইল বিদ্রোহী 'শ্বেত ফৌজ' (White Armies)। এইরূপে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ

হইল। ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল যে সাম্যবাদী সরকার বৈদেশিক হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

গৃহযুদ্ধ

বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে ডেনিকিন (General Denikin) এবং নৌ-সেনাপতি কোলচাকের (Admiral Kolchak) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেনিকিন সসৈন্যে এশিয়া হইতে মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সাইবেরিয়ার অন্তর্গত ওমস্ক (Omsk) শহরে সাম্যবাদ-বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কোলচাক ইহার সমর্থন করিলেন।

প্রধানতঃ তিনটি কারণে সাম্যবাদী সরকার শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল। প্রথমতঃ, চারি বৎসরের অধিক কাল মহাযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, শান্তিস্থাপনের পর অনেক নূতন সমস্যা তাহাদের সম্মুখে

সাম্যবাদী সরকারের জয়

উপস্থিত হইয়াছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নূতন সংগ্রামে লিপ্ত থাকা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর রাশিয়া এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সাইবেরিয়া হইতে মিত্রশক্তিসমূহের সৈন্যদল সরাইয়া নেওয়া হইল। দ্বিতীয়তঃ, "শ্বেত ফৌজের" অধিনায়কগণের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আদর্শগত পার্থক্য ছিল। কেহ কেহ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, আবার কেহ কেহ 'জার'-তন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন চাহিতেন। এই অনৈক্য বিদ্রোহীদিগকে দুর্বল করিয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গের সামরিক সমর্থন হারাইবার পর তাহাদের পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভব হইল না। কোলচাক ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ডেনিকিন পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকারের কর্তৃত্ব মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী প্রধান জাতিগুলির (Nationalities) প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া একটি সন্ধি (Treaty of Union) করে। এই সন্ধি অনুসারে চারিটি (পরে এগারটি) রাষ্ট্রের সম্মিলনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র

সাম্যবাদী সংবিধান

(Union of Soviet Socialist Republics) গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এবং অঙ্গরাজ্য-গুলির শাসন-ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট দলের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। দলপতিরূপে লেনিন শাসনযন্ত্রের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিলেন।

কমিউনিস্ট শাসনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কার্ল মার্ক্সের আদর্শ অনুযায়ী

পুঁজিবাদ ধ্বংস করিয়া শ্রমিকগণের অবস্থার উন্নতিসাধনে নিয়োজিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থনীতিক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী বহু সংস্কার প্রবর্তিত হইল। কৃষকেরা জমির মালিক হইল। শ্রমিকেরা কল-কারখানার মালিক হইল। রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ ছিন্ন করা হইল। ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত দোকানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ব্যাঙ্কগুলি তুলিয়া দেওয়া হইল।

অর্থনৈতিক বিপ্লব

এই সকল আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কৃষকগণের বিরোধিতায় শস্যোৎপাদন কমিয়া গেল। শহর অঞ্চলে প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দিল (১৯২১-২২)। পঞ্চাশ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, চার কোটি লোক খাদ্যাভাবে শক্তিহীন হইল।

দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুরবস্থায় চিন্তিত হইয়া লেনিন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গোঁড়া সাম্যবাদী মতের পরিবর্তে নূতন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy সংক্ষেপে N. E. P.) গ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার এবং জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বত্ব আংশিকভাবে স্বীকার করা হইল। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য বৈদেশিক মূলধন আনয়নের ব্যবস্থা করা হইল। রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্যবাদী দলের একচেটিয়া অধিকার (Communist dictatorship) বজায় রহিল, কিন্তু অর্থনীতিক্ষেত্রে বাস্তবতার ভিত্তিতে পুরাতন ব্যবস্থার সহিত খানিকটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইল। ইহার ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইল।

নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

লেনিনের শাসন ঃ পররাষ্ট্রনীতি ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ক্ষমতা হস্তগত করিবার অব্যবহিত পরেই লেনিন জার্মানীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং কয়েকমাস পরে সন্ধিস্থাপন (Treaty of Brest Litovsk) করেন (মার্চ, ১৯১৮)। এই সন্ধি দ্বারা রাশিয়া পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী প্রদেশগুলির (Esthonia, Livonia, Courland, Lithuania) উপর সমুদয় দাবি পরিত্যাগ করে এবং ফিনল্যাণ্ড ও জর্জিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে। এই সন্ধি জার্মানীকে পূর্বসীমান্তে (Eastern Front) যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি

জার্মানীর সহিত সন্ধি

দিল এবং জার্মানীর সমগ্র সামরিক বল পশ্চিম সীমান্তে (Western Front) কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হইল। রাশিয়া কর্তৃক পরিত্যক্ত অঞ্চলে জার্মানীর অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশ্য পরে মিত্রশক্তির নিকট পরাজয়ের ফলে জার্মানী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। রাশিয়ার পক্ষে এই সন্ধি বিশেষ ক্ষতির কারণ হইলেও বলশেভিক দলের পক্ষে ইহা বিশেষ লাভজনক হইল। রাশিয়া সুবিস্তৃত রাজ্যখণ্ড হারাইল বটে, কিন্তু বলশেভিক দলের পক্ষে যুদ্ধের চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করা সম্ভব হইল। তখন সাম্যবাদী-দল রাজ্য রক্ষা অপেক্ষা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই বেশী ব্যগ্র ছিল।

জার্মানীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াও রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকার যুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। রাশিয়ায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অবসান হয়। কিন্তু ফ্রান্সের ইঙ্গিতে ও সাহায্যে পোল্যাণ্ড রাশিয়া আক্রমণ করে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। সন্ধির (Treaty of Riga) সর্ত অনুসারে পশ্চিম রাশিয়ার একটি অংশ পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইল।

পোল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে লেনিন পশ্চিমে জার্মানীর এবং পোল্যাণ্ডের নিকট খানিকটা নতি স্বীকার করিলেও পূর্বে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেন। সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়া পুনরায় রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হইল। উক্রেইন (the Ukraine) এবং ককেশাস পর্বতের অপর দিকে অবস্থিত প্রদেশগুলিতে রাশিয়ার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী নবস্থাপিত রাষ্ট্রগুলির সহিত রাশিয়ার সন্ধি স্থাপিত হইল। অন্যান্য দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ ও বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য লেনিন চেষ্টা করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকার স্বীকার করিয়া লইল। ইতিপূর্বে ইউরোপের কয়েকটি দেশ রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যসন্ধি করিয়াছিল।

পররাষ্ট্র নীতি

স্ট্যালিন (Stalin), ১৯২৪-১৯৫৩ঃ লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর রাশিয়া কিছুকাল তিনজন সাম্যবাদী নায়কের (Triumvirate) দ্বারা শাসিত হয়; ইহাদের নাম স্ট্যালিন, কামেনেভ (Kamenev) এবং জিনোভিয়েভ (Zinoviev)। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া ট্রট্স্কি বিতাড়িত হন। পরে তিনি মেক্সিকোতে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। সেইখানেই আততায়ীর

হস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এদিকে স্ট্যালিন কামেনেভ ও জিনোভিয়েভকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকার করেন (১৯২৯)। মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৫৩) রাশিয়ায় তাঁহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

ট্রট্স্কি ও স্ট্যালিনের মতের মধ্যে পার্থক্য

ট্রট্স্কির সাম্যবাদে আন্তর্জাতিকতা প্রবল ছিল; তিনি মনে করিতেন যে সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী বিপ্লব (world revolution) না ঘটিলে একমাত্র রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব সাফল্যলাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ মার্ক্সের মতে যে সকল দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়াছে সেই সকল দেশই সাম্যবাদী বিপ্লবের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র; কিন্তু রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ—শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় অনগ্রসর। স্ট্যালিনের মত ও পথ ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করিতেন যে পৃথিবীর অন্যত্র বিপ্লব না ঘটিলেও রাশিয়ার মত বিশাল দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব সফল হইতে পারে এবং কৃষিপ্রধান রাশিয়াকে সরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক উন্নতি

কৃষিতে এবং শিল্পে রাশিয়ার উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির জন্য দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five-Year Plans, ১৯২৮-১৯৩২, ১৯৩৩-১৯৩৮) করা হয়। পরিকল্পনার রূপায়ণে বিদেশী মূলধন এবং বিদেশী কারিগরের সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও পরিকল্পনা দুইটি সাফল্য লাভ করে; রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ উন্নতিলাভ করে, সামরিক ক্ষেত্রেও রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই বিরাট পরিবর্তনের ফলে কৃষক শ্রেণীকে বহু দুঃখ ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

নূতন সংবিধান

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন সংবিধান (Constitution) প্রবর্তিত হইল। কিন্তু সাম্যবাদী দলের একচেটিয়া প্রভুত্বের কোন পরিবর্তন হইল না। ছলে বলে কৌশলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সরাইয়া দিয়া স্ট্যালিন নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখিলেন। রোমানভ বংশের কোন সম্রাট স্ট্যালিনের ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন না।

পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে স্ট্যালিন বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করিতেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিলে তিনি বাধা দিতে পারেন নাই, বরঞ্চ ঐ অঞ্চলে রেলপথের (Chinese Eastern Railway) কর্তৃত্ব জাপানকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই সময়েই বহির্মঙ্গোলিয়া (Outer Mongolia)

এবং সিংকিয়াং (Sinkiang, Chinese Turkestan) প্রদেশে রাশিয়ার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমে জার্মানীতে হিটলারের (Hitler) ক্ষমতালাভের (১৯৩৩) পর জাপানের সহিত জার্মানীর গুপ্ত যোগাযোগ ঘটে এবং পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর চুক্তি হয়।

স্ট্যালিনের পররাষ্ট্রনীতি

জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে স্ট্যালিন ফ্রান্স ও জেকো-শ্লোভাকিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে (Non-Aggression Pact) আবদ্ধ হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত চুক্তি হইল। অতঃপর রাশিয়া জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) যোগদান করে এবং তাহাকে কার্যকরী সমিতিতে (Council) স্থায়ী আসন দেওয়া হয়। জার্মানী ও জাপানের মধ্যে সাম্যবাদী-বিরোধী চুক্তি (Anti-Communist Pact) স্বাক্ষরিত হয় (১৯৩৬); পরে ইটালী এই চুক্তিতে যোগদান করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করে। পরবৎসর জার্মানী অস্ট্রিয়া গ্রাস করে। জেকো-শ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ড জার্মানীর কবলে পতিত হইবার উপক্রম হইলে রাশিয়া জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয় (১৯৩৯)। অতঃপর ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রাশিয়ার বাহিরে সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রভাব (১৯১৭-১৯৩৯): লেনিন এবং ট্রট্স্কি সমগ্র পৃথিবীতে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ ("Third International", Commintern) গঠিত হইয়াছিল এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময়ে জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, হাঙ্গেরী ও চীন দেশে সাম্যবাদের উল্লেখযোগ্য প্রসার দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সকল দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটে নাই। বরঞ্চ জার্মানী ও ইটালীতে 'ফ্যাসিবাদ' (Fascism) প্রবল হইল এবং চীনে 'কুয়োমিন্‌টাঙ' (Kuomintang) নামে পরিচিত জাতীয়তাবাদী দল সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। রাশিয়ার সংলগ্ন বাল্টিক-তীরবর্তী নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও সাম্যবাদ প্রবল হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোন দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটে নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯)

জার্মানী (১৯১৯-১৯৩৯) :—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের সিংহাসনত্যাগের পর জার্মানীতে সাধারণতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজতন্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক দলের (Social Democratic Party) নেতা এবার্ট (Ebert) রাষ্ট্রপতির (President) পদ গ্রহণ করেন। তখন জার্মানীর সামরিক বল পরাজয় ও নৌ-বিদ্রোহের ফলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, জার্মানী বিজয়ী শত্রুর নিকট বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যাভাবপীড়িত জনসাধারণ অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাশিয়ায় ইতিপূর্বে সাম্যবাদী বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার প্রভাব জার্মানীতে প্রবেশ করিতেছে। জার্মানীর সাম্যবাদী দল নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র বিনষ্ট করিয়া রাশিয়ার অনুকরণে বিপ্লব আনয়নের জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু এই চেষ্টা সফল হইল না (১৯১৯)। অতঃপর নবনির্বাচিত জাতীয় প্রতিনিধি-সভা ওয়েমার (Weimar) শহরে সম্মিলিত হইয়া একটি সংবিধান (Constitution) প্রস্তুত করিল (জুলাই, ১৯১৯)। এই সংবিধান অনুসারে জার্মানী একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে (Federation of Republican States) পরিণত হইল।

নূতন সংবিধান

নানা কারণে ওয়েমার-সাধারণতন্ত্র (Weimer Republic) স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, ভার্সাইর সন্ধির সর্তগুলি জার্মান জাতির পক্ষে চরম ক্ষতি ও অপমানের কারণ হইল। নিরুপায় জার্মান জাতি মনে নিদারুণ ক্ষোভ পোষণ করিতে লাগিল। এবার্ট সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুবিচার আদায় করিয়া এই ক্ষোভ দূর করিতে পারিল না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের পর জার্মানীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। জার্মানীর প্রধান শিল্পাঞ্চল রুড় (Ruhr) ফ্রান্সের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছিল। জার্মানী মিত্রশক্তিদিগকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ (Reparation) বাবদ প্রচুর অর্থ দিতে হইল। মূলধনের অভাবে জার্মানীর ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গেল। জার্মান মুদ্রা মার্কের (mark) মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গেল; ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া

ওয়েমার সাধারণতন্ত্রের দুর্বলতা

গেল। স্বভাবতঃই গণতান্ত্রিক সরকারের উপর জার্মান জাতির আস্থা কমিয়া গেল। তৃতীয়তঃ, সাম্যবাদী দলের শক্তিবৃদ্ধি হইল এবং তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজতন্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক দল দুর্বল হইয়া পড়িল। সাধারণতন্ত্রের দুর্বলতা হিটলারের অভ্যুদয়ের পথ উন্মুক্ত করিল।

ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিয়া জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য মিত্রশক্তিবর্গের চেষ্টায় দুইটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী এবং বেলজিয়মের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সেনাপতি ডয়েস (General Dawes)। এই কমিটির প্রস্তাব (Dawes Plan) অনুসারে জার্মানীর ঋণভার কিছু লাঘব করা হয় এবং জার্মানীকে বৈদেশিক ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি কমিটি নূতন একটি পরিকল্পনা (Young Plan) করে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ ইয়ং। এই পরিকল্পনা অনুসারে জার্মানী পরবর্তী ৫৮½ বৎসরের মধ্যে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই এই পরিকল্পনার প্রয়োগ বন্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মিত্রশক্তিবর্গের আর্থিক দাবি পূরণের শক্তি জার্মানীর ছিল না।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এবার্টের মৃত্যু হইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্মান সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গ (Hindenburg) জার্মান সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি (President) নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন স্ট্রেসম্যান (Stressman)। তাঁহার প্রধান কীর্তি লোকার্নো চুক্তি (Locarno Pact) এবং জার্মানীর জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ লাভ। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্নো চুক্তি দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানীর মর্যাদা আংশিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী, জার্মানী ও বেলজিয়ম এই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিল। জার্মানী আলশাস-লোরেনের উপর দাবি পরিত্যাগ করিয়া এবং রাইন উপত্যকায় (Rhineland) সমরায়োজন না রাখিতে স্বীকৃত হইয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়মের আশঙ্কা দূর করিল। ফ্রান্স ও জার্মানী পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী জাতিসঙ্ঘের

পররাষ্ট্রনীতি

(League of Nations) সভ্য হইল এবং ইহার পরিষদে (Council) স্থায়ী আসন লাভ করিল।

ইতিমধ্যে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল, জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী দল (National Socialist বা Nazi দল) ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার (Adolf Hitler) জাতিতে জার্মান এবং অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রজা ছিলেন। শিক্ষালাভের সুযোগ না পাইয়া তিনি রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তিনি কারারুদ্ধ হন। কারাগারে তাঁহার বিখ্যাত আত্মজীবনী "আমার সংগ্রাম" (*Mein Kampf*, "My Struggle") রচিত হয় এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যায়।

নাৎসী দলের উৎপত্তি

কারামুক্তির পর হিটলার পুনরায় রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনে ভীতিপ্রদর্শন, গুণ্ডামি, নরহত্যা প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু হিটলার জার্মান জাতিকে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন: জার্মানভাষাভাষী বিপুল জনসংখ্যাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে; ভার্সাই এবং সেণ্ট জারমেনের সন্ধি বাতিল করিয়া জার্মান জাতির অপমান ক্ষালন করিতে হইবে; জার্মানীর জন্য পুনরায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠন করিতে হইবে; জার্মানীতে শক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন এবং জাতীয় সৈন্যদল গঠন করিতে হইবে। হতাশাপীড়িত জার্মান জাতি এই কর্মসূচী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাৎসী দলের প্রতি অনুকূল হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় প্রতিনিধি-সভায় (Reichstag) নাৎসীদলের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২ হইতে ১০৭ হইল। দুই বৎসর পরে নাৎসীরা জাতীয় প্রতিনিধি-সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইল। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খ্যাতনামা সেনাপতি হিণ্ডেন্‌বার্গ (Hindenburg)। তিনি হিটলারকে প্রধান মন্ত্রী (Chancellor) নিযুক্ত করিলেন (জানুয়ারী, ১৯৩৩)। কয়েক মাসের মধ্যেই সাম্যবাদী দল ও সমাজতন্ত্রবাদী দলকে দমন করিয়া নাৎসীরা সমুদয় ক্ষমতা হস্তগত করিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে হিণ্ডেন্‌বার্গের মৃত্যু হইল। তখন হিটলার স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী হইলেন। রাশিয়া এবং ইটালীর মত

হিটলারের নীতি

হিটলারের ক্ষমতালাভ

জার্মানীতেও একটি রাজনৈতিক দলের হস্তে শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইল। সেই দলের নায়ক (Fuhrer) স্বৈরাচারী শাসক রূপে সমগ্র জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন।

নাৎসী-শাসনে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিল। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (National Socialism) সাম্যবাদের (Communism) সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, সুতরাং হিটলারের আমলে জার্মানীতে সাম্যবাদ বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর উদার-নৈতিক ভাবধারা (Liberalism) নাৎসীরা দুর্বলতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিত। সুতরাং জার্মানীতে অতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রবল হইল। ইহার অন্যতম ফল প্রচণ্ড ইহুদী-বিদ্বেষ। নাৎসীরা মনে করিত যে জার্মান জাতি আর্যবংশসম্ভূত এবং অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনার্যবংশসম্ভূত ইহুদী-দিগকে জার্মানীর শত্রুরূপে গণ্য করিয়া নাৎসীরা নির্যাতনের বন্যা প্রবাহিত করিল। লক্ষ লক্ষ ইহুদী নিহত হইল। খ্রীষ্টধর্মের উপরও নাৎসীদের আক্রমণ চলিল।

নাৎসী শাসনের ফল

নাৎসী-শাসনে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নতি হইয়াছিল। সরকারী প্রচেষ্টার ফলে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির শ্রীবৃদ্ধি হইল। জার্মানীকে যাহাতে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় সেজন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Four-Year Plan) প্রবর্তন করা হইল। যুদ্ধ দ্বারা পররাষ্ট্রনীতি সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের সমুদয় আর্থিক সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পর নাৎসীদলের নায়ক (Fuhrer) হিটলারের ইচ্ছার বিরোধিতা করিবার শক্তি জার্মানীতে কাহারও ছিল না। দেশের শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তি তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। এই প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ছলে বলে কৌশলে জার্মানীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল তাহা তিনি নিজে ভুলিতে পারেন নাই, জার্মান জাতিকেও ভুলিতে দেন নাই। সেই অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং জার্মানীকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। এই সঙ্কল্প সাধনের জন্য তিনি জার্মানীকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে এবং সামরিক ক্ষেত্রে অসামান্য বলশালী করিয়া তুলিলেন। তারপর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতির প্রয়োগ আরম্ভ হইল।

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে—ক্ষমতালাভের পর কয়েক মাসের মধ্যে—হিটলার জার্মানীকে জাতিসঙ্ঘ হইতে সরাইয়া লইলেন, কারণ জাতিসঙ্ঘের Covenant এবং আন্তর্জাতিক আইন (International Law) মানিয়া কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বলপ্রয়োগে উদ্দেশ্যসিদ্ধিই তাঁহার নীতি ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই সন্ধির সর্ত লঙ্ঘন করিয়া হিটলার জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রথা (conscription) প্রবর্তন করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকার্নো সন্ধি (Treaty of Locarno) বাতিল করিয়া দিলেন এবং রাইন নদীর বামতীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন।

ইতিমধ্যে জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়া এবং রাশিয়া ও জেকো-শ্লোভাকিয়া মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল (১৯৩৫)। জার্মানী অন্যান্য শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া হিটলার পোল্যাণ্ড (১৯৩৪) ও ইংলণ্ডের (১৯৩৫) সহিত সন্ধি করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও জাপান সাম্যবাদী-বিরোধী (অর্থাৎ রাশিয়া-বিরোধী) চুক্তি (Anti-Commintern Pact) করিল। সেই বৎসর ইটালীর স্বেচ্ছাচারী শাসক মুসোলিনীর সহিত হিটলারের যোগাযোগ ঘটিল; 'রোম-বার্লিন চক্র' ("Rome-Berlin Axis") সৃষ্টি হইল। জাতিসঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করিয়া আবিসিনিয়া অধিকার (১৯৩৬) করিবার পর ইটালীর পক্ষে ইউরোপে মিত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়াছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল এবং জার্মানী-জাপানের সাম্যবাদী-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করিল। এইরূপে 'রোম-বার্লিন চক্র' প্রসারিত হইয়া 'রোম-বার্লিন-টোকিও চক্রে' (Rome-Berlin-Tokyo Axis) পরিণত হইল। 'সুদূর প্রাচ্যে' জাপান এবং ইউরোপে ইটালী হিটলারের সহযোগী হইয়া জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি করিল।

আবিসিনিয়ায় ইটালীকে বাধাদান করিতে না পারিয়া (১৯৩৫-১৯৩৬) জাতিসঙ্ঘ মর্যাদা ও প্রভাব হারাইল; অন্য কোন রাষ্ট্র ইটালীর মত আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিলে জাতিসঙ্ঘ অথবা বৃহৎ শক্তিবর্গ সম্মিলিত ভাবে তাহাকে বাধা দিবে, এমন সম্ভাবনা রহিল না। হিটলারের পক্ষে বলপ্রয়োগে রাজ্য-বিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। ভার্সাই সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া ছলে বলে তিনি অস্ট্রিয়া গ্রাস করিলেন (১৯৩৮)। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইহাতে বাধা না দেওয়ায় হিটলারের সাহস বাড়িল। তিনি জেকো-শ্লোভাকিয়ার জার্মান অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে ঐ রাষ্ট্রটি গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন

(১৯৩৮)। ইংলণ্ড এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল, কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) তোষণ নীতি (policy of appeasement) অবলম্বন করিয়া কার্যতঃ জেকো-শ্লোভাকিয়ার সর্বনাশ সাধনে সহায়তা করিলেন। তিনি হিটলারের সহিত একটি চুক্তি করিলেন, কিন্তু হিটলার এই চুক্তির সর্ত না মানিয়া জেকো-শ্লোভাকিয়া অধিকার করিলেন (১৯৩৯)। এইরূপে মধ্য ইউরোপের দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইল। হিটলারের রাজ্য-সীমা প্রসারিত হইল, জেকো-শ্লোভাকিয়ার শিল্প-সম্পদ তাঁহার হস্তগত হইল। আক্রমণাত্মক নীতির সাফল্য তাঁহার লোভ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করিল।

ইংলণ্ডের তোষণ নীতি

অতঃপর বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত ড্যানজিগ (Danzig) শহর এবং পোল্যাণ্ডের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি পতিত হইল। ইংলণ্ড এতদিনে জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধির কুফল বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণা করিলেন যে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাকে সাহায্য করিবে। হিটলার এই সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতিপূর্বে হিটলার ইটালীর সহিত এক নূতন চুক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু ইটালী আপাততঃ যুদ্ধে যোগদান করিল না। যুদ্ধারম্ভের কয়েক দিন পূর্বে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব কতখানি তাহা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতির ফলেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইটালী (১৯১৯-১৯৩৯): ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জয়ী হইয়াছিল এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লেণ্ডো (Orlando) প্যারিস বৈঠকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় ইটালীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধের পর জনসাধারণের ধারণা হইল যে ইটালী অন্যান্য মিত্রশক্তির মত লাভবান হয় নাই। নবস্থাপিত যুগোশ্লাভিয়ার সহিত ফিউম (Fiume) শহরের অধিকার লইয়া বিরোধ ঘটিলে এই ধারণা প্রবল হইল।

গণতন্ত্রের পতন

গণতন্ত্রবাদী সরকার জনসাধারণের নানাবিধ অভিযোগের প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইল। দেশব্যাপী অসন্তোষের সুযোগ লইয়া মুসোলিনীর (Benito Mussolini) নেতৃত্বাধীনে 'ফ্যাসিবাদী' (Fascist) দল শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লইল।

মুসোলিনীর ক্ষমতা লাভ

হিটলারের মত মুসোলিনীও প্রথম জীবনে শ্রমিক ছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের অপরাধে তিনি সুইজার্ল্যাণ্ডে নির্বাসিত হন। ইটালী যাহাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে সেজন্য তিনি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিলান (Milan) শহরে 'ফ্যাসিবাদী' দলের প্রথম সম্মেলন হয়। ক্রমশঃ এই দলের সভ্য-সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সভ্য-সংখ্যা ছিল ১৭,০০০ ; ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইল ৩০০,০০০। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে 'ফ্যাসিবাদী' বাহিনী (Blackshirts) রোম অভিমুখে যাত্রা করিল। দেশকে গৃহযুদ্ধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া ইটালীর রাজা মুসোলিনীর হস্তে শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় (১৯৪৩) পর্যন্ত মুসোলিনী ইটালীর স্বেচ্ছাচারী শাসক রহিলেন।

'ফ্যাসিবাদ'

মুসোলিনীর আমলে ইটালীতে পার্লামেণ্টীয় (Parliamentary) গণতান্ত্রিক শাসন বিলুপ্ত হইল, একটি রাজনৈতিক দলের নেতার উপর সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত হইল। Duce উপাধিভূষিত মুসোলিনী ইটালীর শাসক হইলেন। রাশিয়াতে যাহা ঘটিয়াছিল এবং জার্মানীতে যাহা ঘটিতে যাইতেছিল ইটালীতে তাহাই ঘটিল। তবে 'ফ্যাসিবাদের' (Fascism) সহিত সাম্যবাদের মূলগত বিরোধ এবং নাৎসীবাদের (Nazism) সহিত মূলগত ঐক্য ছিল। 'ফ্যাসিবাদ' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individualism), গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি অস্বীকার করিত ; পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 'ফ্যাসিবাদীরা' শান্তির বিরোধী অর্থাৎ যুদ্ধের সমর্থক ছিল। অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই 'ফ্যাসিবাদী'দের উদ্দেশ্য ছিল।

ইটালীর রাজতন্ত্রের সহিত পোপের বহুদিন যাবৎ বিরোধ চলিতেছিল। মুসোলিনী একটি সন্ধি দ্বারা (Treaty of the Lateran) এই বিরোধের অবসান করেন (১৯২৯)। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন মুসোলিনীর

পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইটালীর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ইটালীর প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) নিয়ম অনুযায়ী এই আক্রমণ অন্যায় হইলেও পাশ্চাত্য শক্তিরা সমবেতভাবে ইহার প্রতিরোধ করে নাই। ফলে ইটালীর অভিযান সফল হইল, দুর্বল আবিসিনিয়া আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া ইটালীর অধিকারভুক্ত হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল এবং জার্মানী ও জাপানের সহিত সাম্যবাদী-বিরোধী চুক্তি (Anti-Commintern Pact) করিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আলবেনিয়া (Albania) আক্রমণ ও অধিকার করিল। 'ফ্যাসিবাদে'র পররাষ্ট্র-নীতি জাতিসঙ্ঘকে দুর্বল করিল এবং ইউরোপে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিল।

মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতি

ফ্রান্স (১৯১৯-১৯৩৯)ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে (Continent) ফ্রান্সের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। জার্মানী পরাজিত ও দুর্বল, রাশিয়া বিপ্লবে উদ্বেলিত, ইংলণ্ড এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। ইংলণ্ড জার্মানীকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফ্রান্সের ইচ্ছা ছিল যে জার্মানীকে চিরদিনের জন্য দুর্বল করিয়া রাখিতে হইবে, ইউরোপের শান্তিরক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজন। ইংলণ্ড মনে করিত যে জার্মানীকে আত্মনির্ভরশীল, শক্তিমান দেশ হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ফ্রান্স সাময়িকভাবে ইংলণ্ডের সহিত একমত হইয়া লোকার্নো সন্ধি (Treaty of Locarno) গ্রহণ করিল। পরে হিটলার জার্মানীকে নূতন শক্তি দান করিলেন এবং নূতন কর্মপন্থা দেখাইলেন। মুসোলিনী ইটালীকে নব শক্তিতে শক্তিমান করিয়া আফ্রিকায় ফ্রান্সের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন। তথাপি ফ্রান্স ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণকালে দৃঢ় নীতি গ্রহণ করিতে পারিল না, বরং পরোক্ষভাবে ইটালীকে আবিসিনিয়া গ্রাসের সুযোগ দিয়া জাতিসঙ্ঘের কবর খনন করিল। মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি আর ফ্রান্সের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া নিরপেক্ষতা নীতি গ্রহণ করিল।

পররাষ্ট্রনীতি

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রধান সমস্যা ছিল মন্ত্রিসভাগুলির

স্বল্পকালস্থায়িত্ব। ফ্রান্সে বহু রাজনৈতিক দল ছিল। সাধারণতঃ জাতীয় প্রতিনিধি-সভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিত না। সুতরাং কয়েকটি দল সম্মিলিত ভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিত। নানা বিষয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্য থাকায় এইরূপ মন্ত্রিসভা সাধারণতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই পদত্যাগ করিত। বারংবার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইত, আভ্যন্তরীণ শাসনও দৃঢ় হইতে পারিত না। যুদ্ধের পর ফ্রান্সের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, স্বল্পকালস্থায়ী মন্ত্রিসভাগুলি তাহার প্রকৃত সমাধান করিতে পারে নাই।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

স্পেন ও পর্তুগাল: স্পেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে নাই, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন কার্যতঃ সামরিক শাসন (military dictatorship) মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। রাজা নামে মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিলেন, শাসনভার সেনাপতি প্রাইমো ডি রিভেরার (Primo do Rivera) উপর ন্যস্ত হইল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রিভেরাকে পদচ্যুত করিলেন, কিন্তু পরবৎসর রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হইল এবং স্পেনে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাটালোনিয়া (Catalonia) প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে, কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দাঙ্গা-হাঙ্গামা গৃহযুদ্ধে পরিণত হইল; সরকারবিরোধী দলের নায়ক হইলেন সেনাপতি ফ্রাঙ্কো (Franco)। প্রায় তিন বৎসর যুদ্ধ চলিল। শেষে সেনাপতি ফ্রাঙ্কো রাজধানী ম্যাড্রিড অধিকার করিয়া (জানুয়ারী, ১৯৩৯) স্পেনের স্বেচ্ছাচারী শাসক হইলেন।

স্পেন

পর্তুগালে বার বার বিপ্লবের ফলে অগণতান্ত্রিক, 'ফ্যাসিবাদী' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মধ্য ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯): যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া একটি ক্ষুদ্র, দুর্বল সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী ডল্‌ফাস (Dolfuss) মুসোলিনীর প্রভাবাধীন হইয়া সংবিধান বাতিল করেন এবং স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব প্রবর্তন করেন। পর বৎসর নাৎসী দল তাঁহাকে হত্যা করে। নাৎসী দলের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করা। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার প্রতারণার দ্বারা সৈন্যবলের সাহায্যে অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

অস্ট্রিয়া

নবস্থাপিত জেকো-শ্লোভাকিয়া একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও জেকো-শ্লোভাকিয়া সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র মিত্রসঙ্ঘ (Little Entente) গঠন করিয়াছিল। জার্মান-ভাষাভাষী একটি বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জেকো-শ্লোভাকিয়ার পক্ষে বিপদের কারণ হইল। সন্ধির সর্ত অনুসারে তাহারা এই রাষ্ট্রের অধিবাসী হইলেও মনে মনে তাহারা সংখ্যাগুরু জেক ও শ্লোভাক জাতির শাসন মানিয়া লয় নাই। নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য তাহারা 'সুদেতেন' (Sudeten) দল গঠন করিল। এই দলের সহিত জার্মানীর নাৎসী দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জেকো-শ্লোভাকিয়ার সরকার জার্মানদিগকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়াও তাহাদের সন্তোষবিধান করিতে পারিল না। হিটলার পূর্বাঞ্চলে জার্মানীর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'সুদেতেন' দলের পক্ষ লইয়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স খানিকটা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না, বরঞ্চ প্রথম দিকে তাঁহার দাবি খানিকটা মানিয়া লইয়া (Munich Pact : সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) তাঁহার সুবিধা করিয়া দিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জেকো-শ্লোভাকিয়া স্বাধীনতা হারাইয়া হিটলারের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

জেকো-শ্লোভাকিয়া

পোল্যাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দীর্ঘকাল পরে স্বাধীনতা ও ঐক্য লাভ করিয়াছিল। প্রথমে সীমাসংক্রান্ত ব্যাপারে চারিটি প্রতিবেশীর (রাশিয়া, জার্মানী, লিথুয়ানিয়া এবং জেকো-শ্লোভাকিয়া) সহিত পোল্যাণ্ডের বিরোধ ঘটে। এই সকল বিরোধের পরিণতি মোটামুটি পোল্যাণ্ডের পক্ষে লাভজনক হইয়াছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন-ক্ষমতা সেনাপতি পিল্‌সুদ্‌স্কির (Pilsudski) হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। অতঃপর সংবিধান পরিবর্তন করিয়া অগণতান্ত্রিক, 'ফ্যাসিবাদী' আদর্শ গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে দশ বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি (Non-Aggression Pact) স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু ইহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

পোল্যাণ্ড

উত্তর ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) : উত্তর ইউরোপে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি নূতন রাষ্ট্র (ফিনল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া,

এস্থোনিয়া) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের জনসংখ্যা এবং আর্থিক সম্পদ অল্প ছিল এবং পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের (রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানী) নিকট হইতে আক্রমণের ভয় ছিল। ফিনল্যাণ্ড গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন ও অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া এই দেশটি গ্রাস করিল। লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া এবং এস্থোনিয়ায় অগণতান্ত্রিক, 'ফ্যাসিবাদী' শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল।

বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯)ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে হাঙ্গেরী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। রাজ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়া গেল, শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীরা (জেকো-শ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া) তিনদিক বেষ্টন করিয়া রহিল। হ্যাপ্‌স্‌বুর্গবংশীয় সম্রাট কার্ল (Karl) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিলেও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নৌ-সেনাপতি হর্থি (Admiral Horthy) শাসনভার পরিচালনা করিতেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলা কুন (Bela Kun) সাময়িকভাবে হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার অনুকরণে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর হাঙ্গেরীতে 'ফ্যাসিবাদী' দলের উদ্ভব হয়।

হাঙ্গেরী

যুদ্ধ-পূর্ববর্তী কালের সার্ভিয়া রাজ্য যুদ্ধের পরে বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়া যুগোশ্লাভিয়া (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes : Yugoslavia অর্থাৎ Land of Southern Slavs) নামে পরিচিত হয়। পরাজিত অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী হইতে কয়েকটি প্রদেশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ নানাবিধ গোলযোগের ফলে রাজা আলেকজাণ্ডার কয়েক বৎসর (১৯১৯-১৯৩৪) স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিলেন।

যুগোশ্লাভিয়া

যুগোশ্লাভিয়ার মত রুমানিয়াও যুদ্ধের ফলে বিশেষ লাভবান হইয়াছিল। হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার নিকট হইতে কয়েকটি প্রদেশ লাভ করায় রুমানিয়ার আয়তন দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছিল। যুগোশ্লাভিয়ার মত রুমানিয়াতেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই রুমানিয়ায় ইটালীর অনুকরণে ফ্যাসিবাদ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

রুমানিয়া

একনায়কতন্ত্রের (Dictatorship) প্রসারঃ দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী-

কালে (১৯১৯-৩৮) ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দুইটি বিষয়ে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ঃ (১) একনায়কতন্ত্রের প্রসার, (২) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা। একনায়কতন্ত্রের দুইটি রূপঃ সাম্যবাদ (Communism) এবং ফ্যাসিবাদ (Fascism)। সাম্যবাদের উৎপত্তিস্থল ও কেন্দ্র ছিল রাশিয়া। দেশকালপাত্র ভেদে ইহার আদর্শ ও কার্যপদ্ধতির রূপান্তর ঘটিত না। ফ্যাসিবাদ প্রথমে ইটালীতে আত্মপ্রকাশ করে ; ইহার প্রবর্তক ছিলেন মুসোলিনী। পরে জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের একটি নূতন রূপের উৎপত্তি হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইটালীর ফ্যাসিবাদের সহিত জার্মানীর নাৎসীবাদের মূলগত ঐক্য ছিল।

যুদ্ধের ফলে পরিবর্তন

উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া এবং তুর্কী ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে মোটামুটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যায়, এই বিশ্বাস জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের পুরাতন রাজনৈতিক সংগঠন ভাঙ্গিয়া পড়িল। জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও তুর্কীর সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল। রাশিয়ার ইউরোপীয় সাম্রাজ্য (পোল্যাণ্ড এবং বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল) তাহার হস্তচ্যুত হইল। পোল্যাণ্ড ও জেকো-শ্লোভাকিয়া নূতন স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। মধ্য ইউরোপে, উত্তর-পূর্ব ইউরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রাজ্যসীমার নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধের চাপে বহু অর্থ নৈতিক পরিবর্তন ঘটিল ; বিশেষতঃ পরাজিত দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। যুদ্ধের নিদারুণ অভিজ্ঞতা মানুষের মনে বিপ্লব আনিল। নূতন ভাবধারা ইউরোপকে প্লাবিত করিল।

একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ

এই সমুদয় বিরাট পরিবর্তনের ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে যে সকল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিল অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক সরকার তাহাদের সমাধান করিতে পারিল না। ফলে জনসাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইল, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় তাহাদের বিশ্বাস শিথিল হইল। মুসোলিনী, হিটলার প্রভৃতি সুচতুর রাজনৈতিক নেতৃগণ ইহার সুযোগ লইয়া জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে টানিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণের ধারণা হইল যে গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হইলে তাহারা

অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্ত জীবন যাপন করিতে পারিবে। তাহাদের অন্ধ সমর্থনে একনায়কতন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল।

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের গণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই এই দুইটি দেশে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটে নাই। যুগোশ্লাভিয়াতে রাজতন্ত্র কার্যতঃ একনায়কতন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল, রাজা আলেকজাণ্ডার শাসন-ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাজতন্ত্রকে নূতন রূপ দিয়াছিলেন। রুমানিয়াতেও ইহাই ঘটিয়াছিল, রাজাই প্রকৃত শাসক ছিলেন। পোল্যাণ্ডে সেনাপতি পিলসুদ্‌স্কি, হাঙ্গেরীতে নৌ-সেনাপতি হর্থি, পর্তুগালে সেনাপতি কার্মোনা (Carmona), স্পেনে সেনাপতি ফ্রাঙ্কো একনায়কতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহেও ক্রমে ক্রমে অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা : আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘের চেষ্টায় আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা হইয়াছিল। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের দুর্বলতা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি স্ব স্ব নিরাপত্তা (security) রক্ষার জন্য বিভিন্ন চুক্তির আশ্রয় লইয়াছিল।

প্রতিযোগী সশস্ত্র শিবির

নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থার জন্য ফ্রান্সের আগ্রহই খুব বেশী ছিল। জার্মানী ভবিষ্যতে শক্তিসঞ্চয় করিয়া আবার ফ্রান্স আক্রমণ করিতে পারে, এই সম্ভাবনা ফরাসী জাতি কখনও ভুলিতে পারে নাই। ফ্রান্স নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য বেলজিয়ম, পোল্যাণ্ড, জেকো-শ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়ার সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে ফ্রান্সের নায়কত্বে একটি শক্তিসঙ্ঘ (Little Entente) স্থাপিত হইল।

জার্মানী, তুর্কী, লিথুয়ানিয়া, পারস্য এবং আফগানিস্তানের সহিত রাশিয়া মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইল। জেকো-শ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া ও স্পেনের সহিত ইটালী সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করিল। পরে জার্মানীর সহিত মৈত্রী স্থাপন দ্বারা মুসোলিনী ইটালীর ভাগ্য হিটলারের ভাগ্যের সহিত সংযুক্ত করিলেন।

এই সকল চুক্তির ফলে ইউরোপ প্রকৃতপক্ষে তিনটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হইল ; ইহাদের কেন্দ্র হইল ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইটালী। এদিকে জাতিসঙ্ঘের

মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে লোকার্নো চুক্তি (Locarno Pact) এবং কেলোগ-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি (Kellogg-Briand Pact) বা প্যারিস চুক্তি (Pact of Paris) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করা। কেলোগ-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। কেলোগ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী (Secretary of State) ছিলেন, ব্রিয়াণ্ড ছিলেন ফ্রান্সের প্রতিনিধি। এই

আন্তর্জাতিক চুক্তি

চুক্তি দ্বারা যুদ্ধ বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইল; কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য, অথবা পূর্ববর্তী কোন সন্ধির সর্ত পালনের জন্য, অথবা জাতিসঙ্ঘের সভ্যরূপে কর্তব্য পালনের জন্য যে যুদ্ধ তাহাই আইনসঙ্গত রূপে স্বীকার করা হইল। চীন, জার্মানী এবং ইটালীর আক্রমণাত্মক (aggressive) নীতির ফলে এই দুইটি আন্তর্জাতিক চুক্তি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ নিবারণে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

কারণ : ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব কতখানি তাহা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতির ফলেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐ নীতিকেই এই মহাসংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ রূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র হিটলারের উপর দায়িত্ব চাপাইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ বুঝিতে পারা যাইবে না। জার্মান জাতি ঐ আক্রমণাত্মক নীতি সমর্থন করিল কেন? হিটলারের ইচ্ছার বিরোধিতা করিবার শক্তি জার্মানীতে

কাহারও ছিল না, একথা সত্য। কিন্তু জার্মানীর শাসন-কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিবদ্ধ করা হিটলারের পক্ষে সম্ভব হইল কিরূপে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ভার্সাইর সন্ধি ও তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

ভার্সাইর সন্ধি নানা দিক হইতে জার্মানীর উপর অবিচার করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। ইউরোপে জার্মানীর রাজ্যের কয়েকটি খণ্ড এবং ইউরোপের বাহিরে জার্মানীর উপনিবেশগুলি কাড়িয়া লওয়া হইল। জার্মানীর সামরিক বল ও নৌবল খর্ব করা হইল। জার্মানীর উপর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্রশক্তিগুলিকে প্রচুর অর্থ প্রদানের দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হইল। শক্তিতে ও সভ্যতায় যে জাতির স্থান ইউরোপের শীর্ষদেশে ছিল তাহাকে চিরদিনের মত পঙ্গু করিয়া রাখিবার চেষ্টা সন্ধির সর্তগুলিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল।

ভার্সাইর সন্ধি

কেবল যে জার্মানীর শক্তিহ্রাসের বন্দোবস্ত করা হইল তাহা নহে, জার্মান জাতির মর্যাদা বোধে আঘাত করা হইল। সন্ধিপত্রে ঘোষণা করা হইল যে জার্মানীই যুদ্ধের জন্য দায়ী। এই অপমানকর ঘোষণার প্রতিবাদ করিবার সুযোগ জার্মানীকে দেওয়া হইল না। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীকে সন্ধির সর্তগুলি আলোচনা করিবার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয় নাই, পুনরায় যুদ্ধারম্ভের হুমকি দেখাইয়া জার্মানীকে সর্তগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। জার্মানী পরাজিত হইলেও ইউরোপে জার্মান জাতির স্থান বিবেচনা করিয়া তাহাকে সন্ধির সর্ত আলোচনার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। যুদ্ধপরবর্তী কালে জার্মানী ভার্সাইর সন্ধিকে বলপূর্বক চাপান সন্ধি (Dictated Peace) রূপে গণ্য করিত এবং ইহার সর্তগুলি মানিয়া লইবার নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করিত।

পরাজিত শত্রুর প্রতি উদারতা কেবলমাত্র নৈতিক কর্তব্য নহে, রাজনৈতিক দিক হইতেও ইহা বিজ্ঞতাসূচক ও প্রকৃত শান্তিস্থাপনের অনুকূল হইতে পারে। স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধে (War of Spanish Succession) এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধে (Napoleonic War) ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু বিজয়ী শক্তিগুলি ফ্রান্সের উপর অন্যায় সর্ত চাপাইয়া দেয় নাই। এজন্য ফ্রান্স ইউট্রেক্টের সন্ধি এবং ভিয়েনার সন্ধি বাতিল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ইউরোপে নূতন অশান্তি সৃষ্টি করে নাই। সাত সপ্তাহের যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া বিসমার্ক তাহার সহিত উদার ব্যবহার করেন, ফলে অস্ট্রিয়া নবস্থাপিত জার্মান সাম্রাজ্যের সহিত স্থায়ী মৈত্রী (Triple Alliance) সূত্রে

আবদ্ধ হয়। এই সকল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ না করিয়া এবং রাষ্ট্রপতি উইলসনের উদার নীতি অগ্রাহ্য করিয়া ক্লেমেসোঁ এবং লয়েড জর্জ জার্মানীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে জার্মান জাতির মনে অসন্তোষের আগুন জলিয়া উঠিল, সন্ধির অন্যায় সর্তগুলি বাতিল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া জার্মানী সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতি ইহারই পরিণতি। তাঁহার নেতৃত্বে আস্থাবান হইয়া জার্মান জাতি তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। এই প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ছলে বলে কৌশলে জার্মানীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

হিটলারের নীতি

ভার্সাইর সন্ধি জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল তাহা তিনি নিজে ভুলিতে পারেন নাই, জার্মান জাতিকেও ভুলিতে দেন নাই। সেই অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং জার্মানীকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। এই সঙ্কল্প সাধনের জন্য তিনি জার্মানীকে অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং সামরিক ক্ষেত্রে অসামান্য বলশালী করিয়া তুলিলেন। তারপর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতির প্রয়োগ আরম্ভ হইল। ভার্সাই সন্ধির সর্ত বাতিল করা সম্বন্ধে জার্মানীর প্রচেষ্টা হিটলারের ক্ষমতা অধিকারের পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্যের কারণ ফরাসী এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে পার্থক্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং প্যারিস শান্তিবৈঠকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিল। জাতিসঙ্ঘের প্রথম যুগে সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তাহাদের অবিসংবাদী নেতৃত্ব ছিল। সুতরাং ভার্সাই সন্ধির উপর ভিত্তি করিয়া যে পশ্চিম ইউরোপ গঠিত হইয়াছিল তাহার রক্ষণাবেক্ষণের যৌথ দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তিয়াছিল জার্মানী যদি সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিম ইউরোপে গণ্ডগোল বাধাইতে উদ্যত হইত তবে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের পক্ষে তাহাতে সম্মিলিত ভাবে বাধা দেওয়া কর্তব্য ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে ফ্রান্সের অতিরিক্ত উৎসাহ থাকিলেও ইংলণ্ডের মোটেই উৎসাহ ছিল না। ফ্রান্স ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া এবং ইংলণ্ড হইতে যথোচিত সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি না পাইয়া আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সহিত মৈত্রীসূত্রে (Little Entente) আবদ্ধ হইল। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির (বেলজিয়ম,

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

পোল্যাণ্ড, জেকো-শ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া) সহিত মৈত্রী প্রকৃত পক্ষে ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি করিল না। হিটলারের আক্রমণ হইতে জেকো-শ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর না হইয়া ফ্রান্স তোষণনীতি (policy of appeasement) অবলম্বন করিয়াছিল। জার্মানীর শক্তিহ্রাস সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সহযোগিতা করিলে হিটলারের অভ্যুদয়ের পথে বাধা পড়িত।

ফ্রান্সের নীতি

ফ্রান্স জার্মানীর প্রতিবেশী, একাধিকবার জার্মানীর সামরিক বল ফ্রান্সকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে (১৮৭০, ১৯১৪-১৮)। সুতরাং ভার্সাইর সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানী সামরিক বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে ফ্রান্সের পক্ষে প্রকৃতই বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত ইংলণ্ডের পক্ষে প্রত্যক্ষ জার্মান আক্রমণের ভয় ছিল না। ইংলণ্ডের নৌবল তখনও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব হারায় নাই। সুতরাং জার্মানী সম্বন্ধে ফ্রান্সের যে ভয় ছিল ইংলণ্ডের তাহা ছিল না। ইহা ছাড়া বণিকের জাতি ("a nation of shop-keepers") ইংরেজ জার্মানীর সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে উৎসুক ছিল। ভার্সাইর সন্ধি জার্মানীর অর্থনৈতিক শক্তি হ্রাস করিয়াছিল; ক্ষতিপূরণ (Reparations) দিবার দায়িত্ব জার্মানীর ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া দিয়াছিল। এই সকল বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানী যাহাতে আর্থিক উন্নতি লাভ করে সেদিকে ইংলণ্ডের দৃষ্টি ছিল। জার্মানী সম্বন্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের নীতি এই সকল কারণে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। ফ্রান্স জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিত, ইংলণ্ড চাহিত সমৃদ্ধিশালী জার্মানী। স্বভাবতঃই জার্মান জাতি—বিশেষতঃ হিটলার—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এই পার্থক্যের সুযোগ লইয়াছিল।

ইংলণ্ডের নীতি

ইংলণ্ডের পক্ষে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা না থাকায় ইংলণ্ড অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাই হিটলারের প্রাথমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব ইংলণ্ড বুঝিতে পারে নাই। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতালাভের পর কয়েক মাসের মধ্যে হিটলার জার্মানীকে জাতিসঙ্ঘ হইতে সরাইয়া লইলেন। জাতিসঙ্ঘের Covenant আন্তর্জাতিক আইন (International Law) মানিয়া কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বলপ্রয়োগে উদ্দেশ্যসিদ্ধিই তাহার নীতি ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভার্সাই সন্ধির সর্ত লঙ্ঘন করিয়া জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক

আবদ্ধ হয়। এই সকল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ না করিয়া এবং রাষ্ট্রপতি উইলসনের উদার নীতি অগ্রাহ্য করিয়া ক্লেমেসোঁ এবং লয়েড জর্জ জার্মানীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে জার্মান জাতির মনে অসন্তোষের আগুন জলিয়া উঠিল, সন্ধির অন্যায় সর্তগুলি বাতিল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া জার্মানী সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতি ইহারই পরিণতি। তাঁহার নেতৃত্বে আস্থাবান হইয়া জার্মান জাতি তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। এই প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ছলে বলে কৌশলে জার্মানীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

হিটলারের নীতি

ভার্সাইর সন্ধি জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করিয়াছিল তাহা তিনি নিজে ভুলিতে পারেন নাই, জার্মান জাতিকেও ভুলিতে দেন নাই। সেই অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং জার্মানীকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। এই সঙ্কল্প সাধনের জন্য তিনি জার্মানীকে অর্থনীতিক্ষেত্রে এবং সামরিক ক্ষেত্রে অসামান্য বলশালী করিয়া তুলিলেন। তারপর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতির প্রয়োগ আরম্ভ হইল। ভার্সাই সন্ধির সর্ত বাতিল করা সম্বন্ধে জার্মানীর প্রচেষ্টা হিটলারের ক্ষমতা অধিকারের পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্যের কারণ ফরাসী এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে পার্থক্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এবং প্যারিস শান্তিবৈঠকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিল। জাতিসঙ্ঘের প্রথম যুগে সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তাহাদের অবিসংবাদী নেতৃত্ব ছিল। সুতরাং ভার্সাই সন্ধির উপর ভিত্তি করিয়া যে পশ্চিম ইউরোপ গঠিত হইয়াছিল তাহার রক্ষণাবেক্ষণের যৌথ দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তিয়াছিল জার্মানী যদি সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিম ইউরোপে গণ্ডগোল বাধাইতে উদ্যত হইত তবে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের পক্ষে তাহাতে সম্মিলিত ভাবে বাধা দেওয়া কর্তব্য ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে ফ্রান্সের অতিরিক্ত উৎসাহ থাকিলেও ইংলণ্ডের মোটেই উৎসাহ ছিল না। ফ্রান্স ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া এবং ইংলণ্ড হইতে যথোচিত সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি না পাইয়া আত্মরক্ষার জন্য ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সহিত মৈত্রীসূত্রে (Little Entente) আবদ্ধ হইল। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির (বেলজিয়ম,

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

ফ্রান্সের নীতি

পোল্যাণ্ড, জেকো-শ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া) সহিত মৈত্রী প্রকৃত পক্ষে ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি করিল না। হিটলারের আক্রমণ হইতে জেকো-শ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর না হইয়া ফ্রান্স তোষণনীতি (policy of appeasement) অবলম্বন করিয়াছিল। জার্মানীর শক্তিহ্রাস সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সহযোগিতা করিলে হিটলারের অভ্যুদয়ের পথে বাধা পড়িত।

ইংলণ্ডের নীতি

ফ্রান্স জার্মানীর প্রতিবেশী, একাধিকবার জার্মানীর সামরিক বল ফ্রান্সকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে (১৮৭০, ১৯১৪-১৮)। সুতরাং ভার্সাইর সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানী সামরিক বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে ফ্রান্সের পক্ষে প্রকৃতই বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত ইংলণ্ডের পক্ষে প্রত্যক্ষ জার্মান আক্রমণের ভয় ছিল না। ইংলণ্ডের নৌবল তখনও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব হারায় নাই। সুতরাং জার্মানী সম্বন্ধে ফ্রান্সের যে ভয় ছিল ইংলণ্ডের তাহা ছিল না। ইহা ছাড়া বণিকের জাতি ("a nation of shop-keepers") ইংরেজ জার্মানীর সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে উৎসুক ছিল। ভার্সাইর সন্ধি জার্মানীর অর্থনৈতিক শক্তি হ্রাস করিয়াছিল; ক্ষতিপূরণ (Reparations) দিবার দায়িত্ব জার্মানীর ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া দিয়াছিল। এই সকল বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানী যাহাতে আর্থিক উন্নতি লাভ করে সেদিকে ইংলণ্ডের দৃষ্টি ছিল। জার্মানী সম্বন্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের নীতি এই সকল কারণে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। ফ্রান্স জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিত, ইংলণ্ড চাহিত সমৃদ্ধিশালী জার্মানী। স্বভাবতঃই জার্মান জাতি—বিশেষতঃ হিটলার—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এই পার্থক্যের সুযোগ লইয়াছিল।

ইংলণ্ডের পক্ষে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা না থাকায় ইংলণ্ড অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাই হিটলারের প্রাথমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব ইংলণ্ড বুঝিতে পারে নাই। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতালাভের পর কয়েক মাসের মধ্যে হিটলার জার্মানীকে জাতিসঙ্ঘ হইতে সরাইয়া লইলেন। জাতিসঙ্ঘের Covenant আন্তর্জাতিক আইন (International Law) মানিয়া কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বলপ্রয়োগে উদ্দেশ্যসিদ্ধিই তাহার নীতি ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভার্সাই সন্ধির সর্ত লঙ্ঘন করিয়া জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক

সামরিক প্রথা (Conscription) প্রবর্তন করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকার্নো সন্ধি (Locarno Pact) বাতিল করিয়া দিলেন এবং ফ্রান্সকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য রাইন নদীর বাম তীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও জাপান সাম্যবাদবিরোধী (অর্থাৎ রাশিয়া-বিরোধী) চুক্তি (Anti-Commintern Pact) করিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনীর কর্তৃত্বাধীন ইটালী জাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিল এবং জার্মানী-জাপানের সাম্যবাদ-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করিল। এইরূপে 'বার্লিন-টোকিও চক্র' (Berlin-Tokyo Axis) প্রসারিত হইয়া 'রোম-বার্লিন-টোকিও চক্রে' (Rome-Berlin-Tokyo Axis) পরিণত হইল। 'সুদূর প্রাচ্যে' জাপান এবং ইউরোপে ইটালী হিটলারের সহযোগী হইয়া জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি করিল।

হিটলারের কার্যাবলী

ভার্সাই সন্ধি দ্বারা পশ্চিম ইউরোপে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা হিটলারের কার্যাবলীর ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছলে বলে কৌশলে অস্ট্রিয়া এবং জেকো-শ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়া (১৯৩৮-৩৯) তিনি ভার্সাই সন্ধিতে চরম আঘাত হানিলেন। বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত ইউরোপ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড নিজেদের সামরিক দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। তাহারা হিটলারের বিরোধিতা না করিয়া পরোক্ষভাবে তাঁহার সহায়তা করিল। এই নীতি ইতিহাসে তোষণ নীতি (policy of appeasement) নামে পরিচিত। এই নীতির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন (Neville Chamberlain)। তিনি মিউনিক চুক্তি (Munich Pact) দ্বারা হিটলার কর্তৃক জেকো-শ্লোভাকিয়ার অংশ গ্রাস মানিয়া লইলেন। রাশিয়াও হিটলারকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল না, বরঞ্চ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে (Non-Aggression Pact) আবদ্ধ হইল। জাতিসঙ্ঘ পূর্বেই প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আবিসিনিয়া গ্রাসে ইটালীকে বাধা দিতে না পারিয়া (১৯৩৫-৩৬) জাতিসঙ্ঘ মর্যাদা ও প্রভাব হারাইয়াছিল।

তোষণনীতি

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার দেখিলেন, ইটালী ও জাপান তাঁহার মিত্র, রাশিয়া নিরপেক্ষ, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাঁহাকে তোষণ করিতে উন্মুখ, জাতিসঙ্ঘ মৃতপ্রায়। তাঁহার আক্রমণাত্মক নীতি কোন দিক হইতে বাধা পাইবে, এমন সম্ভাবনা দেখা

গেল না। বলপ্রয়োগে রাজ্যবিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত ড্যানজিগ (Danzig) শহর এবং পোল্যাণ্ডের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ইংলণ্ড এতদিনে জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধির কুফল বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণা করিলেন যে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাকে সাহায্য করিবে। হিটলার এই সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

তোষণ নীতি পরিত্যাগ

যুদ্ধারম্ভের সহিত ইটালীর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও ইটালী পরে (জুন, ১৯৪০) যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে ঘটনাবলীর পরিণতি তাহার সহিত মুসোলিনীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। জাতিসঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি আবিসিনিয়া অধিকার করেন। এই ঘটনা জাতিসঙ্ঘের মর্যাদা ও প্রভাব বিনষ্ট করিয়াছিল এবং বলপ্রয়োগে রাজ্যবিস্তারের পথ দেখাইয়াছিল। জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া এবং জার্মানী-জাপানের সাম্যবাদ-বিরোধী চুক্তিতে যোগ দিয়া ফ্যাসিবাদী ইটালী শান্তিমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মুসোলিনীর দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ইটালীর দায়িত্ব

হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতির প্রাথমিক সাফল্যের জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পরোক্ষ দায়িত্ব ছিল। তাহারা সময় থাকিতে জার্মানী ও ইটালীকে বাধা দেয় নাই। জাতিসঙ্ঘের প্রভাব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে তাহাদের যাহা করা উচিত ছিল তাহা তাহারা করে নাই। এই বিষয়ে রাশিয়ার দায়িত্বও উল্লেখযোগ্য। স্ট্যালিন হিটলারকে বাধা না দিয়া বরং যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করেন। ইহাতে হিটলার জার্মানীর পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া ফ্রান্সের ধ্বংস সাধনে সর্বশক্তি নিয়োগে সমর্থ হইলেন।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার দায়িত্ব

জার্মানী ও ইটালীর মিত্র জাপান যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পরে (ডিসেম্বর, ১৯৪১) রাজ্যবিস্তারের লোভে যুদ্ধে যোগদান করে। ইহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হয় এবং যে যুদ্ধ এতদিন ইউরোপে

এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা 'সুদূর প্রাচ্যে', প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে।

জাপানের দায়িত্ব

তখন ইউরোপীয় সংগ্রাম প্রকৃত বিশ্বসংগ্রামে পরিণত হইল। ইটালীর পূর্বেই জাপান জাতিসঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করিয়া বলপ্রয়োগে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়াছিল এবং জাতিসঙ্ঘের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল। জার্মানীর সহিত সাম্যবাদ-বিরোধী চুক্তিও জাপান ইটালীর পূর্বেই করিয়াছিল। ফ্যাসিবাদী জার্মানী ও ইটালীর ন্যায় জাপানেরও রণস্পৃহা প্রবল ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জাপানের দায়িত্ব ইটালীর চেয়ে বেশী, কারণ জাপান যুদ্ধে যোগদান না করিলে ধ্বংসের আগুন পূর্ব এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িত না।

যুদ্ধারম্ভ : ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইহার অবসান ঘটে। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া—এই তিনটি মহাদেশ রণাঙ্গনে পরিণত হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মহাসংগ্রামে জড়িত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল যাহা মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ইহাদের মধ্যে আণবিক বোমা (atom bomb) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ (১৯৪০) : যুদ্ধারম্ভের পর কয়েক মাসের মধ্যেই জার্মান বাহিনী পূর্বে পোল্যাণ্ড এবং উত্তরে ও পশ্চিমে ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়ম, লুক্সেমবার্গ এবং হল্যাণ্ড অধিকার করিল (১৯৪০)। নরওয়েতে ব্রিটিশ বাহিনীর বিপর্যয় ঘটায় প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন

চার্চিল

পদত্যাগ করিলেন এবং উইনস্টোন চার্চিল (Winston Churchill) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত চার্চিল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধ পরিচালনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি অমর কীর্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি সংহত করিয়া জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন নাই, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া ঐক্যবদ্ধ সামরিক নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

হিটলারের জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মুসোলিনীর কর্তৃত্বাধীন ইটালী জার্মানীর মিত্ররূপে যুদ্ধে যোগদান করিল। বেলজিয়ম রক্ষার জন্য প্রেরিত একটি বৃহৎ ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী ডানকার্ক (Dunkirk) বন্দরে জার্মানদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াও অসীম সাহসে ব্রিটিশ নৌ-বলের সাহায্যে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিল। ইতিমধ্যে জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের এক বৃহৎ অংশ অধিকার

করিয়া প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করিল (জুন, ১৯৪০)। ফ্রান্সের শিল্পাঞ্চল সহ একটি বৃহৎ অংশ জার্মান বাহিনীর অধিকারে রহিল ; বাকী অংশে সেনাপতি পিতেনের (Petain) অধীনে এক নূতন সরকার স্থাপিত হইল। এই সরকারের রাজধানী হইল ভিচি (Vichy)। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের (Third Republic) অবসান হইল (জুলাই, ১৯৪০)। ভিচি সরকার কার্যতঃ জার্মানীর আধিপত্য মানিয়া লইল এবং এই সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কেবলমাত্র জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণই ফ্রান্সের এই শোচনীয় পতনের কারণ নহে। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও রাজনৈতিক কলহ ফ্রান্সকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। হিটলারের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াও ফ্রান্স যথাসময়ে আত্মরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে নাই।

"ব্রিটেনের যুদ্ধ" ("Battle of Britain") : ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের ফলে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার সমস্যা আরও কঠিন হইয়া পড়িল। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের বন্দরগুলি জার্মানীর হস্তগত হইয়াছিল। স্থলসৈন্য ও বিমান বাহিনীর দিক হইতে জার্মানীর শক্তি ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর শক্তি অটুট ছিল, তাই জার্মান বাহিনীর পক্ষে ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব হইল না। নেপোলিয়নের মত হিটলারও ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু নেপোলিয়নের যুগে বিমান বাহিনী ছিল না। নৌ-বাহিনীর পক্ষে বিমান বাহিনীর গতিরোধ করা কঠিন। হিটলার বিমান বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ দ্বারা ইংলণ্ডকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইংলণ্ড অসীম সাহসে ও ধৈর্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। ইংলণ্ডের উপর জার্মান বিমানের আক্রমণ বহুদিন চলিয়াছিল। ইহাতে ইংলণ্ডের প্রচুর ক্ষতি হইলেও হিটলারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই ; তিনি ইংরেজ জাতির মনোবল ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই, স্থলসৈন্যবাহিনী দ্বারা ইংলণ্ড আক্রমণ করাও জার্মানদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ (১৯৪১) : যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে (আগস্ট, ১৯৩৯) জার্মানী ও রাশিয়া অনাক্রমণ চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কোন পক্ষেরই এই চুক্তির সর্ত দীর্ঘকাল পালন করিবার ইচ্ছা ছিল না। সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ ছিল। তাহা ছাড়া জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে রাশিয়ার মত পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব জার্মান জাতির নিরাপত্তা

বিপন্ন করিতে পারিত। কিন্তু হিটলার প্রথমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, সুতরাং যুদ্ধের প্রথম দিকে পূর্ব সীমান্তে শান্তিরক্ষার প্রয়োজন ছিল। স্ট্যালিন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা রাশিয়ার শিল্পোন্নতি ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তাঁহার পক্ষেও কিছুকাল শান্তির প্রয়োজন ছিল।

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের এক বৎসর পর জার্মানী অকস্মাৎ রাশিয়া আক্রমণ করিল (জুন, ১৯৪১)। ইংলণ্ড রাশিয়াকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার সহিত সামরিক চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হইল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টও (Roosevelt) সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। হিটলারের আক্রমণের প্রতিক্রিয়া-রূপে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত সাম্যবাদী রাশিয়ার সহযোগিতা আরম্ভ হইল। রাজনীতিক্ষেত্রে এই বিরাট পরিবর্তন হিটলারের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। রাশিয়া ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি করিয়া জার্মানীকে বাধা দিতে লাগিল। শেষে ১৯৪২-১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধে জার্মান বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল।

'সুদূর প্রাচ্যে' যুদ্ধারম্ভ (১৯৪১) ঃ 'সুদূর প্রাচ্যে' জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে চীনের বিরুদ্ধে জাপানী নীতির স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১৯৩১-১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপান চীন আক্রমণ করিয়া মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনের অধিকাংশ অধিকার করে। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী, জাপান এবং ইটালীর সম্মিলনে 'রোম-বার্লিন-টোকিও চক্র' (Rome-Berlin-Tokyo Axis) গঠিত হয়। কেবলমাত্র চীনে নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন জাপানের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দেই জাপান স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে 'বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া' (Greater East Asia) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিল। ইউরোপে ফ্রান্স জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে (১৯৪০) জাপান ফরাসী ইন্দো-চীনে (French Indo-China) প্রভুত্ব স্থাপন করিল (১৯৪০-৪১)। জার্মানী ও ইটালী সন্ধি দ্বারা 'বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া'য় নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনে জাপানের 'নেতৃত্ব' স্বীকার করিল ("Germany and Italy recognised and respected the leadership of Japan in the establishment of a new order

in Greater East Asia.") এইরূপে জার্মানী ও ইটালীর সমর্থনে শক্তিমান হইয়া জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহারই ফল জাপানের বিশ্বযুদ্ধে যোগদান। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে রাশিয়ায় জার্মান বাহিনীর সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া জাপান পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত দেশগুলি গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল।

জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপান হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পার্ল হারবার (Pearl Harbour) নামক বন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের রণতরীর উপর বিমান আক্রমণ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। জার্মানী ও ইটালী জাপানের মিত্র রূপে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হইল।

জাপানের যুদ্ধে যোগদান

এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (Franklin Roosevelt)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে নিরপেক্ষতা (neutrality) অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু রুজভেল্ট নানা প্রকারে ইংলণ্ডের সহায়তা করিয়াছিলেন। জাপানের আকস্মিক আঘাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইল। রুজভেল্ট কয়েকবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে প্রথম দিকে জাপান অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের অধীন দ্বীপগুলি (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সহ) জাপানের হস্তগত হইল। হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা-জাভা প্রভৃতি হল্যাণ্ডের অধীন দ্বীপ, ফরাসী ইন্দো-চীন,—এই বিরাট অঞ্চল কয়েক মাসের মধ্যে জাপানের অধিকারভুক্ত হইল। জাপান ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হইয়া আসাম আক্রমণের উপক্রম করিল (১৯৪২)।

যুদ্ধে জাপানের সাফল্য

আফ্রিকায় যুদ্ধঃ ইটালী যুদ্ধে যোগদান করিয়াই ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড অধিকার করিল। পরে মিশর ও সুয়েজ খালের উপর ইটালী ও জার্মানীর দৃষ্টি পড়িল (১৯৪০)। ফলে আফ্রিকায় 'অক্ষ'শক্তিদ্বয়ের (Axis

১৬

Powers) সহিত ইংলণ্ডের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রথমে জার্মানী ও ইটালী জয়লাভ করিলেও শেষদিকে ইংরেজ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধঃ ইটালী দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করায় ঐ অঞ্চলও রণাঙ্গনে পরিণত হইল। ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিল। ইংলণ্ড গ্রীসকে সাহায্য করিল। প্রথমে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া, পরে গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত হইল (১৯৪১)।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধঃ ইরাক, সিরিয়া এবং ইরাণে জার্মানীর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইংলণ্ডের সতর্কতায় ব্যর্থ হইয়াছিল। সুয়েজ অঞ্চলে ও মধ্যপ্রাচ্যে জার্মান-প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইত।

জার্মানীর পরাজয়ঃ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জার্মানীর পরাজয় আরম্ভ হইল। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত বাহিনী প্রথমে উত্তর আফ্রিকা, পরে সিসিলী ও ইটালী জয় করিল। ইটালীর রাজা মুসোলিনীকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিলেন (জুলাই, ১৯৪৪)। মুসোলিনী পলায়ন করিয়া যুদ্ধ চালাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরে তিনি ধৃত হইয়া উত্তেজিত জনতার হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বাহিনী রাশিয়া হইতে বিতাড়িত হইল। ক্রমে বাল্টিক তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলি এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি হইতে রাশিয়া জার্মানীর সামরিক প্রভাবের উচ্ছেদ করিল। এদিকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে ফ্রান্স আক্রমণ করিল। জার্মান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বার্লিন অধিকৃত হইল। হিটলার আত্মহত্যা করিলেন।

জাপানের পরাজয়ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের পরাজয় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার আণবিক বোমার আঘাতে হিরোশিমা শহর বিধ্বস্ত হইল। রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া জাপান আত্মসমর্পণ করিল (আগস্ট, ১৯৪৫)।

জার্মানী, ইটালী ও জাপানের পরাজয়ের কারণঃ নানা কারণে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের প্রবল সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। বিশাল

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া যে মিত্রতাবদ্ধ হইয়া একই সমরনীতি অনুসরণ করিবে তাহা জার্মানী, ইটালী ও জাপান কল্পনা করে নাই। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের (political ideology) পার্থক্য সত্ত্বেও গণতন্ত্রবাদী ইংলণ্ড ও আমেরিকা সাম্যবাদী রাশিয়ার সহিত অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই তিন দেশের নেতৃগণ (চার্চিল, রুজভেল্ট এবং স্ট্যালিন) সমরনীতি পরিচালনায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে এবং রাশিয়ায় জনসাধারণ যে মনোবলের পরিচয় দিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব। হিটলারের অভাবনীয় সামরিক সাফল্য এবং বর্বর ধ্বংসনীতি তাহাদের মনোবল নষ্ট করিতে পারে নাই। বিজয়ী জাপানের অত্যাচার পূর্ব এশিয়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিটলারের গণতন্ত্রবিরোধী এবং মানবতাবিরোধী নীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁহার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করিয়াছিল। চতুর্থতঃ, মারণাস্ত্র আবিষ্কারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। আণবিক বোমা প্রয়োগে জাপানে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)

জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক ধ্বংসলীলা আবার মানুষের শান্তি কামনা প্রবল করিয়া তুলিল। জাতিসঙ্ঘ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী আর একটি বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই কার্যে অগ্রণী হইল। যুদ্ধের প্রথম দিকে—১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট (Roosevelt) এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক মহসাগরের উপকূলে একটি যুদ্ধ জাহাজে বসিয়া শান্তির সনদ (Atlantic Charter) রচনা করিলেন। এই সনদে ঘোষণা করা হইল যে অত্যাচারী নাৎসী শক্তির ধ্বংসের পর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইলে সকল জাতি নিরাপদে নিজ নিজ দেশে বাস করিতে পারিবে এবং ভয় ও অভাব হইতে মুক্ত থাকিবে।* এই ঘোষণাটিকে ভিত্তি করিয়া ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ২৬টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা (Declaration by United Nations) প্রচারিত হইল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ঘোষণাসমূহ

* "After the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace which will afford to all nations the means

ইহাতে তিনটি অক্ষশক্তির (Axis Powers : জার্মানী, ইটালী ও জাপান) বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করা হইল। অতঃপর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মস্কোতে চতুঃশক্তির (রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, চীন) ঘোষণা (Moscow Declaration) স্বাক্ষরিত হইল। এই ঘোষণায় নূতন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ; প্রত্যেকটি শান্তিপ্রিয় রাজ্য ইহার সভ্য হইতে পারিবে এবং ছোটবড় নির্বিশেষে সভ্যদের সাম্য ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইবে।* এই সকল ঘোষণাকে ভিত্তি করিয়া নানাবিধ আলাপ-আলোচনার (১৯৪৪-৪৫) পর ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' (United Nations) নামক বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই কার্যে নেতৃত্বভার গ্রহণ করে তিনটি রাষ্ট্র—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া।

একটি সনদে (Charter) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, গঠনপদ্ধতি ও কার্যপদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। উহা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো নগরে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর তারিখে সনদটি বলবৎ হয়। ঐ তারিখটিকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা দিবস বলিয়া গণ্য করা হয়।

সনদ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠাকালে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ইহার সভ্য হয় নাই। যে সকল রাষ্ট্র জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পরে সানফ্রানসিসকোতে সনদে স্বাক্ষর করিয়াছিল তাহারাই এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের মৌলিক সভ্য (Original Member) হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল ৫১। ভারতবর্ষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মৌলিক সভ্যদের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল রাষ্ট্র মৌলিক সভ্য নহে তাহারাও সভ্য হইতে পরে ; তবে তাহাদিগকে শান্তিপ্রিয় হইতে হইবে এবং সনদে উল্লিখিত কর্তব্যসমূহ

সভ্য

of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want".

*"......a general international organisation, based on the principle of the sovereign equality of all peace-loving states, and open to membership by all such states, large and small, for the maintenance of international peace and security".

পালনে ইচ্ছুক এবং সমর্থ হইতে হইবে। যে রাষ্ট্র বিশ্বমৈত্রী স্থাপনে বিশ্বাসী নহে তাহাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে রাখাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য হইয়াছে এবং ইহা পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে (১৯৬৩) ইহার সভ্য-সংখ্যা ১১৩। সাম্যবাদী সরকারের শাসনাধীন চীন (Communist China) অদ্যাপি সভ্যপদ লাভ করে নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যগুলি ইহার সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা শান্তিভঙ্গ ও অন্যায় আক্রমণে বাধা দিতে হইবে। কোন আন্তর্জাতিক কলহ বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং ন্যায়সঙ্গত ও আইন-সঙ্গত পদ্ধতিতে সেই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যুদ্ধ দ্বারা কলহের মীমাংসার চেষ্টা করা হইবে না—এই নীতি মানিয়া লইতে হইবে। সহজ কথায় বলিতে গেলে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা এবং অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত রাষ্ট্রকে দমন করা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজের রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে—ইহারই নাম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। আর প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার থাকিবে, অর্থাৎ বড় শক্তিশালী জাতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিবে না। এই দুইটি মূল নীতি মানিয়া লইলেই ছোট-বড় সকল জাতির মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হইতে পারে। যতদিন শক্তিশালী জাতির মনে দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছা থাকিবে, যতদিন দুর্বল জাতির মনে স্বাধীনতা হারাইবার আশঙ্কা থাকিবে, ততদিন জাতিতে জাতিতে মারামারি কাটাকাটি বন্ধ হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, কেবলমাত্র যুদ্ধ-নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সকলের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা পৃথিবীর আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকর প্রচেষ্টায় সমুদয় রাষ্ট্র নিয়োজিত থাকিবে। চতুর্থতঃ, যুদ্ধ নিবারণ, মৈত্রী স্থাপন ও কল্যাণ সাধন—এই তিনটি

মহান্ উদ্দেশ্য সকল জাতিকে অনুপ্রাণিত করিবে। তাহাদের সম্মিলিত কর্মের কেন্দ্র হইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।*

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল নীতি ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যপদ্ধতি কয়েকটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, ইহার প্রত্যেক সভ্যের মর্যাদা ও অধিকার সমান। সবল ও দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। যে মর্যাদা ও অধিকার সবলকে দেওয়া হয় তাহা হইতে দুর্বলকে বঞ্চিত করা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন সভ্যের সহিত অপর কোন রাষ্ট্রের বিরোধ উপস্থিত হয় তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যদি কোন সভ্য অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তবে অন্যান্য সভ্যগণকে সেই ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য বা অর্থ চায় তবে তাহা দিতে হইবে এবং কোন প্রকারে শাস্তিভাজন সভ্যকে সাহায্য করা চলিবে না। চতুর্থতঃ, যে সকল রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য নহে তাহাদিগকেও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য উহার নীতি ও নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। সাধারণতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি ও নিয়ম উহার সভ্যগণের প্রতিই প্রযোজ্য। কিন্তু উহার সভ্য নহে এমন কোন রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের

---

*"The Purposes of the United Nations are :

1. To maintain international peace and security, and to that end : to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace ;

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace ;

3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion ; and

4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends."

উদ্যোগ করে তবে তাহার প্রতিও ঐগুলি প্রয়োগ করা হইবে। পঞ্চমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরাণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম, তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে তাহার নিজের কর্তৃত্বাধীন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য পরিচালনার ভার প্রধানতঃ দুইটি পরিষদের উপর ন্যস্ত। প্রথমটির নাম সাধারণ পরিষদ (General Assembly), দ্বিতীয়টির নাম নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সকল রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদের সভ্য। প্রত্যেক রাষ্ট্র এই পরিষদে পাঁচ জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভোট মাত্র একটি। প্রতি বৎসর সাধারণতঃ গঠন
এই পরিষদের মাত্র একটি অধিবেশন বসে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত অধিবেশন ডাকিবার ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ উপস্থিত সভ্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়, কিন্তু কোন কোন, গুরুতর বিষয়ে (যেমন, নূতন সভ্যপদপ্রার্থীর যোগ্যতা বিচার) উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সভ্যদিগকে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) এবং অছি পরিষদের (Trusteeship Council) সকল সভ্যকে নির্বাচন করে। কিন্তু ইহা মুখ্যতঃ একটি আলোচনা-সভা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লিখিত সকল বিষয় সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা হইতে পারে। ঐসকল কার্য
বিষয় সম্বন্ধে ইহা যে কোন সভ্যকে নির্দেশ দিতে এবং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ পরিষদের নির্দেশ ও সুপারিশ বাধ্যতামূলক নহে, অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদ উহা মানিতে বাধ্য নহে। তবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের উপর ইহার অনেকখানি কর্তৃত্ব আছে। রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করাই সাধারণ পরিষদের প্রধান কাজ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ঃ নিরাপত্তা পরিষদই প্রকৃত পক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে মাত্র

১১টি রাষ্ট্র এই পরিষদের সভ্য। ইহার মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সভ্য—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন চীনে 'কুয়োমিন্টাঙ্' দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং ঐ সরকারই তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের আসন অধিকার করিয়াছিল। পরে কমিউনিস্ট দল 'কুয়োমিন্টাঙ্' সরকারকে বিতাড়িত করিয়া চীনে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এখন 'কুয়োমিন্টাঙ্' সরকারের কর্তৃত্ব ফরমোসা দ্বীপে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এখনও এই সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের আসন অধিকার করিয়া আছে, ঐ আসনে কমিউনিস্ট সরকারের অধিকার এখনও স্বীকৃত হয় নাই।

গঠন

বাকী ছয়টি অস্থায়ী সভ্য দুই বৎসরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ভারত একবার নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিল। নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সভ্য মাত্র একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। পাঁচটি স্থায়ী সভ্য একমত না হইলে কোন গুরুতর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না (veto system)।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা নিরাপত্তা পরিষদের

কার্য

প্রধান কার্য। ইহা সাধারণ পরিষদের ন্যায় আলোচনা-সভা মাত্র নহে ; ইহার যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা আছে। যে কোন বিরোধ ("dispute") বা রাজনৈতিক অবস্থা ("situation") আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতে পারে তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ কোন সিদ্ধান্ত ("decision") গ্রহণ করিলে সকল সভ্যই উহা মানিয়া লইতে এবং তদনুসারে কাজ করিতে ("to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter") বাধ্য। কোন রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিলে পরিষদ তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (sanctions) প্রয়োগ করিতে পারে। প্রথমে অর্থনৈতিক অবরোধ, কূটনৈতিক সম্বন্ধচ্ছেদ প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। এইজাতীয় ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হইলে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। অবাধ্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্থল যুদ্ধ, নৌযুদ্ধ বা বায়ু যুদ্ধ করা যাইতে পারে ("take such action by air, sea or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace or security")। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব

সামরিক বল নাই। কিন্তু সনদের সর্ত অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ করিলে সভ্যরাষ্ট্রগুলি আবশ্যকীয় সামরিক বল (সৈন্য প্রভৃতি) জোগাইবে এবং সর্বপ্রকার সামরিক সহায়তা (যেমন, সৈন্যদলের যাতায়াতের পথ) দিবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘের Covenant অপেক্ষা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে অনেক বেশী কঠোর নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা তাহা অনেকাংশে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যদক্ষতার উপর নির্ভর করিবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদঃ পৃথিবী হইতে যুদ্ধের বিভীষিকা দূর করিতে হইলে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলেই চলে না। অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থ নৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৮টি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সভ্য। বিভিন্ন জাতির অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে এই পরিষদ আলোচনা করিতে পারে। ঐ সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য এবং মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ("human rights and fundamental freedoms") রক্ষার জন্য এই পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই সকল সুপারিশ গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদে কোন বিষয়ের আলোচনা হইলে তাহা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরূপে পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর পথ প্রশস্ত হয়।

এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিশিষ্ট সংস্থা আছে। যেমন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation—সংক্ষেপে UNESCO); খাদ্য ও কৃষি সংক্রান্ত সংস্থা (Food and Agriculture Organisation, সংক্ষেপে FAO); আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা (International Monetary Fund), ইত্যাদি। এই সকল সংস্থা মানব ৺কের বহু গঠনমূলক কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অ৷ পরিষদঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ

অনুসারে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিকে অছি পরিষদের (Trusteeship Council) কর্তৃত্বাধীনে রাখা হইয়াছে। এই সকল জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন অছি পরিষদের প্রধান লক্ষ্য। আর একটি লক্ষ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। পূর্বে অনুন্নত জাতিসমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তারের লোভে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কলহে লিপ্ত হইত। অছি পরিষদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঐভাবে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কয়েকজন সভ্য দ্বারা অছি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ সাধারণ পরিষদের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অধীন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ঃ আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) একটি স্থায়ী আদালত এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান অঙ্গ। সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ এই বিচারালয়ের বিচারকদিগকে নির্বাচন করে। বিচারকেরা খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ব্যক্তি হইবেন এবং সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক আইন (International Law) সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিবে। আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন, কোন সন্ধির সর্তের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ, আন্তর্জাতিক আইন বা রীতি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ—সাধারণতঃ এই সকল বিষয় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের জন্য দাখিল করা হয়। কোন নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে এখানে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে না, কেবলমাত্র রাষ্ট্রই এখানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে। সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে এই বিচারালয় আইন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে পরামর্শ (advisory opinion) দিতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরখানাঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনের জন্য আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক শহরে একটি বিরাট দপ্তরখানা (Secretariat) আছে। একজন প্রধান কর্মসচিব (Secretary-General) ইহার পরিচালক। তিনি সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্যগণের প্রদত্ত অর্থে দপ্তরখানার ব্যয় নির্বাহ হয়। ভারতকে এজন্য প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ দিতে হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য (১৯৪৫-৪৯)ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি ছোটখাট আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করিয়াছিল। যেমন,—ইরাণ এবং রাশিয়ার বিরোধ (১৯৪৭), বলকান অঞ্চলে নানাবিধ বিরোধ, আফ্রিকায় ইটালীর উপনিবেশগুলির (লিবিয়া, ইরিট্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড) সমস্যা, ইত্যাদি। হল্যাণ্ড কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতি নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে ঘটিয়াছিল। কিন্তু কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ নিরাপত্তা পরিষদ মিটাইয়া দিতে পারে নাই।

যুদ্ধোত্তর যুগে রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (cold war) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর বৃহত্তম দুইটি শক্তি পরস্পরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিলে তাহারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কার্যে সহযোগিতা করিতে পারে না। রাশিয়া বারবার Veto প্রয়োগ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। রাশিয়া এবং আমেরিকার সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হইয়াছিল; সেই সহযোগিতা বিনষ্ট হইলে এই প্রতিষ্ঠান সনদের সর্ত অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

এশিয়ায় জাতীয়তাবাদ

১। নব্য তুর্কী

"নব্য তুর্কী" বিপ্লব : পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে "নব্য তুর্কী" দল বিপ্লব (Young Turk Revolution) দ্বারা সুলতানের স্বৈরাচারী শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। এই দলের নেতা এনভার বে (Enver Bey) "মিলন এবং প্রগতি সমিতি" (Committee of Union and Progress) নামক একটি বিপ্লবী সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি কর্তৃক বিপ্লব পরিচালিত হয় এবং ইহার চেষ্টায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অত্যাচারী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সিংহাসনচ্যুত হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যতঃ তুর্কী সাম্রাজ্যের শাসনভার এই সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। সৈন্যদলের সমর্থনে সমিতি ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল। এনভার বে প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীরা সমিতির নায়ক ছিলেন।

তুর্কী সাম্রাজ্যকে তুর্কী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠন করা "নব্য তুর্কী" দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যে তুর্কীরা ছিল সংখ্যালঘু জাতি; এশিয়ায় আরবেরা এবং ইউরোপে খ্রীষ্টানেরা শাসক সম্প্রদায় হইতে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল। সুতরাং "নব্য তুর্কী" দল যখন সাম্রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির এবং সংস্কৃতির "তুর্কীকরণ" (Turkification) আরম্ভ করিল তখন আরব এবং খ্রীষ্টান প্রজারা তাহাদের বিরোধিতা করিতে লাগিল। তুর্কী ভাষা সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা হইল। শিক্ষাক্ষেত্রে "তুর্কীকরণ" নীতি প্রয়োগ করা হইল। ফলে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ঐক্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে সাম্রাজ্যে নানা জাতি, নানা ধর্ম ও নানা ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়াছে সেখানে গোঁড়া জাতীয়তাবাদী নীতি সফল হইতে পারে না—এই সহজ কথাটি "নব্য তুর্কী" দল বুঝিতে পারে নাই।

"তুর্কীকরণ"

"নব্য তুর্কী" বিপ্লবের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তুর্কীর বারংবার পরাজয় ঘটিল। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী যুদ্ধ দ্বারা উত্তর আফ্রিকার দুইটি প্রদেশ—ত্রিপলি (Tripoli) এবং সাইরেনাইকা (Cyrenaica) কাড়িয়া

লইল। ইহার অব্যবহিত পরেই (১৯১২-১৩) দুইটি বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হইল। কন্‌স্ট্যান্টিনোপল শহর এবং তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ড ছাড়া ইউরোপের আর কোন অংশ তুর্কীর শাসনাধীন রহিল না। এই বিপর্যয় সত্ত্বেও তুর্কী জার্মানীর অনুগত মিত্ররূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিল। মিত্রশক্তির সম্পূর্ণ জয় হইল, পশ্চিম এশিয়ায় তুর্কীর শাসনাধীন দেশগুলি মিত্রশক্তির সৈন্যদল অধিকার করিল।

পররাষ্ট্রনীতি

কামাল পাশাঃ এই বিপর্যয়ের পর "নব্য তুর্কী" দলের নেতৃগণ শাসনকার্যের দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া কন্‌স্ট্যান্টিনোপল হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কামাল পাশা নূতন জাতীয়তাবাদী দল (Nationalist Party) গঠন করিয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত তুর্কীকে নূতন রূপ দানের ভার গ্রহণ করিলেন। তুর্কীর ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হইল।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কামালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল মুস্তাফা। তিনি যখন কনস্ট্যান্টিনোপলে সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার এক অধ্যাপক তাঁহাকে "কামাল" (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) আখ্যা দেন। তিনি সুলতানের অধীনে সামরিক কর্মচারীরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। যৌবনেই তিনি ফরাসী সাহিত্য পাঠ করিয়া বৈপ্লবিক ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি সুলতানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সুদূর সিরিয়ার অন্তর্গত দামস্কাসে বদলী করা হয়। সেখানে তিনি 'বতন' (পিতৃভূমি) নামে এক বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করেন।

প্রথম জীবন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের 'নব্য তুর্কী' বিপ্লবে কামাল একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কিছুকাল ফ্রান্সে অবস্থান করিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ইটালীয় যুদ্ধে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কীর পরাজয়ের পর তুর্কীর অস্তিত্ব বিপন্ন দেখিয়া কামাল বিপর্যস্ত জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে নবগঠিত জাতীয়তাবাদী দল পশ্চিম এশিয়ায় অ্যানাটোলিয়ার (Anatolia) অন্তর্গত অ্যাঙ্গোরা (Angora) শহরে এক অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) গঠন করিল (১৯২০)। কামাল এই সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সেনানায়ক হইলেন।

বিপ্লবের সূত্রপাত

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন সংবিধান (Law of Fundamental Organization) রচিত হইল। এই সংবিধান অনুসারে তুর্কীতে গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইল।

কনস্ট্যান্টিনোপলে তখনও একজন সুলতান ছিলেন, কিন্তু বিজয়ী ইংরেজ বাহিনীর চাপে তাঁহার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি বাধ্য হইয়া সেভ্রেসের সন্ধিপত্রে (Treaty of Sevres) স্বাক্ষর করিলেন (১৯২০)। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে ইউরোপে থ্রেস (Thrace) এবং কনস্ট্যান্টিনোপল তুর্কীর হস্তচ্যুত হইত এবং এশিয়ায় সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপোটেমিয়া (ইরাক), আর্মেনিয়া, স্মার্না ও কুর্দীস্তান তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইত। নিরুপায় সুলতান এই অমর্যাদাকর সর্তগুলি মানিয়া লইলেও কামালের অধীন জাতীয়তাবাদী সরকার এগুলি মানিয়া লইল না।

সেভ্রেসের সন্ধি

সেভ্রেসের সন্ধিতে গ্রীসের স্বার্থ ছিল। তুর্কীর হস্তচ্যুত থ্রেসের পূর্বাংশ এবং স্মার্না গ্রীসের অধীন হইত, পরে কনস্ট্যান্টিনোপলও গ্রীসের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং তুর্কীর জাতীয়তাবাদী সরকার এই সন্ধি মানিয়া লইতে অস্বীকার করায় গ্রীসের সহিত ঐ সরকারের যুদ্ধ বাধিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমর্থনে শক্তিমান হইয়াও গ্রীস এই যুদ্ধে পরাজিত হইল। তুর্কী জাতীয়তাবাদের এই সামরিক বিজয়ের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবেই কামালের প্রাপ্য।

গ্রীসের সহিত যুদ্ধ

গ্রীসের পরাজয়ের পর সেভ্রেসের সন্ধি পরিত্যক্ত হইল এবং জাতীয়তাবাদী সরকারের সহিত লুসানে নূতন সন্ধিপত্র (Treaty of Lausanne) স্বাক্ষরিত হইল (১৯২৩)। কনস্ট্যান্টিনোপল, থ্রেস, আর্মেনিয়া, স্মার্না ও কুর্দীস্তান তুর্কীর অধীনে রহিল ; সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মেসোপোটেমিয়া তুর্কী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইউরোপ হইতে তুর্কীকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তুর্কী জাতির আদি বাসভূমি (Fatherland) অ্যানাটোলিয়ায় জাতীয়তাবাদী সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইল। তুর্কীতে যথার্থ জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথ পরিষ্কৃত হইল।

কামাল চারিবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনিই তুর্কীর প্রকৃত শাসক ছিলেন। সাধারণভাবে তাঁহাকে স্বৈরাচারী শাসক (dictator) বলা হয়, কিন্তু তিনি কখনও গণতন্ত্রের

কাঠামো নষ্ট করেন নাই এবং দেশের মঙ্গল সাধন ব্যতীত তাঁহার শাসননীতির অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। তিনি তুর্কীর মধ্যযুগীয় শাসন-পদ্ধতি ও সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া আধুনিক ধরণে নূতন রাষ্ট্র গঠন করিলেন। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছয়টি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল: (১) রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণতন্ত্র থাকিবে। (২) তুর্কীর প্রত্যেক নাগরিক জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে। (৩) শাসন-ক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার রূপে গণ্য হইবে। (৪) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য শিল্পের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকিবে। (৫) রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ থাকিবে না। (৬) রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতির জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন আবশ্যক। মুস্তাফা কামাল দৃঢ়ভাবে এই সকল নীতি কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

কামালের ছয়টি মূল নীতি

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নব্য তুর্কীর নূতন সংবিধান (Constitution) বিধিবদ্ধ হয়। প্রতি চারি বৎসর অন্তর প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইনসভা গঠিত হইত। আইনসভা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিত। খলিফার পদ (Caliphate) ইতিপূর্বেই বাতিল করা হইয়াছিল। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের (People's Party) নেতা রূপে কামাল যে নীতি নির্দেশ করিতেন আইনসভা তাহাই গ্রহণ করিত। শাসনযন্ত্রও তাঁহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইত।

শাসন-ব্যবস্থা

তুর্কীর নব রূপায়ণে কামাল কেবলমাত্র রাষ্ট্রের কাঠামোতে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন নাই। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব হ্রাস করিয়া তিনি তুর্কীকে পাশ্চাত্য দেশগুলির মত প্রগতিশীল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ধর্মের জন্য সরকারী অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা রদ করা হইল। শিক্ষাকে ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইল। ইসলাম ধর্মের অনুশাসনই ছিল আইনের ভিত্তি। সেই প্রাচীন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করা হইল। বহুবিবাহ প্রথা রহিত করা হইল। বিবাহকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান রূপে গণ্য না করিয়া আইনানুমোদিত (civil) অনুষ্ঠান রূপে গণ্য করা হইল। আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে রোম্যান বর্ণমালায় তুর্ক ভাষা লেখার ব্যবস্থা হইল। শুক্রবারের

বিবিধ সংস্কার

পরিবর্তে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন রূপে নির্দিষ্ট হইল। স্ত্রীলোকেরা পর্দা ত্যাগ করিল এবং পুরুষদের মত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পাইল। 'ফেজ' টুপির পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য ধরণের টুপির (hat) ব্যবহার প্রচলিত হইল। মোটের উপর সরকারী নির্দেশে তুর্কীর অধিবাসীরা প্রাচীন পোষাক ও সামাজিক আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় পোষাক ও রীতি-নীতি গ্রহণ করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রাচীন তুর্কীর ধ্বংসস্তূপের উপরে নূতন তুর্কী গড়িয়া উঠিল।

শিক্ষাবিস্তার এবং অর্থনৈতিক উন্নতি জাতি গঠনের প্রকৃত ভিত্তি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীর জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর ছিল ; পরবর্তী ১৫ বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়াইল শতকরা ৬৫ জন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নূতন রেলপথ ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা হয়। কৃষির উন্নতিকল্পে জলসেচের সুব্যবস্থা করা হয়। দেশের কয়লা ও তৈল শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়। এই সকল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা সার্থক করিবার জন্য তুর্কী বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল হয় নাই, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিসর্জন দিয়া বিদেশীর নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

পররাষ্ট্রনীতি

কামালের পররাষ্ট্রনীতি শান্তিপূর্ণ ছিল। বিপ্লবের সূচনায় গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি 'গাজী' আখ্যা লাভ করেন, কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি আর যুদ্ধ করেন নাই। লুসানের সন্ধির পর আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি রাশিয়া এবং গ্রীসের সহিত মৈত্রী চুক্তি করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী জাতিসঙ্ঘের সভ্য হয়। কামাল কনস্ট্যান্টিনোপল বন্দরের প্রবেশ-পথ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন।

কৃতিত্ব

কামাল যে নব্যতুর্কীর স্রষ্টা এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি-সংগঠক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'আতাতুর্ক' (Ataturk : তুর্কীদের প্রধান) আখ্যায় তিনি তুর্কী জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি—সকল ক্ষেত্রেই তিনি তুর্কী জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করেন। পরাজয়ে বিপর্যস্ত তুর্কী জাতিকে তিনি নূতন সংহতি প্রদান করেন : অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস তুর্কী জাতিকে নব বলে বলীয়ান করেন। যে অস্পষ্ট জাতীয়তাবাদ 'নব্য তুর্কী' দলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহা কামালের নেতৃত্বে বাস্তব ও সার্থক রূপ গ্রহণ করে।

২। আরব জাতীয়তাবাদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরবর্তী কালে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আরবদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে দুইটি বাধা ছিল। প্রথমতঃ, পশ্চিম এশিয়ায় এবং আফ্রিকার যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরবেরা বাস করিত তাহা রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল না। পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলি তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সেগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। হেজাজ স্বাধীন হইল। সিরিয়া ফ্রান্সের এবং প্যালেস্টাইন ও ইরাক ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে আসিল। আফ্রিকায় মিশর এবং সুদান যুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীন ছিল। উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ফ্রান্স এবং ইটালীর প্রভুত্ব (Mandate) ছিল। সুতরাং আরব দেশগুলি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একটি বিরাট আরব রাষ্ট্র গঠিত হইবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, আরব দেশগুলিতে মুস্তাফা কামালের মত কোন শক্তিমান নেতার আবির্ভাব হয় নাই।

আরব জাতীয়তাবাদ : সাফল্যের পথে বাধা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল ঃ মধ্য প্রাচ্যের অন্তর্গত আরব-ভাষাভাষী বিরাট অঞ্চল দীর্ঘকাল তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই অঞ্চল তুর্কীর হস্তচ্যুত হইল। লুসানের সন্ধি (Treaty of Lausanne, ১৯২৩) দ্বারা তুর্কী লিবিয়া, মিশর, সুদান, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া (ইরাক) ও আরব উপদ্বীপের রাজ্যগুলির উপর সকল দাবি পরিত্যাগ করিল। কিন্তু বিজয়ী পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি এই সকল দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না ; নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহারা এই বিরাট অঞ্চল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের কর্তৃত্বাধীন রাখিতে ব্যগ্র হইল। এদিকে যুদ্ধের প্রভাবে আরব-ভাষাভাষী দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে তুর্কীর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিবে, এই আশায় মধ্য প্রাচ্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ড এই বিষয়ে আরবদিগকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determination) অধিকার পাইবে। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর বিজয়ী শক্তিবর্গ এই ঘোষণার মর্যাদা রক্ষা করিল না।

মিশরে এবং সুদানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই ব্রিটিশ-প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কীর নামমাত্র সার্বভৌমত্বের (suzerainty) বিলোপ ঘটিল। প্যালেস্টাইন, নব-গঠিত ট্রান্স-জর্ডন (Trans-Jordan), সিরিয়া এবং ইরাকে Mandate প্রথা প্রবর্তিত হইল—অর্থাৎ এই দেশগুলিকে আংশিক আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল, কিন্তু নানা বিষয়ে ইহারা কোন কোন ইউরোপীয় শক্তির (Mandatory Power) কর্তৃত্বাধীন রহিল। জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) Mandatory শক্তির কাজের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্স-জর্ডন রাজ্যে Mandate পাইল ইংলণ্ড। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ঘোষণা (Balfour Declaration) করিয়াছিল যে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় বাসভূমি ("a national home for the Jewish people") প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুদ্ধের পর এই ঘোষণা কার্যে পরিণত করা হইল, কিন্তু ইহাতে আরবেরা প্রবলভাবে বাধা দিল। সিরিয়ায় Mandate পাইল ফ্রান্স।

ইহুদীদের সমস্যা

যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে আরব-রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস (১৯১৯-৩৯) ঃ বিজয়ী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আরব জগৎকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইল বটে, কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের প্রতিরোধের ফলে এই ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন করিতে হইল। পরিবর্তনের ফলে আরবদের রাজনৈতিক অধিকার অনেকটা প্রসারিত হইল, তবে তাহারা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইল না।

ইরাকে জাতিসঙ্ঘ ইংলণ্ডকে Mandate প্রদান করিলেও আরবদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইংলণ্ড সন্ধিসূত্রে ইরাককে রক্ষণাধীন রাষ্ট্র (Protected State) রূপে স্বীকার করিয়া লইল হেজাজের রাজা হুসেনের পুত্র ফৈজল ইরাকের রাজা হইলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাহায্যে ইরাক জাতিসঙ্ঘের সভ্য হইল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যদল ইরাক পরিত্যাগ করিল, কিন্তু সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে ইরাকে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিল না।

ইরাক

জর্ডন নদীকে সীমারেখা রূপে ধরিয়া প্যালেস্টাইনকে দ্বিখণ্ডিত করা হইল। জর্ডনের পশ্চিম তীরবর্তী অংশের নাম রহিল প্যালেস্টাইন, অপর অংশের নাম

হইল ট্রান্স-জর্ডন। ট্রান্স জর্ডন একটি পৃথক রাজ্য হইল। ইহার অধিপতি হইলেন হেজাজের রাজা হুসেনের অপর পুত্র আবদুল্লা। তাঁহার উপাধি হইল 'আমীর'। ট্রান্স-জর্ডন ইরাকের ন্যায় স্বাধীন রাজ্যরূপে স্বীকৃতি পাইল না। আমীর আবদুল্লাকে কিছু স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইলেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীন রহিলেন।

ট্রান্স-জর্ডন

প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় বাসভূমি ("national home") স্থাপনের প্রস্তাব হইতে যে আরব-ইহুদী সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। প্যালেস্টাইন বহু শতাব্দী কাল আরবদের দেশ ছিল। যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ-কর্তৃত্ব স্থাপিত হইলে ব্রিটিশ মন্ত্রী ব্যালফুরের ঘোষণা (১৯১৭) অনুযায়ী বহুসংখ্যক ইহুদী পৃথিবীর নানা দেশ হইতে আসিয়া প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে। ইহাতে আরবদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ইহাই দীর্ঘকালব্যাপী আরব-ইহুদী সংঘর্ষের কারণ। এই সংঘর্ষ বারবার রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার বারবার চেষ্টা করিয়াও উভয় জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইস্রায়েল নামে ইহুদীদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলেও এই সংঘর্ষ বন্ধ হয় নাই, বরঞ্চ ইহা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

প্যালেস্টাইন

সিরিয়ায় ফরাসী-কর্তৃত্ব স্থানীয় আরবদের স্বাধীনতাস্পৃহার বিরোধী ছিল। ফ্রান্স সিরিয়ার একটি অংশ পৃথক করিয়া লেবানন (Lebanon) নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিল। এই নূতন রাষ্ট্র ফ্রান্সের রক্ষণাধীন (protectorate) হইল। সিরিয়ার অবশিষ্টাংশে ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ায় ফরাসী-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটিল। অতঃপর সিরিয়ার জাতীয় প্রতিনিধি-সভা (Constituent Assembly) গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে। ফ্রান্স নানাপ্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াও আরবদের শান্ত করিতে পারিল না। অবশেষে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স সন্ধি দ্বারা সিরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিল এবং ক্রমশঃ ফরাসী সৈন্যদল সিরিয়া হইতে সরাইয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু সিরিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও কার্যতঃ ফরাসী-প্রভুত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল না।

সিরিয়া ও লেবানন

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ মক্কা ও মদিনা হেজাজ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

হেজাজের অধিপতি হুসেন নামে স্বাধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের আজ্ঞাধীন ছিলেন। তুর্কীতে খলিফার পদের বিলোপ ঘটিলে তিনি নিজেকে ঐ পদের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে আরবের বিশাল মরুভূমির অন্তর্গত নেজদ (Nejd) রাজ্যের অধিপতি আব্দুল আজিজ ইবন সাউদ হেজাজ রাজ্য অধিকার করেন। পরে আরবের অর্ধস্বাধীন দলপতিগণ তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইবন সাউদের সমগ্র আরব দেশব্যাপী রাজ্যের নাম দেওয়া হইল 'সাউদী আরব' (Saudi Arabia)। তাঁহার শাসনাধীনে এই রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হইল। ভূগর্ভস্থ তৈল আবিষ্কারের ফলে সাউদী আরব প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছে।

আরব

মিশরের অধিবাসীরা আরবী-ভাষাভাষী এবং প্রধানতঃ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ভৌগোলিক দিক হইতে মিশর প্যালেস্টাইনের সংলগ্ন। সুতরাং মিশরকে আরব জগতের অংশরূপে গণ্য করা হয়। মিশরে ব্রিটিশ-প্রভুত্বের বিরোধী ওয়াফদ (Wafd) নামে পরিচিত জাতীয়তাবাদী দল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রবল হইয়া উঠে। এই দলের নেতা ছিলেন জগলুল পাশা (Zaghlul Pasha)। তিনি প্যারিস শান্তি বৈঠকে মিশরের সভ্যপদ দাবি করেন। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত করে এবং সামরিক বল প্রয়োগে জনসাধারণের অভ্যুত্থান দমন করে (১৯১৯)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড মিশরের নামমাত্র স্বাধীনতা স্বীকার করে, কিন্তু শাসনকার্যে ব্রিটিশ-কর্তৃত্ব প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। মিশরের খেদিভ 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন। জগলুলের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল এই আপোষ মীমাংসা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। এই দলের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ায় জগলুল প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তিনি—এবং তাঁহার মৃত্যুর (১৯২৭) পর অন্যান্য প্রধানমন্ত্রিগণ—পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডের উপর ক্রমাগত চাপ দিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও মিশরের মধ্যে নূতন সন্ধি হইল। এই সন্ধি দ্বারা মিশরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু সামরিক ব্যাপারে এবং সুয়েজ খাল অঞ্চলে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব রহিল।

মিশর

৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ১৯২৯

খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে জাপান সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ফরাসী ইন্দো-চীন জাপানের হস্তগত হয়। ইতিপূর্বে (জুন, ১৯৪০) পরাজিত ফ্রান্স জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং ফ্রান্সের ভিচি সরকার সন্ধিসূত্রে ইন্দো-চীনের উত্তরাংশে জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপানের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরবর্তী কয়েকমাসের মধ্যে জাপান (যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, (ইংলণ্ডের শাসনাধীন) মালয় ও ব্রহ্মদেশ এবং (হল্যাণ্ডের শাসনাধীন) ইন্দোনেশিয়া (বলি-সুমাত্রা-যাভা) অধিকার করে (১৯৪২)। এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে জাপানী-শাসন ছিল অত্যাচারের নামান্তর মাত্র।

জাপানের জয়

বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পূর্বেই ব্রহ্মদেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে মিত্রপক্ষের প্রতি-আক্রমণ সাফল্যলাভ করিয়াছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিল। তখন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন, ইন্দোনেশিয়ায় হল্যাণ্ডের শাসন এবং মালয় ও ব্রহ্মদেশে ইংলণ্ডের শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হইল। কিন্তু এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, জনসাধারণ আর ঔপনিবেশিক শাসন সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং যুদ্ধোত্তর কয়েক বৎসর বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী দলগুলি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত রহিল।

জাপানের পরাজয়

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বাধীন ব্রহ্মে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল। ফরাসী ইন্দোচীন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল; উত্তরাংশে (Viet Minh) কমিউনিস্ট দলপতি হো চি মিনের (Ho Chi Minh) শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, দক্ষিণাংশে (Vietnam) ফ্রান্সের আশ্রিত সরকার স্থাপিত হইল (১৯৪৯)। পরে উভয় অংশেই ফরাসী-কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল; ভিয়েৎমিন ও ভিয়েৎনাম দুইটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়াও হল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ

জাতীয়তাবাদের জয়

মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে স্বীকৃত হইল। এইরূপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে নব যুগের সূত্রপাত হইল।

৪। চীন (১৯১৯-৪৯)

'সুদূর প্রাচ্য' (১৯১৯): পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্যারিস শান্তিবৈঠকে (১৯১৯) জাপানের বিরোধিতায় চীনের কোন দাবি অনুমোদিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে চীনে নৈরাশ্য ও হতাশা প্রবল হইয়াছিল। য়ুয়ান শি-কাইর মৃত্যুর (১৯১৬) পর সাধারণতন্ত্র পুনর্জীবিত হইল বটে, কিন্তু চীনে আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পিকিঙে যে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল তাহার বিরুদ্ধে সান ইয়াৎ সেনের অনুগামী জাতীয়তাবাদী 'কুয়োমিন্‌টাঙ' (Kuomintang) দল ক্যাণ্টনে প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করে (১৯১৭)। উভয় কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে সমরনায়কগণ (war lords) স্বাধীনভাবে শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, সময় সময় তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধও চলিত। কুশাসন, অত্যাচার, অভাব-অভিযোগ দেশে প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল।

চীনে অনৈক্য

এই বিশৃঙ্খলার অবসান করিবার উদ্দেশ্যে এবং সমগ্র দেশ ক্যাণ্টন সরকারের অধীনে আনিবার জন্য 'কুয়োমিন্‌টাঙ' দল রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিল। ইতিপূর্বে রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটিয়াছে (১৯১৭)। রাশিয়া চীনে সাম্যবাদ (Communism) প্রচারের জন্য উৎসুক ছিল। পিকিং সরকারের অধীন উত্তর চীনে বিশেষ সুযোগ না পাইয়া রাশিয়া ক্যাণ্টন সরকারের অধীন দক্ষিণ চীনের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিল। মাইকেল বোরোডিন (Michael Borodin) নামক সাম্যবাদী রুশনায়ক চীনে আসিয়া সান ইয়াৎ সেন এবং তাঁহার সহকর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করিলেন। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। চীনা সাম্যবাদিগণকে 'কুয়োমিন্‌টাঙ' দলে গ্রহণ করা হইল। কিন্তু এই সহযোগিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর (১৯২৫) পর রুশ-চীন মৈত্রীতে ভাঙ্গন ধরিল। চিয়াং কাই-শেক (Chiang Kai-shek) 'কুয়োমিন্‌টাঙ' দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রাশিয়া এবং সাম্যবাদী দলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিলেন।

চীন ও বিপ্লবী রাশিয়া

সান ইয়াৎ সেনের নাম ও কীর্তি চীনের জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি হয়তো তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার চরিত্রে আদর্শবাদ প্রবল ছিল। কিন্তু তিনিই চীনে বিপ্লবের জনক এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিপ্লবের পরিচালক ছিলেন। তিনি তিনটি মূলনীতি ("The Three Principles of the People") চীনের নিপীড়িত জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন : (১) জাতীয়তাবাদ (Nationalism); (২) গণতন্ত্র (Democracy); (৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্য (livelihood, economic equality)। এই তিনটি উদার নীতির ভিত্তিতে তিনি চীনে গণতান্ত্রিক, স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সান ইয়াৎ সেনের আদর্শ

সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাই-শেক তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং খানিকটা সাফল্য লাভ করেন। চীনের সাম্যবাদীরা তাঁহার বিরোধিতা করিত। ফলে রাশিয়ার সহিত বিরোধ—এমন কি, ছোটখাট যুদ্ধ ঘটিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রবল বিরোধিতা আসিল জাপানের দিক হইতে।

১৯২১-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন বৈঠকে (Washington Conference) 'সুদূর প্রাচ্যে'র সমস্যার আলোচনা হইল। বিভিন্ন দেশের নৌ-বল নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা করা হইল তাহাতে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের নৌশক্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা রহিল। আর একটি সন্ধি দ্বারা চীনের স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

ওয়াশিংটন বৈঠকে চীন ও জাপান

কিন্তু জাপান এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। দুর্বল চীন জাতিসঙ্ঘে আবেদন করিয়া কোন প্রতিকার পাইল না। জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া তথায় 'মাঞ্চুকো' (Manchukuo) নামক আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া জাপান ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মূল চীন দেশ আক্রমণ করিল। দুই বৎসরের মধ্যে উত্তর চীনের অধিকাংশ জাপানের কর্তৃত্বাধীন হইল। চিয়াং কাই-শেকের অধিনায়কত্বে 'কুয়োমিন্টাঙ' সরকার প্রবল চেষ্টা করিয়াও জাপানের গতিরোধ করিতে পারে নাই।

চীন-জাপান যুদ্ধ

'সুদূর প্রাচ্য' ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদান এই

আক্রমণাত্মক নীতির স্বাভাবিক পরিণতি। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রায় দুই বৎসর কাল জাপান সংগ্রামে যোগদান করে নাই। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে রাশিয়ায় জার্মান বাহিনীর সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত দেশগুলি গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পরাজিত জাপান আত্মসমর্পণ করিল।

জাপানের যুদ্ধে যোগদান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চিয়াং কাই-শেকের শাসনাধীন চীন ইংলণ্ড ও আমেরিকার অন্যতম প্রধান মিত্র রূপে গণ্য হইত। আমেরিকা চীনকে প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়াছিল, কারণ চীন ছিল জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। জাপানের পরাজয়ে চীন নিরাপদ হইল এবং চীনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হইলে চীন ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমর্থনে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সভ্যপদ লাভ করিল।

'কুয়োমিন্টাঙ' সরকারের পতন ঃ কিন্তু জাপানের পতন এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ সত্ত্বেও চিয়াং কাই-শেক চীনে ঐক্য ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তাঁহার গণতন্ত্রবিরোধী নীতি চীনের জনসাধারণের বিরোধিতা উৎপাদন করিয়াছিল। 'কুয়োমিন্টাঙ' দল জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের অধিকার দেয় নাই। চীনে একটি গণতন্ত্রবাদী দল (Democratic League) ছিল, কিন্তু ইহার সভ্যসংখ্যা বেশী ছিল না। যুদ্ধের সময় চীনে সাম্যবাদী দলের (Communists) শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই দলের নেতা ছিলেন মাও সে-তুঙ (Mao-Tse-tung) এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন চু তে (Chu Teh)। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম চীনের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে সাম্যবাদী দলের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর ও মধ্য চীনে এবং মাঞ্চুরিয়ায় ইহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সামরিক বলের প্রয়োগে এবং 'কুয়োমিন্টাঙ'-বিরোধী প্রচারকার্যের দ্বারা সাম্যবাদীরা ক্রমশঃ শক্তিমান হইল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর চীনের জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। জাপানের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী (১৯৩৭-৪৫) যুদ্ধ এবং জাপানী

আক্রমণকারীদের অত্যাচার সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিপন্ন করিয়াছিল। 'কুয়োমিন্‌টাঙ' দলের কুশাসন এবং এই দলের সহিত সাম্যবাদী দলের সংঘর্ষ দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি বিনষ্ট করিয়াছিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অভাব এবং অর্থনৈতিক দৈন্য সাধারণ মানুষের মানসিক বল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনয়নের ফলে দুর্নীতির প্রসার হইল। কৃষকেরা দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইল।

চীনের দুর্দশা

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তন করিয়াও চিয়াং কাই-শেক 'কুয়োমিন্‌টাঙ' দলের আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সাম্যবাদী দল সমগ্র চীনে শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লইল ; চিয়াং কাই-শেক তাইওয়ান বা ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় লইয়া সেখানে 'কুয়োমিন্‌টাঙ' বা জাতীয়তাবাদী (Nationalist) সরকার স্থাপন করিলেন। চীনে সাম্যবাদী দলের প্রভুত্ব বিস্তারে রাশিয়া সাহায্য করিল।

চীনে বিপ্লব

আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় তাইওয়ানে এখনও 'কুয়োমিন্‌টাঙ' সরকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই সরকারই চীনের প্রতিনিধি কিন্তু চীনের মূল ভূখণ্ডে সাম্যবাদী সরকারই শাসন পরিচালনা করিতেছে। সাম্যবাদী সরকারের কর্তৃত্বাধীনে চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ চীন এখন পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান শক্তি। কিন্তু এই শক্তি শান্তির আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের বন্ধুতা অগ্রাহ্য করিয়া চীন ভারতের উত্তর সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছে (১৯৬২)।

———

আদর্শ প্রশ্নমালা (MODEL QUESTIONS)

সূচনা (Introduction)

1. Give a brief account of the Renaissance.
(রেনেসাঁস আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)
2. What were the causes of the Reformation? How did it divide Europe into religious camps?
(ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কারণগুলি বিবৃত কর। এই আন্দোলন কিভাবে ইউরোপকে বিভিন্ন ধর্মীয় শিবিরে বিভক্ত করিয়াছিল?)
3. Give a brief account of the colonial and commercial expansion of Europe up to the mid-18th century.
(অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রসারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

প্রথম অধ্যায় (Chapter I)

4. Write a short note on the political condition of Europe after the Seven Years' War.
(সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরবর্তীকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)
5. What is meant by Age of Enlightenment? Give a brief account of this age.
(জ্ঞানদীপ্তির যুগ বলিতে কি বুঝায়? এই যুগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter II)

6. Narrate the circumstances leading to the American War of Independence.
(যে সমস্ত অবস্থার ফলে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইয়াছিল সেই-গুলি বিবৃত কর।)
7. How do you account for the success of the colonies in the American War of Independence?
(আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে উপনিবেশগুলির সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।)
8. Write a brief account of the French philosophers and explain how they contributed to the French Revolution.
(ফরাসী দার্শনিকদের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং ফরাসী বিপ্লবে তাঁহাদের অবদান কিরূপ বুঝাইয়া দাও।)
9. What were the causes of the French Revolution.
(ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি বিবৃত কর।)
10. Give a brief account of the constitutional, administrative and social changes brought about by the French Revolution.
(ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে সমস্ত সাংবিধানিক, শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন দেখা দেয় তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

11. Write a brief note on the French Revolutionary War with special reference to its causes and the causes of French success.
(ফরাসী বৈপ্লবিক যুদ্ধের কারণগুলি এবং ফরাসীদের সাফল্যের কারণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখ।)
12. How did Napoleon rise to power?
(নেপোলিয়ন কেমন করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ?)
13. Estimate Napoleon's work as an administrator.
(রাজ্যপরিচালক হিসাবে নেপোলিয়নের কার্যাবলীর আলোচনা কর।)
14. Describe Napoleon's relations with England, Germany, Austria, Spain and Russia.
(ইংলণ্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্পেন এবং রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের সম্পর্ক বর্ণনা কর।)
15. Account for Napoleon's downfall.
(নেপোলিয়নের পতনের কারণ ব্যাখ্যা কর।)

তৃতীয় অধ্যায় (Chapter III)

16. What were the causes and effects of the Industrial Revolution in England?
(ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।)
17. How did the Industrial Revolution affect the world?
(শিল্পবিপ্লব কিভাবে পৃথিবীকে প্রভাবিত করিয়াছিল ?)

চতুর্থ অধ্যায় (Chapter IV)

18. Wha t were the principles followed by the Congress of Vienna? What territorial changes were made by the Congress?
(ভিয়েনা কংগ্রেসে কি কি নীতি অনুসৃত হইয়াছিল ? এই কংগ্রেস দ্বারা কি কি আঞ্চলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল ?)
19. Describe the career of Metternich.
(মেটারনিক্-এর কর্মজীবন বর্ণনা কর।)
20. Outline the causes and effects of the Revolution of 1830.
(১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের কারণাবলী ও ফলাফল সংক্ষেপে বিবৃত কর।)
21. Why did the Revolution of 1848 break out in France? How did it affect France?
(১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব কেন ফ্রান্সে দেখা দিয়াছিল ? ইহা কিভাবে ফ্রান্সকে প্রভাবিত করিয়াছিল ?)
22. Describe the career of Napoleon III.
(তৃতীয় নেপোলিয়নের কর্মজীবন বর্ণনা কর।)

পঞ্চম অধ্যায় (Chapter V)

23. How did the Revolution of 1848 affect Germany, Austria and Italy?
(১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব কিভাবে জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং ইটালিকে প্রভাবিত করিয়াছিল ?)
24. Write a short essay on the unification of Germany.
(জার্মানির ঐক্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।)

25. Describe the unification of Italy.
(ইটালির ঐক্য-কাহিনী বর্ণনা কর।)

26. What contributions did Mazzini, Cavour, Napoleon III and Garibaldi make to the unification of Italy ?
(ইটালির ঐক্য-সাধনে ম্যাজিনি, কাভুর, তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং গ্যারিবল্ডীর অবদান কি ছিল ?)

ষষ্ঠ অধ্যায় (Chapter VI)

27. Describe Catherine II's relations with Turkey.
(তুর্কীর সহিত দ্বিতীয় ক্যাথারিন-এর সম্পর্ক বর্ণনা কর।)

28. Write a short note on the Greek War of Independence.
(গ্রীস দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লেখ।)

29. What were the causes and effects of the Crimean War ?
(ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণাবলী ও ফলাফল সম্বন্ধে কি জান ?)

30. Write a critical note on the Treaty of Berlin (1878).
(বার্লিন-এর সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ অঃ) সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক টিপ্পনী লেখ।)

31. Discuss the main features of the Eastern Question from 1878 to 1914.
(১৮৭৮-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্য সমস্যার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।)

সপ্তম অধ্যায় (Chapter VII)

32. Discuss Bismarck's foreign and domestic policy.
(বিসমার্ক-এর পররাষ্ট্রীয় ও আভ্যন্তরীণ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

33. Estimate Bismarck's services to Germany.
(বিসমার্ক-এর পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

34. Explain how and why the Triple Alliance and Triple Entente were formed.
(Triple Alliance এবং Triple Entente কিভাবে এবং কেন গঠিত হইয়াছিল বুঝাইয়া বল।)

35. Write short notes on : (*a*) Morocco Crisis ; (*b*) Balkan Wars.
(সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : (ক) মরক্কো সঙ্কট ; (খ) বল্কান যুদ্ধ।)

অষ্টম অধ্যায় (Chapter VIII)

36. Explain the causes of expansion of Europe in the 19th century.
(উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রসারের কারণাবলী বুঝাইয়া দাও।)

37. How did China deal with the Western Powers in the 19th century ?
(উনবিংশ শতাব্দীতে চীন কিভাবে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের মোকাবিলা করিয়াছিল ?)

38. Explain the origin, nature and effects of the Restoration of 1867 in Japan.
(জাপানে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের Restoration-এর উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ফলাফল বুঝাইয়া দাও।)

39. Discuss the causes and results of the Sino-Japanese War.
(চীন-জাপান যুদ্ধের কারণসমূহ ও ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

40. Explain the causes and effects of the Russo-Japanese War.
(রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণাবলী ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর।)

41. Write short notes on : (*a*) Sun Yat-sen ; (*b*) Boxer Movement ; (*c*) Chinese Revolution of 1911.
(সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : (ক) সান ইয়াৎ-সেন ; (খ) বক্সার আন্দোলন ; (গ) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের চৈনিক বিপ্লব।)

42. Give a brief account of the partition of Africa.
(আফ্রিকার খণ্ডীকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

নবম অধ্যায় (Chapter IX)

43. What is the Monroe Doctrine ? How did it affect the foreign policy of the United States in the 19th century ?
(মনরো নীতি কি ? উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ইহা দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল ?)

44. What were the causes and results of the American Civil War ?
(আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ ও ফলাফল বর্ণনা কর।)

45. Describe the career of Abraham Lincoln.
(আব্রাহাম লিঙ্কনের কর্মজীবন বর্ণনা কর।

46. Examine the relations between the United States and the South American States in the 19th century.
(আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক উনবিংশ শতাব্দীতে কিরূপ ছিল পর্যালোচনা কর।)

দশম অধ্যায় (Chapter X)

47. Examine the causes of the First World War.
(প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।)

48. Why did America join the First World War ? What part did she play in the War and in the making of peace ?
(আমেরিকা কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল ? যুদ্ধে এবং শান্তি স্থাপনে সে কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ?)

একাদশ অধ্যায় (Chapter XI)

49. Describe the composition and functions of the principal organs of the League of Nations.
(জাতিসঙ্ঘের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।)

50. What were the aims and objects of the League of Nations ? How far did it succeed in realising them ?
(জাতিসঙ্ঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল ? সেই সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে উহা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিল ?)

51. Discuss the causes of the failure of the League of Nations.
(জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার কারণসমূহ আলোচনা কর।)

দ্বাদশ অধ্যায় (Chapter XII)

52. What do you know about the life and doctrines of Karl Marx?
(কার্ল মার্ক্স-এর জীবন এবং মতবাদ সম্পর্কে কি জান ?)

53. Narrate the circumstances leading to the Russian Revolution of 1917. How did it affect (*a*) Russia, and (*b*) the world?
(১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব যে সমস্ত অবস্থার ফলে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল সেগুলি বর্ণনা কর। উহা কিভাবে (ক) রাশিয়াকে এবং (খ) সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাবিত করিয়াছিল ?)

54. Write short notes on : (*a*) Lenin (*b*) Trotsky (*c*) Stalin.
(সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : (ক) লেনিন ; (খ) ট্রটস্কি ; (গ) স্ট্যালিন।)

ত্রয়োদশ অধ্যায় (Chapter XIII)

55. Describe the changes brought about in Europe by the treaties at the end of the First World War.
(প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে সম্পাদিত বিভিন্ন সন্ধির ফলে ইউরোপে যে-সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।)

56. Criticise the treaty of Versailles from the German point of view.
(জার্মানির দৃষ্টিকোণ হইতে ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা কর।)

57. How did Hitler rise to power? What were the aims of his internal and foreign policy? How did he try to achieve those aims?
(হিটলার কিভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ? তাঁহার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় নীতির লক্ষ্য কি ছিল ? সে-সমস্ত লক্ষ্য সাধনে তিনি কিভাবে চেষ্টা করেন ?)

58. Describe Mussolini's rule in Italy.
(ইটালিতে মুসোলিনির শাসন বর্ণনা কর।)

59. How did France try to protect her security after the First World War?
(প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স কিভাবে তাহার নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল ?)

চতুর্দশ অধ্যায় (Chapter XIV)

60. Explain the causes of the Second World War.
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।)

61. Describe the composition and functions of the General Assembly and the Security Council.
(সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ-এর গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।)

62. What are the aims and objects of the United Nations?
(সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি ?)

পঞ্চদশ অধ্যায় (Chapter XV)

63. How did the First World War affect the Middle East?
(প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল ?)

64. Give an account of the Turkish Revolution under Mustafa Kemal Pasha.
(মুস্তাফা কামাল পাশা-র নেতৃত্বে তুর্কী বিপ্লবের বিবরণ দাও।)

65. Describe the career of Kemal Pasha.
(কামাল পাশার কর্মজীবন বর্ণনা কর।)

66. How far did the Arab States succeed in securing independence after the First World War?
(প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরব রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা অর্জনে কতদূর সফল হইয়াছিল?)

67. Outline the history of China from 1937 to 1949.
(১৯৩৭ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

Higher Secondary Examination Questions

1960

1. Trace briefly the history of the downfall of Napoleon.
(নেপোলিয়নের পতনের ইতিহাস সংক্ষেপে ধারানুক্রমিকভাবে বিবৃত কর।)

2. Describe the revolutionary movements of 1848 in Europe. Why did they fail?
(ইউরোপে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি বর্ণনা কর। সেগুলি কেন সফল হয় নাই?)

3. Narrate the story of the unification of Italy 1850-1870.
(ইটালির ঐক্য-কাহিনী (১৮৫০-১৮৭০) বর্ণনা কর।)

4. Show how the Partition of Africa was effected between different European powers.
(ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে কিভাবে আফ্রিকার খণ্ডীকরণ সাধিত হইয়াছিল দেখাও।)

5. What were the causes of the World War of 1914-1918?
(১৯১৪-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ বর্ণনা কর।

6. Describe in outlines the relations between China and Japan from the Sino-Japanese War of 1894-95 to the end of the First World War.
(১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত চীন-জাপান সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

1961

1. Trace briefly the career of Napoleon. To what extent did he carry out the principles of the French Revolution?
(সংক্ষেপে নেপোলিয়নের কর্মজীবনের ধারানুক্রমিক বিবরণ দাও। ফরাসী বিপ্লবের নীতিসমূহ তিনি কতদূর পালন করিয়াছিলেন?)

2. What were the main provisions of the Settlement of Vienna, 1815? What were its defects?
(১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা মীমাংসার প্রধান প্রধান শর্তাবলী কি ছিল? উহার ত্রুটিগুলি বর্ণনা কর।)

3. Mention the part played by the U. S. A. in world-politics during the years 1897-1919.
(১৮৯৭-১৯১৯ এই কয় বৎসর বিশ্বের রাজনীতিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল উল্লেখ কর।)
4. Give a brief account of the progress of Japan in the latter half of the 19th century.
(উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাপানের প্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)
5. Write a short history of the League of Nations.
(জাতিসঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখ।)
6. What were the causes of Revolution in Russia in 1917 ?
(১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াতে যে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহার কারণগুলি বর্ণনা কর।)

1962

1. Write a note on Stamp Act. Explain the causes of the success of the Americans in their struggle for independence.
(স্ট্যাম্প আইন সম্বন্ধে টিপ্পনী লেখ। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে আমেরিকাবাসীদের সাফল্যের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।
2. What led to Napoleon's downfall ?
(নেপোলিয়নের পতন হইয়াছিল কেন ?)
3. Explain the causes of the French Revolution of February 1848. What were its effects ?
(১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ফরাসী বিপ্লবের কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। উহার ফলাফল কি হইয়াছিল ?)
4. Briefly narrate the story of Italian Unification.
(ইটালীর ঐক্য-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)
5. Mention the terms of the treaty of Versailles, 1919, and point out its defects.
(১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী উল্লেখ কর এবং উহার ত্রুটিসমূহ দেখাও।)
6. Give in outline the history of China from 1911 to the outbreak of the Second World War.
(১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত চীনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

1963

1. Analyse the causes of the French Revolution of 1789.
(১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।)
2. Give a brief account of the unification of Germany.
(জার্মানির ঐক্য-কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)
3. Examine the causes and results of the Crimean War.
(ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণসমূহ ও ফলাফল পর্যালোচনা কর।)
4. Discuss the economic, social and political effects of the Industrial Revolution in England.
(ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফল আলোচনা কর।)

5. Give an account of American foreign policy in the twentieth century.
(বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতির বিবরণ দাও।)
6. Trace the history of Sino-Japanese relations from 1894 to 1919.
(১৮৯৪ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন-জাপান সম্পর্কের ইতিহাস ধারানুক্রমিক ভাবে বর্ণনা কর।)

1964

1. Analyse the causes of the American Revolution. What were the factors responsible for its success ?
(আমেরিকার বিদ্রোহের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর। কি কি কারণে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল ?)
2. Trace the career of Napoleon from the establishment of the Consulate to the beginning of the Peninsular War.
(কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠার সময় হইতে উপদ্বীপের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত নেপোলিয়নের কর্মজীবন বর্ণনা কর।)
3. Estimate the contributions of Mazzini, Cavour, Garibaldi and Victor Emmanuel II to the unification of Italy.
(ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ম্যাটসিনি, কাভুর, গ্যারিবল্ডী ও দ্বিতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েলএর অবদানের পরিমাণ নির্ণয় কর।)
4. Give an account of Bismarck's achievements in foreign policy.
(বৈদেশিক নীতিতে বিসমার্কের কৃতিত্বের বিবরণ দাও।)
5. Examine the causes and effects of the Russo-Japanese War 1905.
(রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৫)-এর কারণ ও ফলাফল পর্যালোচনা কর।)
6. Write a short essay on the League of Nations. Why did it fail to act as an effective organisation ?
(জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ। সাফল্যময় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য করিতে ইহা কেন অকৃতকার্য হইয়াছিল ?)

1965

1. Examine the causes of the French Revolution of 1789.
(১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের কারণ বিশ্লেষণ কর।)
2. What were the reasons for Napoleon's downfall ?
(নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি ?)
3. Give a brief account of the Unification of Germany.
(জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।)
4. Analyse the causes of the American Civil War.
(আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।)
5. Describe in outline the course of Sino-Japanese relations from 1894 to 1922.
(১৮৯৪-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন-জাপান সম্পর্কের গতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)
6. Trace the history of Hitler's rise to power.
(হিটলারের ক্ষমতালাভের ইতিহাস বিবৃত কর।)

C. U. Pre-University Examination Questions

1961

1. Why did war break out between England and her North American colonies ? How do you account for the success of the colonies in the American War of Independence

2. Explain the causes of the French Revolution.

3. Describe the unification of Italy.

4. What were the general effects of the Industrial Revolution ?

5. Sketch the history of the partition of Africa.

6. Why did civil war break out in the United States of America ? What were its results ?

7. Explain the causes and effects of the Russo-Japanese War.

8. What do you know about the Boxer Rebellion and the Chinese Revolution of 1911 ?

9. What were the causes of the First World War ?

10. Write a brief essay on the Russian Revolution of 1917.

11. What are the aims and objects of the United Nations ?

12. Write short notes on any two of the following :—

(*a*) Monroe Doctrine ; (*b*) Kemal Ata Turk ; (*c*) Hitler.

1962

1. Give a brief account of the French Revolution and explain how they contributed to the outbreak of the French Revolution.

2. Estimate Napoleon's work as an administrator.

3. Describe the territorial changes made by the Congress of Vienna. What were the principles followed by the Congress ?

4. What were the causes and effects of the Revolution of 1848 in Europe ?

5. Write a short essay on the unification of Germany.

6. Explain the causes and effects of the expansion of Europe in the 19th century.

7. Estimate the importance of the part played by George Washington and Abraham Lincoln in the history of the United States of America.

8. Discuss the causes and effects of the Sino-Japanese War 1894-95.

9. Describe the changes brought about in Europe by the treaties at the end of the First World War.

10. Give a brief account of the League of Nations. Why did it fail ?

11. Discuss the causes of the Second World War.

12. Write short notes on any two of the following :—

(a) Stalin ; (b) Chinese Revolution of 1949 ; (c) General Assembly and Security Council of the United Nations.

1963

1. What were the causes of the American War of Independence? Account for the success of the colonies.
2. Explain the causes of Napoleon's downfall.
3. Discuss the causes and effects of the Revolution of 1830.
4. Write a short essay on the unification of Italy.
5. Give a brief account of the Partition of Africa in the 19th century.
6. Indicate the principal effects of the Industrial Revolution.
7. Describe the circumstances leading to the American Civil War.
8. Discuss the causes and results of the Russo-Japanese War.
9. What were the main causes of the First World War?
10. Give a short account of the Russian Revolution of 1917.
11. Describe the foreign policy of Hitler.
12. Write short notes on any two of the following:—
   (*a*) Treaty of Berlin, 1878.
   (*b*) Sun Yat-Sen.
   (*c*) Kemal Pasha.

1964

1. Describe the political condition of Europe at the end of the Seven Years' War.
2. Explain the causes of the French Revolution.
3. Give an account of Napoleon's achievement as an administrator.
4. How did the territorial settlement made by the Congress of Vienna affect the map of Europe?
5. Discuss the causes and effects of the Revolution of 1848 in France.
6. Write a short essay on the unification of Germany.
7. What is meant by the 'Monroe Doctrine'? How did it affect the foreign policy of the United States till the beginning of the First World War in 1914?
8. Describe the causes and effects of the Sino-Japanese War, 1894 1895.
9. Describe the main features of the peace treaties affecting Germany and the Austrian Empire concluded after the First World War.
10. Give a brief account of Mussolini's foreign policy.
11. Describe the career and reforms of Kemal Pasha.
12. Write short notes on any two of the following:—
   (*a*) Cavour; (*b*) Abraham Lincoln; (*c*) Lenin.

1965

1. Give a brief account of colonisation by European countries up to the mid-18th century.

2. Account for the success of the American colonies in their war against England.

3. How did philosophers contribute to the outbreak of the French Revolution ?

4. Account for Napoleon's downfall.

5. Discuss the causes and effects of the Revolution of 1830 in France.

6. Write a short essay on the unification of Italy.

7. Give a brief account of Bismarck's foreign policy.

8. What were the causes and effects of the American Civil War ?

9. Discuss the effects of the Industrial Revolution.

10. Give a brief account of the partition of Africa.

11. Describe the role of the United States in the First World War and in the making of the peace treaties at the end of that war.

12. Account for the failure of the League of Nations.

B. U. Entrance Examination Questions

1961

1. What were the causes and effects of the American War of Independence ?

2. Discuss the causes of the French Revolution of 1789.

3. Review the significance of the Settlement of Vienna (1815).

4. Narrate the story of the Unification of Italy.

5. Describe the Partition of Africa by the European Powers from 1880 to 1902.

6. Describe the rise and expansion of Japan from 1868 to 1905.

7. What were the causes of the World War of 1914-18 ?

8. Discuss the Provisions of the Treaty of Versailles (1919).

9. Trace the causes of the Russian Revolution (1917). Account for its success.

10. Write an essay on the League of Nations.

11. What is the Monroe Doctrine ? To what extent did it influence American foreign policy during the Nineteenth Century ?

12. Write short notes on any two of the following :

(*a*) The Industrial Revolution.

(*b*) Sun Yat-Sen.

(*c*) President Wilson.

(*d*) The United Nations Organisation.

1962

1. Describe the political condition of Europe after the Seven Years' War.

2. Who were these persons and what were their contributions to history : Voltaire, Montesquieu, Rousseau ?

3. What were the causes of the downfall of Napoleon ?

4. What led to the Revolution of 1830 ? What were its effects in France and Europe ?

5. How did Bismarck unify Germany ?

6. What is the New Eastern Question ? How did it affect the situation of Europe in the Peace of Paris (1856) ?

7. Write an essay on the Industrial Revolution and its effects.

8. Briefly describe the causes of the American Civil War. What were its results.

9. Give an account of the political development in China from the Boxer rising to the end of World War I.

10. What part did Mustafa Kemal play in the struggle for the emancipation and progress of Turkey ?

11. Analyse the causes of the Second World War. To what extent was Hitler responsible for it ?

12. Write short notes on any two of the following :

(*a*) Holy Alliance.

(*b*) Garibaldi.

(*c*) The League of Nations.

(*d*) Lenin.

1963

1. Trace the circumstances that led to the War of American Independence. Account for the success of the American colonies against England.

2. Enumerate the causes of the French Revolution.

3. What part did England play in the Napoleonic Wars ?

4. What were the main principles followed by the peace-makers of Vienna and how were they put into practice ? What in your opinion was the weakness of the Vienna Settlement of 1815 ?

5. Estimate the contributions of Cavour in the history of the Italian Unification.

6. Write what you know about Emperor Napoleon III.

7. Enumerate the circumstances leading to the Congress of Berlin (1878). Why is the period following the Treaty of Berlin called an 'era of armed peace' ?

8. Describe the foreign policy of the U. S. A. after Civil War.

9. Discuss the causes and effects of the two Chinese Wars with the European powers.

10. Give an account of the Europeanisation of Japan.

11. Review the provisions of the Treaty of Versailles. Was it a bad treaty ?

12. Write short notes on any two of the following :

(*a*) Revolution of 1848.

(*b*) Greek War of Independence.

(*c*) Russian Revolution of 1917.

(*d*) Mussolini.

1964

1. Why is '1763' important ?

2. Write short notes on :—

(*a*) Mirabeau, (*b*) Danton and (*c*) Robespierre.

3. Why did Napoleon I fall from power ?

4. Relate the circumstances that lead to the February Revolution (1848).

5. How did Bismarck unite Germany ?

6. Analyse the background of the American Civil War.

7. Give the story of the partition of Africa.

8. Why did Japan start a war in 1894 and another in 1904 ?

9. Do you think that Germany alone was responsible for the World War I (1914-1918) ?

10. Narrate the main events in the history of Russia between the two World Wars.

11. Explain the causes of the Second World War.

12. Write a note on the Chinese Revolution of 1949.

1965

1. Briefly narrate the circumstances leading to the American War of Independence.

2. Estimate Napoleon's work as an administrator.

3. Give a brief account of territorial settlement made by the Congress of Vienna.

4. Describe the unification of Italy.

5. Write a critical note on the Treaty of Berlin (1878).

6. What were the causes and effects of the Industrial Revolution in England ?

7. Indicate the main features of the foreign policy of the United States of America from Independence to World War I.

8. Write a note on the 'Restoration' (1867) in Japan. How did Japan westernise herself ?

9. Describe the changes brought about in Europe by the peace treaties at the end of World War I.

10. Give an account of the Turkish Revolution under Mustafa Kemal Pasha.

11. Explain the causes of the failure of the League of Nations.

12. Write short notes on any three of the following :
(*a*) The Chinese Revolution of 1911 ; (*b*) Mussolini's conquest of Abyssinia ; (*c*) Munich Pact ; (*d*) Role of Russia in World War II : (*e*) The Security Council of the United Nations.

U. N. B. Pre-University Examination Questions

1963

1. Analyse the social and political causes of the great French Revolution.

2. Trace briefly Napoleon's rise to power.

3. Review the foreign policy of Napoleon III.

4. Show how Bismarck brought about the unification of Germany.

Give a brief account of the 'Partition of Africa'.

6. Discuss the causes and effects of the American Civil War.

7. What were the causes and effects of the Russo-Japanese War ? Account for the success of Japan.

8. Describe the causes of the Second World War.

9. Explain the origin and aims of the United Nations Organisation. Describe some of its functions.

10. Give a short history of Fascist Italy under Mussolini.

1964

1. What were the aims of the Congress of Vienna ? Give a brief review of its work.

2. Give a brief account of the revolutions that broke out in the different countries of Europe in 1848.

3. What were the contributions of Mazzini, Garibaldi and Cavour towards the creation of a united Italy ?

4. Account for the downfall of Napoleon III.

5. Give a brief account of Bismarck's work as Imperial Chancellor (1871-90).

6. Form an estimate of the liberal reforms of Tsar Alexander II of Russia. What were the results of his liberal policy ?

7. Give a brief account of the problems that were created in the 19th century by the increasing weakness of the Turkish Empire.

8. Give an account of the emergence of Japan as a dominant power in the Far East.

9. Describe the events leading to the First World War.

10. Describe the part played by the U. S. A. in the First World War.

11. Enumerate the defects of the Peace Treaties which followed the First World War.

12. Write short notes on any two of the following :—

(1) Metternich, (2) Monroe Doctrine, (3) American Civil War, (4) Partition of Africa, (5) League of Nations.

1965

1. What led to the Revolution of 1830 in France? Describe its effect on Europe.

2. Review the policy and achievements of Metternich.

3. Narrate the story of the unification of Germany.

4. Give a brief account of France under Napoleon III.

5. What is your estimate of Bismarck as a statesman ?

6. How was Africa partitioned among the European powers ?

7. Give a picture of the situation in Europe between 1878 and 1914.

8. Write a connected account of the events leading to the Russian Revolution in 1917.

9. Sketch the history of the American Civil War and the part played in it by Abraham Lincoln.

10. Describe the rise of Japan as a world power.

11. Discuss the Peace of Versailles, 1919. Was it unjust to Germany ?

12. Write notes on any two of the following :—

(*a*) The Monroe Doctrine. (*b*) The Greek Revolution (1821-1829). (*c*) Karl Marx. (*d*) Garibaldi. (*e*) The Crimean War.

ডক্টর অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক যুগের কথা

WORLD HISTORY –1740–1949